সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নদীয়ার গ্রাম

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস

ইন্দিরা প্রকাশনী
১৯ডি/এইচ/১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কোলকাতা—৭০০ ০০৬

প্রকাশক ঃ

লক্ষ্মী রায়

ইন্দিরা প্রকাশনী

১৯ডি/এইচ/১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট

কোলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন—২০০২

মুদ্রক ঃ

বক্সী প্রিন্টার্স

৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কোলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বিশ্বাস বুক স্টল

৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

দে বুক স্টোর

১৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩

পি. এন. পুস্তকালয়

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩

সুমন

২৮/২এ, বিধান সরণী, কোলকাতা-৭০০ ০০৬

ভূমিকা

নদীয়া জেলার শতকরা ৮৩ ভাগ লোকই বাস করে গ্রামাঞ্চলে। গ্রামই নদীয়ার প্রাণ। সেই গ্রামেরই পরিচিতি দেবার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। অসংখ্য গ্রামের মধ্যে মাত্র ৭১টি গ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। ক্ষেত্র গবেষণার সময়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করতে .পরেছি সেই সব তথ্য দিয়েই লেখা হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায় গুলি।

জানি বহু বিষয় অনালোকিত থেকে গেল। বিগত কয়েক বছর ধরে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সব গ্রামে ঢুকেছি সেসব গ্রামেই পেয়েছি গ্রামবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা। এই গ্রন্থে উল্লেখিত সব গ্রামের অধিবাসীদেরই জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী যথা ফারুক, সেমিম, চৈতালী, সীজার, হারুণ, সুজাতা, কুন্তল, কোয়েল, কৃষ্ণা, সুদীপ্ত, নির্মল, প্রসেনজিৎ, শিল্পী, নীতা, পদ্মাবতী, কেয়া, হেকমত, সুপ্রীতি, পারমিতা, সুপর্ণা, সুতপা, বিলকিস্, তপতী, রুমকী, ভীষ্ম, মনোজিৎ, শীলা, নুরুল, সুমন, ঋত্বিক ও অন্যান্যদের জানাই আন্তরিক স্নেহ ও ভালোবাসা এই কঠিন কাজে সাহায্যে করার জন্য। এছাড়া ব্রতচারী শিক্ষক বিকাশজী, দীপক বাবু, রাণাবন্দের হরেন্দ্র বাবু ও বাগচী যমশের পুরের জগন্নাথ পোদ্দার, বাণিয়াখাড়ির মান্নান সাহেব, জয়নাল আবেদিন ও অন্যান্যদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

আশাকরি আরো যোগ্য ব্যক্তিরা নদীয়ার অন্যান্য গ্রামের লোক ঐতিহ্য ও ইতিহাস রচনা করার জন্য এগিয়ে আসবেন এবং আমার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবেন। আমি শুধু শুরুটা করলাম মাত্র।

—ইতি লেখক

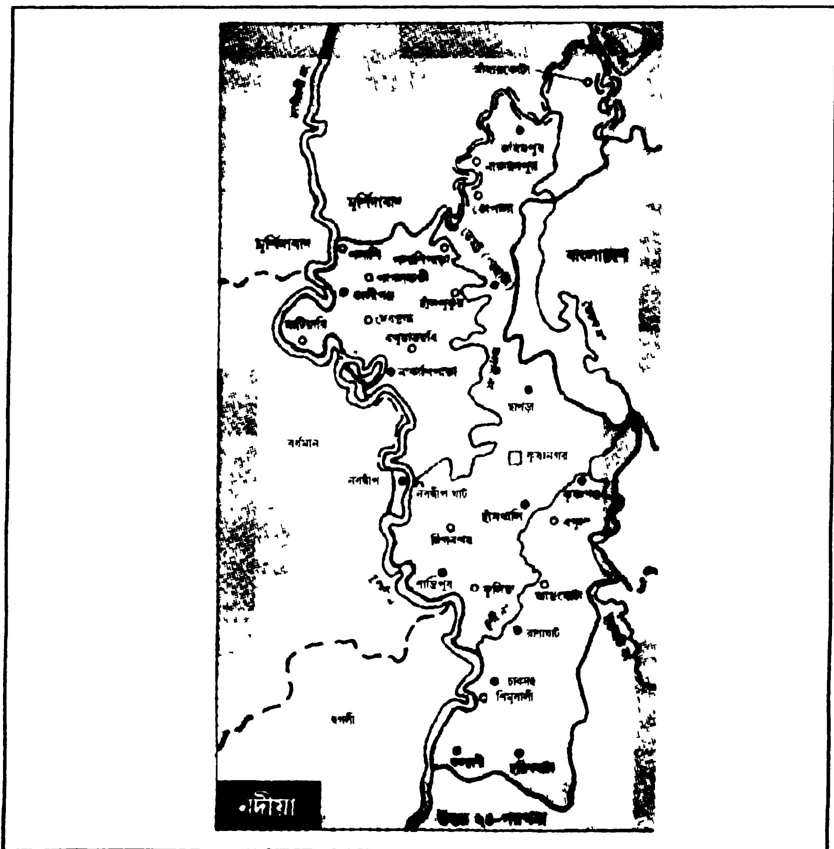
নদীয়া

আয়তন (বর্গ কিমি) : ৩,৯২৭; জনসংখ্যা : ৩৮,৫২,০৯৭; পুরুষ : ১৯,৮৯,৮৪১; মহিলা : ১৮,৬২,২৫৬; জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গ কিমি) : ৯৮১; শহরবাসী (শতাংশ) : ২২.৬৩; তপসিলি জাতি, সংখ্যা এবং শতাংশ : ১১,১৭,৫০৬ এবং ২৯.০১; তপসিলি উপজাতি, সংখ্যা এবং শতাংশ : ৯০,৫২৫ এবং ২.৩৫; সাক্ষরতা : ১৬,৮৬,৮৯৭; পুরুষ : ১০,০০,৮০৭; মহিলা : ৬,৮০,০৯০ সাক্ষরতা (শতাংশ): ৫২.৫৩; পুরুষ : ৬০.০৫ মহিলা : ৪৪.৪২।

স্বাস্থ্য ঃ—স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংখ্যা : ৪৫৬; বেডের সংখ্যা : ৫,১৪০; পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্র : ১৬ (গ্রামাঞ্চলে), ৪ (শহরে)।

পঞ্চায়েত ঃ— গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৮৭; আসন সংখ্যা : ৩,০৫২; পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা : ১৭; আসন সংখ্যা : ৫০৪; জেলা পরিষদের সংখ্যা : ১; আসন সংখ্যা : ৪১।

যোগাযোগ ঃ—সড়কপথ (কিমি) : ৯৭৩; পাকা : ৯৩৯; কাঁচা : ৩৪; পূর্ত দপ্তরের অধীন : ৯৭৩; পোষ্ট অফিসের সংখ্যা : ৪৫২; প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় পোষ্ট অফিসের সংখ্যা : ৯, টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা : পোষ্ট ও টেলি. অফিসের সংখ্যা : ৭৬।



সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই

১। বিড়লার দ্বারে বাউল (কবিতা)
২। দিগন্ত পেরিয়ে (উপন্যাস)
৩। সব ভূত ভূত নয় (গল্প)
৪। ভূলোদার ভূত (গল্প)
৫। নীল সাগরের ঢেউ (ভ্রমণ)
৬। দক্ষিণী (কবিতা)
৭। ছড়ায় ছড়ায় দখিন ভারত (কবিতা)
৮। রাজপুতানাডাকে (কবিতা)
৯। বঙ্গভূমি জননী আমার (কবিতা)
১০। আজো স্বপ্ন আসে (কবিতা)
১১। ডাকে বিন্ধ্যা ডাকে নর্মদা (কবিতা)
১২। বেত্রবতী রেবাদের কাছে (উপন্যাস)
১৩। বাংলার শিক্ষণ-দীপিকা (পাঠ্যগ্রন্থ)
১৪। পূবাল দেশের উড়ালনায়ে (কবিতা)
১৫। দখিন দেশের দখিন বায়ে (কবিতা)
১৬। ভারতবর্ষ স্বপ্ন আমার (কবিতা)
১৭। ডাকছে পাহাড় হাসছে নদী (কবিতা)
১৮। সীমান্ত (নাটক)
১৯। সজল কাজল (কাব্যনাট্য)
২০। চলছে চলবে ? (নাটিকাগুচ্ছ)
২১। আমারই এ বাংলায় (কবিতা-পুরস্কৃত)
২২। যা জোনাকী (কবিতা-পুরস্কৃত)
২৩। নাগর যেখানে নদী (উপন্যাস)
২৪। উত্তরা পশ্চিমা (কবিতা)
২৫। গঙ্গোত্রী গোমুখীর কাছে (ভ্রমণ)
২৬। বিপাশার পাশে (ভ্রমণ)
২৭। লোকশ্রুতির নদীয়া
২৮। লোক ঐতিহ্যে উত্তরবঙ্গ (গবেষণা)
২৯। ইরাবতী বিপাশার দেশে
৩০। রঞ্জনদার ভূতের গল্প
৩১। রঞ্জনদার গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প
৩২। প্রাণজ
৩৩। এই মহামানব
৩৪। কুমায়ুনের পথে পথে

ইতিহাস ও লোক ঐতিহ্যে নদীয়া

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ জেলার আয়তন ও সীমানা নানা কারণে বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। এই জেলার ওপর দিয়ে চলে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা মাজদিয়া থেকে সোজা বাহাদুরপুরের ভূমি পেরিয়ে। এই জেলার বর্তমান আয়তন হলো তিন হাজার নশো সাতাশ বর্গকিলোমিটার। চারটি মহকুমায় রয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের মতো মানুষ। গ্রামীন জনসংখ্যা মোট জন সংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ। এ জেলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় শতকরা ২৪ ভাগ বাকী এক ভাগ খৃষ্টান-বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষারহার—

নদীয়া জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার এবং মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি। এছাড়া ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা পনেরো। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে পাঁচটি। রয়েছে পাঁচটি কারিগরিও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই জেলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা মোট ১১১টি। সাক্ষরের হার শতকরা ষাট ভাগের ওপরে।

৩। প্রশাসনিক বিভাগ—

এই জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৮৭ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ১৭। মোট ১৭টি ব্লক রয়েছে এ জেলায়। পৌর সভা আছে ৯টি, উপনগরী ১টি এবং বড়গঞ্জ বা শহরতলী ১৬টি। মোট মৌজার সংখ্যা হলো ১৩৫২টি। জেলাসদর কৃষ্ণনগর।

৪। ইতিহাস—

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রাচীন গৌড়ের অধীনে ছিল একদা নদীয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পাল আমলেও নদীয়ায় বৌদ্ধ পাল রাজাদের আধিপত্য ছিল বিস্তীর্ণ অংশে। এর পরে নদীয়া চলে যায় সেন রাজাদের অধীনে। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের শেষভাগে এই অংশে ঘটে বখতিয়ার খিলজীর অভিযান এবং ধীরে ধীরে নদীয়া চয়ে যায় মুসলিম অধিকারে।

নদীয়ার বুকে যে দুটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে তার একটি হলো বখ্‌তিয়ার খিলজির নদীয়া আক্রমণ ও মধ্যযুগের সূচনা এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পলাশীযুদ্ধ ও ইংরেজ রাজত্বের সূচনা তথা মধ্যযুগের অবসান।

এই জেলার বিভিন্ন অংশে খনন কাজ চালিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে পাওয়া গেছে বহু প্রাচীন নিদর্শন। পাওয়া গেছে বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি ও বিষ্ণু মূর্তিসহ বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি এবং বেশ কিছু তাম্রশাসনও। সুবর্ণ বিহার, বল্লাল ঢিবি, দেবগ্রাম, আনুলিয়া, জিৎপুর, কাঁঠালিয়া, কামদেবপুর, বার্ণিয়া, আলফা, বরেয়া, নবদ্বীপ, দোগাছি, পানশিলা, চাঁদঘর ও নদীয়ার বিভিন্ন অংশে যে সব মূর্তি মুদ্রা, কড়ি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন মৃৎ পাত্রাদি পাওয়া গেছে সেসব উপাদানের সাহায্যে সহজেই অনুমান করা যায় যে নদীয়ার বিভিন্ন

অংশে একদা উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং এই জেলার বিভিন্ন অংশে একদা বৌদ্ধধর্মেরও বিস্তার ঘটেছিল। তারপরে সেন আমলে আবার প্রাধান্য পেয়েছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং সুলতানী আমলে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছিল ইসলাম ধর্ম। আর সবশেষে বৃটীশ যুগে সূচনা হয়েছিল খৃষ্টধর্ম প্রসারের। বর্তমানে এই জেলা থেকে বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় হয়ে গেলেও বাকী তিনটি ধর্মের অস্তিত্ব রয়ে গেছে প্রবলভাবেই।

৬। বিদ্রোহ বিপ্লবে—

এই জেলায় ঘটে গেছে বহু বিদ্রোহ, বহু বিপ্লব। নীলবিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়াবাসীরা নিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস থেকে শুরু করে বসন্ত বিশ্বাস, বাঘাযতীন, অনন্তহরি, সতীশ সর্দারের মতো বহু বরেণ্য নদীয়া সন্তান—নীলবিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

৭। নদীয়াবাসীর ধর্মাচরণ ও লোকধর্ম—

নদীয়া জেলার মন্দির—মসজিদ ও গীর্জা কেন্দ্রিক যে তিনটি প্রধান ধর্ম প্রচলিত আছে তাদের পাশাপাশি আছে বেশ কয়েকটি লোকধর্মও। ঐসব লোকধর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামী, খুশী বিশ্বাসী ও লালন শাহীমত।

এই জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে যেমন বৈষ্ণব সাধনার চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা যায় তেমনি আবার বেলপুকুর, বিল্বগ্রাম, বামনপুকুর ও কালীগঞ্জে শক্তি সাধনার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়।

এই জেলায় শিব মন্দির বেশ কয়েকটি থাকলেও তুলনায় শৈবধর্মের প্রভাব কম। বৌদ্ধ দেবদেবীগণ হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে মিশে গেছেন। ধর্মরাজ, যুগনাথ শিব, দণ্ডপাণি শিব এবং ব্রহ্মাণী দেবী আসলে যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবদেবী একথা সুবিদিত।

নদীয়া জেলার পীরের দরগাগুলো লোকধর্মের অন্যতম উৎসস্থল বলে মনে করেন অনেকে।

৮। পূজা পার্বণ ও মেলা—

নদীয়া জেলায় ছড়িয়ে আছে লোক সংস্কৃতির প্রচুর উপাদান। এই জেলায় বিভিন্ন পূজা পার্বণ উপলক্ষ্যে বসে অসংখ্য মেলা। ঐসব মেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দোলপূর্ণিমায় ঘোষপাড়ার মেলা, বিরহী গ্রামের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মেলা, চাকদহের গণেশ জননীর মেলা, আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মেলা, শিবনিবাসের ভীমএকাদশীর মেলা, আশাননগরের লালন মেলা, বীর নগরের উলাই চণ্ডীর মেলা, কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলা, শান্তিপুরের রাসের মেলা, দেপাড়ার নৃসিংহদেবের মেলা, ভালুকের ভগবতী যাত্রার মেলা, মুড়াগাছার সর্বমঙ্গলার মেলা, ফুলখালির বারুণীস্থানের মেলা, নবদ্বীপের রাসমেলা।

এইসব প্রধান প্রধান মেলা ছাড়াও আরো বহু ছোট বড় মেলা বসে নদীয়ার বিভিন্ন গ্রামে ও গঞ্জে বিভিন্ন পূজা পার্বণে।

৯। সাহিত্য সাধনা—

এই নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন বহু বিখ্যাত কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকও গল্পকার। এঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় বাংলায় রামায়ণ পাঁচালির কবি কৃত্তিবাস ওঝাকে। কৃত্তিবাস ওঝা নদীয়া তথা বাংলার আদি কবি।

এর পরেই নাম করতে হয় অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের এবং কালী সাধক রামপ্রসাদের।

এরপরে উল্লেখ করতে হয় নীলদর্পণ নাটকের স্রস্টা দীনবন্ধু মিত্রের, স্বর্ণলতা উপন্যাসের লেখক বাগ আঁচড়ার তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের, 'পাখীসব করে রব' পদ্যের কবি বিল্বগ্রামের মদনমোহন তর্কালঙ্কারের।

রবীন্দ্রযুগের বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের খ্যাতি তো আজ সারা বাংলা জুড়ে। তাঁর দেশাত্মবোধক গান তো আজ প্রতিটি বাঙালীর মুখে মুখে ফেরে। হাসিরগানও লিখেছেন তিনি বহু। তাঁর যোগ্যপুত্র দিলীপ কুমার রায়ের সাহিত্য খ্যাতিও দেশজোড়া।

বিখ্যাত কবি করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এই নদীয়ারই সন্তান।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র নদীয়ার ফতেপুর গ্রামের সন্তান।

এছাড়াও নাম করতে হয় ভাজন ঘাটের বৈষ্ণব কবি ও সাধক কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী এবং একালের পরিচিত সাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তর।

বিখ্যাত গবেষক সাহিত্যিক আনন্দ বাজার পুরস্কার ভূষিত ডঃ সুধীর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও এই নদীয়ারই সন্তান।

এই জেলায় বর্তমানে আরো শত শত কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার ও প্রবন্ধকার সৃষ্টি করে চলেছেন অসংখ্য কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের।

এই জেলায় সাহিত্য বিষয়ক পত্র পত্রিকার সংখ্যা যে কতো তার হিসাব দেওয়া ভার।

১০। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

বহুকাল ধরেই নানাবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কৃতির চর্চায় নদীয়া জেলার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নদীয়া হয়ে উঠেছিল বঙ্গ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান।

বহুকাল ধরেই বাঙালীর নাট্য সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে নদীয়া। এই জেলায় যেমন রচিত হয়েছে বহু যাত্রাপালা ও নাটক তেমনি উঠে এসেছেন বহু বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীও। এই ধারা চলে আসছে চৈতন্য দেবের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত। বর্তমানে বহু নাট্যগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে জেলার নানাপ্রান্তে। প্রতিযোগিতাতেও নামছে ঐসব গোষ্ঠী সাফল্যের সঙ্গে।

নৃত্য এবং সঙ্গীত চর্চাতেও নদীয়া জেলা পিছিয়ে নেই। শহরে, গঞ্জে এমনকি গ্রামেও গড়ে উঠেছে বহু নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন প্রতিযোগিতাতেও এই জেলার ছেলেমেয়েরা সফল হচ্ছে।

এছাড়া বিতর্ক এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন তো চলছে প্রতি দিনই প্রতিটি গ্রামে গঞ্জে ও শহরে।

১১। খেলাধূলা—

খেলাধূলাতেও পিছিয়ে নেই এই জেলা। ফুটবল, ভলি, ক্রিকেট, দৌড়, লম্ফন, কাবাডি ও অন্যান্য খেলায় এই জেলার ছেলেমেয়েরা দেশের মুখ উজ্বল করে চলেছেন সর্বদাই। এশিয়ান গেমসেও পদক নিয়ে আসছেন এই জেলার জ্যোতির্ময়ী শিকদার ও সোমা বিশ্বাসরা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্য্যায় জেলার ছেলে মেয়েদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হচ্ছে অন্যরাও।

১২। নদীয়ার মৃৎশিল্প—

নদীয়া জেলার ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পের খ্যাতি তো আজ জগৎ জোড়া। কার্তিক চন্দ্রপাল, গোপেশ্বর পাল, বীরেন পাল, গৌতম পাল প্রভৃতি কতো বিখ্যাত মৃৎশিল্পী ও ভাস্করই না

জন্মেছেন এ জেলায়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকেই নদীয়ার মৃৎশিল্পীদের যে জয়যাত্রা শুরু হয় তা অব্যাহত আজো।

১৩। তাঁতশিল্প—

(ক) শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের খ্যাতিও জগৎ জুড়ে। এই তাঁত শিল্পের সূচনা হয়েছিল অন্তত আটশো বছর আগে বলে অনুমান করেন অনেকে। অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকেই শান্তিপুরে তাঁতশিল্পের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে এমনই ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

তবে এ জেলার ফুলিয়া, নবদ্বীপ, আইশতলা, কালী নারায়ণপুর ও অন্যান্য অংশেও তাঁতশিল্পের প্রচলন আছে বেশ ভাল রকমই।

১৪। লোকসংস্কৃতি—

নদীয়া জেলার লোকসংস্কৃতিও যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময়। গ্রামীন মানুষই এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এইসব লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ পরস্পরের কাছে আসে। একটা মহামিলনের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে এই সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে।

নদীয়ার লোকসংস্কৃতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় লোকগীতির।

(ক) লোকগীতি—

নদীয়া জেলার প্রধান লোকগীতি—

(১) **বোলান**— হলো বোলান গান। চৈত্রসংক্রান্তিতে এই গান শোনা যায় নদীয়ার বহু গ্রামেই। এই গানে বন্দনা, পাঁচালী ও যাত্রাপালাও থাকে। খুবই জনপ্রিয় এই গান।

(২) **ফকিরি**— দ্বিতীয় জনপ্রিয় লোকগীতি হলো ফকিরি গান। অম্বুবাচী, পৌষ সংক্রান্তি, বারুণী স্নান, ও মাঘী সংক্রান্তিতে বসে এই গানের আসর। ফকির দাউদ ছিলেন এই গানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

(৩) **বাউল**— বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই শোনা যায় বাউল গান। নদীয়ার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছেন বহু বাউল গায়ক।

(৪) **জারিগান**— মহরম পর্ব উপলক্ষ্যে গীত হয় জারিগান। সাধারণত মুসলমান প্রধান অঞ্চলেই শোনা যায় এই গান।

(৫) **ধুয়োজারি**— চাপড়া থানার চায়েন উদ্দীন হলেন বিখ্যাত ধুয়োজারি গানের গায়ক ও লেখক। এঁর গানে শোনা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুর।

(৬) **কপিলা গীতি**— আসলে এটা গরুকে বন্দনা করার গান। চাপড়া ও তেহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে এই গান।

(৭) **কবিগান**— হিন্দু, মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহু কবিয়াল আছেন। কালীগঞ্জের নৌশাদ আলী একজন নামকরা কবিয়াল।

(৮) রাখালী গানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য লোকগীতি।

(খ) লোকাচার ও ব্রতাদি—

(১) **ক্ষেত্রপূজা**— ১লা বৈশাখ সকলে মিলে ক্ষেত্র পূজো করে থাকে চাষীরা মাঠে গিয়ে। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের চাষীরা অংশ নেয় এই অনুষ্ঠানে।

(২) **ইতু পূজা**— গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসে এই পূজানুষ্ঠান করে থাকে।

(৩) **ব্যাঙের বিয়ে**— বৃষ্টির কামনায় মেয়েরা এই ব্রত অনুষ্ঠানটি করে থাকে নদীয়ার গ্রামে গ্রামে।

(৪) **তেরের পালানি—** ভাদ্র মাসের তের তারিখে গ্রামের মেয়েরা নদীর ধারে গিয়ে এই ব্রতটি পালন করে থাকেন।

(৫) **মাঠ পালনি ব্রত—** মেয়েরা ফকিরের নির্দেশমতো পাতা, চাল, তেল, সিঁদুর ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে মাঠের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে এই ব্রত পালন করে থাকেন।

(৬) এছাড়া জয়মঙ্গল, কুলাইচণ্ডী, বিপত্তারিণী, দোল, শিবরাত্রি, মাঘী ব্রত প্রভৃতি নানা ব্রতাদি পালন করেন নদীয়ার মেয়েরা।

(গ) লোক উৎসব—

লোক উৎসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চড়ক বা গাজন, নবান্ন এবং পৌষ সংক্রান্তির উৎসবই প্রধান উৎসব।

(ঘ) লোকনৃত্য—

নদীয়ার লোকনৃত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ঘোড়া নাচ। নাকাশীপাড়া থানার পাটুয়া ডাঙার জনপ্রিয় নাচ এটি। নানা আকারের শোলার ঘোড়ার তৈরী করে এই নাচ নাচে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষরা। এর সঙ্গে আবার পালা গানও থাকে।

(ঙ) পটুয়া—

রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণ কাহিনী পটে চিত্রিত করে পটুয়ারা এখনো গ্রামে গ্রামে গান শুনিয়ে বেড়ায়। এদের মধ্যে শান্তিপুরের হরি ডোম ও বেলাল মিস্ত্রী এবং কালীগঞ্জের রাম পটুয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পটুয়াদের আর দেখা যায় না বিশেষ।

(চ) লোকশিল্প—

নদীয়ার লোকশিল্পের মধ্যে বাঁশের তৈরী বিভিন্ন মাছ ধরার যন্ত্র, গোলা যেমন আছে তেমনি আছে মাটির পুতুল ও খেলনাও। আছে পাতার কাজ, তারের কাজ, কাঁথা শিল্প, বিচিত্র আলপনা, সূতোর কাজ, আসন, খড়ের চাল, মট্‌কা, পোড়ামাটির কাজ প্রভৃতি।

বড় আন্দুলিয়া

১। পরিচিতি—

কৃষ্ণনগর থেকে মাত্র তিরিশ কিলোমিটার দূরের এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম হলো বড় আন্দুলিয়া। পশ্চিম দিক দিয়ে কুলুকুলু ধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছে জলঙ্গী নদী। গ্রামের পূর্ব দিক ঘেঁসে চলে গেছে বাস রাস্তা। তার পরে বিস্তীর্ণ নীচু মাঠ। একদা ঐ মাঠের মধ্য দিয়েই বয়ে যেতো জলঙ্গী থেকে বেরিয়ে আসা সরস্বতী খাল এবং ছিল বিলও। বর্ষায় এখনো জলে ডুবে যায় ঐ মাঠ এবং বিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে ক্রমেই ভরাট হয়ে উঠছে ঐ মাঠ। কাঁচা রাস্তা তৈরী হয়েছে মাঠের মধ্য দিয়ে বাণিয়াখড়ি এবং আলফায় যাওয়ার জন্য। ঐদুই রাস্তার কিছু অংশ আবার বাঁধানো হয়েছে ইট দিয়েও। বিল মাঠে এখন সবুজের সমারোহ।

আশে পাশের আর পাঁচটা গ্রামের তুলনায় এই গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণুই বলা যায়। গ্রামটি অতিপ্রচীন। বৃটিশ যুগের গোড়ার দিকেও কলকাতা থেকে স্টীমার এবং বড় বড় মহাজনী নৌকা ভাগীরথী দিয়ে জলঙ্গীতে ঢুকতো এবং সরস্বতী নদী বেয়ে উঠতো গোয়ালন্দের ঘাটে। কিন্তু জলঙ্গীর বুকে চড়া পড়ায় নাব্যতা কমে যায় এবং বাণিজ্য তরী যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এই বড় আন্দুলিয়ার রমরমা ভাবটাও যায় কমে।

২। প্রাক্ ইতিহাস—

বড় আন্দুলিয়ার প্রাচীনত্বের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ঐ কাব্যের এক জায়গায় কবি বলেছেন—

—"ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম,
গাঙ্গিনীর পূর্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম।"

এর থেকেই বোঝা যায় প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বেও আন্দুলিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রাম ছিল নইলে ভারত চন্দ্রের কাব্যে 'বাগুয়ানের' সঙ্গে উচ্চারিত হতো না এই গ্রামের নাম।

শোনা যায় এই আন্দুলিয়ার কাছেই হাটরা খেয়াঘাট পার হয়ে রামচন্দ্রের ভবনে গিয়েছিলেন অন্নদাদেবী। ঐ ঘাটেই নৌকা বাইত ঈশ্বরী পাটনীঃ—

—"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।"

ঐ ঈশ্বরী পাটনীর বংশ ধরেরা এখনো ঐ ঘাটে খেয়া পারাপার করে দুধে ভাতেই আছে দেবীর বরে।

আবার কেউ কেউ বলেন আগে ওখানে যে বিশাল জোলা ছিল সেই জোলাতেই খেয়াদিত ঈশ্বরী পাটনী। এমনও হতে পারে যে অতীতে ঐ জোলা মিশে ছিল জলঙ্গীর সঙ্গে একাকার হয়ে এবং বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বর্তমানে পৃথক হয়ে গেছে।

বড় আন্দুলিয়ার কিছু দূরেই রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রাম আলফা, ফুলবাড়ী এবং বাণিয়াখড়ি গ্রাম। নদীর পশ্চিম তটে কিছু দূরেই রয়েছে ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল খ্যাত বড়গাছি গ্রাম। এই গ্রামেই ছিল হরিহোড়ের প্রাসাদ এবং ঐ প্রাসাদ ত্যাগ করেই চলে যান অন্নদাদেবী

রাম চন্দ্রের বাড়ী। দেবী যে পথ দিয়ে হেঁটে যান সেই হাঁটা পথেই তৈরী হয় এক স্রোতস্বতী ঐ স্রোতস্বতীই হলো লক্ষ্মীজোলা। তবে বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে জল থাকে না ঐ জোলায়। তাছাড়া আগে ঐ জোলায় কেউ লাঙল দিতনা বা কোন গর্হিত কাজ ও করতো না, লাঙল কাঁধে নিয়েই পার হতো চাষীরা ঐ জোলা। বর্তমানে নানা অনাচারে ঐ জোলা বুজে এসেছে প্রায়। ঘর বাড়ীও তৈরী হয়েছে তার ওপরে। লক্ষ্মী জোলা ভরাট হলেও অদূরে মাথা ভাঙা বিলটি কিন্তু আজো আছে।

লোকশ্রুতি তো অনেক কথাই বলে তার মধ্যে কতোটুকু কল্পনা আর কতটুকু যে ইতিহাস আছে তা খুঁজে বেরকরা সত্যিই কঠিন।

৩। নামকরণ—

সে যাই হোক আবার আন্দুলিয়ার কথাতেই ফিরে আসি। প্রাচীন এই গ্রামটির নামকরণ নিয়ে যে দুটি মত প্রচলিত আছে তার একটি হলো একদা আন্দুলিয়ার আশে পাশে যেসব খাল বিল—নদী ইত্যাদি ছিল সেই সব নদী খাল বিলে প্রায়ই উঠতো প্রবল আলোড়ন। এর পিছনে হয়তো ঝড় বা ভূকম্পনই কাজ করতো। ঐ আলোড়ন বা দোলা থেকেই এসেছে আন্দোলন। আন্দোলন/আন্দুলিয়া।

দ্বিতীয় যে মতটি প্রচলিত আছে সেটি হলো অতীতে এখানে বড় বড় আন্দোলন বা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল কোন এক সময়ে আর ঐ সব আন্দোলন বা বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই গ্রামের নাম হয়েছিল বড় আন্দুলিয়া। তবে ঘটনা যাই ঘটুক না কেন ঐ ঘটনা নিশ্চয়ই ভারতচন্দ্রের যুগের আগেই ঘটেছিল কেননা ভারতচন্দ্রের সময়েও এই বড় আন্দুলিয়া ছিল এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

৪। শিক্ষা—

এই গ্রামে রয়েছে ছেলেদের হাইস্কুল একটি এবং দুটি মেয়েদের হাইস্কুল। এছাড়া আছে চারটি প্রাথমিক স্কুল। অঙ্গনওয়ারীও আছে। আর আছে একটি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থা যেখানে নদীয়া ছাড়াও অন্যান্য জেলার বহু ছাত্রছাত্রী আসেন শিক্ষা নিতে। তবে সংস্থাটির প্রাচীর এবং হোস্টেলের অবস্থা খুবই বেদনাদায়ক।

৫। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

(ক) বড় আন্দুলিয়ার নানাবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। থিয়েটার, গান বাজনা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং নজরুল জয়ন্তী বেশ ঘটা করেই হয় প্রতি বছর। এ ছাড়া স্থানীয় শিক্ষণ সংস্থার মাঠে ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও হয় প্রতিবছর। বিভিন্ন স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয় ঐ মাঠে।

(খ) গদাধরের মেলা— গ্রামের প্রধান উৎসব হলো 'গদাধরের মেলা'। প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় ঐ উৎসব ও মেলা। বিখ্যাত কবি বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তন করেন এই মেলার। সাতদিন ধরে চলে এই মেলা। নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ও নানা দোকান পসারীতে জমজমাট হয়ে থাকে মেলা প্রাঙ্গন।

ঐ উপলক্ষ্যে চলে অংকন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, চিত্র প্রদর্শনী, থিয়েটার, যাত্রা, কবি গান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। হৈ হৈ-রৈ রৈ চলে সাত দিন ধরে। আকাশ বাতাস মুখরিত হয় শিশুদের উল্লাসে ও হাস্য পরিহাসে। জীবন হয়ে ওঠে মধুময়।

আন্দুলিয়ার বাজারটি ক্রমেই বড় হচ্ছে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে। জলঙ্গীর স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা এই গ্রামে বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উঠে

এসেছেন বেশ কয়েকজন কবি এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জাবেদ আলি, মহাদেব সাহা, জয়নাল আবেদিন, হজরত আলি ও রামকৃষ্ণদেব। আরো অনেকেই সাহিত্য সাধনায় রত আছেন এই গ্রামে।

পাশের গ্রাম শোনপুকুরেই রয়েছেন বিখ্যাত ঢোলবাদক শ্রী বাদল দাস মহাশয়।

৬। লোকগীতি—

এই অঞ্চলের প্রধান লোকসঙ্গীত হলো ফকিরী গান। এই লোক সঙ্গীতের প্রখ্যাত শিল্পী হলেন দাউদ ফকির। দাউদ ফকির ছিলেন আন্দুলিয়ার বাসিন্দা। তিনি লালন শাহ, কুবির গোঁসাই, যাদুবিন্দ, হাউরে গোঁসাই প্রভৃতি বিখ্যাত গীতিকারদের গান গেয়ে যেতে পারতেন অনর্গল। তাঁর আখড়ায় বছরের বিশেষ কয়েকটি তিথিতে সমাবেশ ঘটতো বাউল-দরবেশ ও ফকিরদের। হতো লোক উৎসবও। বর্তমানে ফকিরী গানের বিশেষ প্রচলন না থাকলেও দাউদ ফকির প্রায় একক চেষ্টাতেই এই গানের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে ছিলেন এককালে।

দাউদ ফকিরের শিষ্যবর্গ বর্তমানে ছড়িয়ে আছে এই জেলার নানা প্রান্তে।

৬। (ক) ব্রতাদি— এই গ্রামের হিন্দু মেয়েরা শিব পূজা, ইতু পূজা এবং মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও নানা মেয়েলি ব্রতাদি পালন করে থাকে।

৭। বর্তমান অবস্থা—

দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় বড় আন্দুলিয়া গ্রামেও আজ লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। ঘরে ঘরে এখন টি ভি এসেছে। এসেছে কেবল লাইন এবং ঘরে ঘরে টেলিফোনও। পোষাক পরিচ্ছদেও লাগছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বাড়ছে শিক্ষার হারও। মাঠে মাঠে সবুজ শস্যের লাবণ্যময় হাসির ছটা। পাঁচ মিনিট অন্তর ছুটছে বাস মসৃণ রাস্তা দিয়ে।

আধুনিক সভ্যতার শত উপকরণ সহজ লভ্য হবার পরেও কিন্তু আন্দুলিয়া বাসীও তার আশে পাশের গ্রামের লোকজন যে খুব সুখে আছে তা কিন্তু নয়। রাত্রি নামলেই চোর ডাকাতের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয় সবাইকেই। রাত্রি নামলেই এই এলাকার মাঠ-ঘাট-রাস্তা সব চলে যায় সমাজ বিরোধীদের দখলে। তখন জঙ্গলের আইন। অল্পকিছু পুলিশ থাকলেও নিরাপত্তা নেই মানুষদের। তাই সুযোগ পেলেই স্থানীয় মানুষ পালাচ্ছেন শহরের দিকে। এই অসহনীয় অবস্থার থেকে মুক্তি পাবার প্রার্থনাই বর্তমানে আন্দুলিয়ার অধিবাসীদের একমাত্র প্রার্থনা। কিন্তু মুসলিম প্রধান এই অঞ্চলে ভোট রাজনীতির স্বার্থে সমাজবিরোধীদের দমন করবে কে?

জিধা

১। পরিচিতি—

বড় আন্দুলিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে যে রাস্তাটা পুব দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলেই পড়বে একটা মাঠ। তার পরেই পড়বে একটা গ্রাম। হ্যাঁ এই গ্রামটাই হলো 'জিধা'। লোকে বলে জিধে।

২। দেবালয়—

একটু এগুলেই চোখে পড়বে দোতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারপরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে দুটি প্রাচীন গাছ। একটি নিমগাছ অন্যটি অশত্থ গাছ। নিমগাছের গোড়াটা বাঁধানো এবং একটি শিব মন্দিরও আছে ঐ বাঁধানো বেদীর ওপরে। নিত্য ফুল জল দিয়ে পূজোও হয় ঐ শিব মন্দিরে। মন্দিরটা ছোট। শিব লিঙ্গটিও ছোট। নিমগাছের গোড়ায় ছোট্ট শিব মন্দির কৌতুহল জাগায়।

অশত্থ গাছের গোড়াতে রয়েছে হরি মন্দির। ঐ হরি মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে—

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।
হরে রাম, হরে রাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রাম রাম, হরে হরে।"

এই হরিতলায় বিশেষ বিশেষ তিথিতে চলে হরিনাম সংকীর্তন। মুখর হয়ে ওঠে জিধার আকাশ বাতাস তখন হরিনাম গানে।

৩। শিক্ষা—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ানো হয়। জিধার ছেলেমেয়েরাই পড়ে এখানে। পড়াশুনার মান ভালই। এই স্কুল থেকে বহু কৃতী ছাত্র বেরিয়েছে এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনেই রয়েছে নাব্যভূমি। আসলে ওটি সরস্বতী নদী থেকে বেরিয়ে আসা একটি খাল। বর্ষাকালে ঐ খালটি জলে পূর্ণ হয়ে যায়। গ্রামের পূর্বদিকে রয়েছে সরস্বতী নদী। লোকে বলে খাল। ঐ নদী বা খালে সারা বছরই নৌকা এবং ডোঙা চলে। নদীটি চলে গেছে ফুল বাড়ীর পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে।

৪। ঠাকুরাণ তলা—

হিন্দু প্রধান গ্রাম জিধার উত্তর পূর্ব কোণে ঐ নদীর ধারে রয়েছে বিখ্যাত ঠাকুরাণ তলা। ঐ ঠাকুরাণ তলাটিকে বড় পবিত্রস্থান বলেই মানে গ্রামের সকলে। প্রাচীন অশত্থ, তেঁতুল এবং হিজল গাছের ছায়া ঘেরা এই ঠাকুরাণ তলাটি বড় মনোরম স্থান। স্থানটি বেশ নির্জন এবং শান্তিদায়ক। খাল এবং নদী দিয়ে ঘেরা দ্বীপ বিশেষ। হৃদয় শান্ত হয়ে আসে

এখানে বসলে। মকরসংক্রান্তির দিনে বিশেষ পূজা-পাঠ হয় এখানে। মেলা বসে একদিনের। বসে বাউল এবং ফকিরি গানের আসরও। ঐ দিন আশে পাশের গ্রাম যথা ফুলবাড়ী, আন্দুলিয়া, শোনপুকুর, আলফা, বানিয়াখড়ি ও অন্যান্য গ্রামের বহু লোকজনের ভীড় হয়। নির্জন ঠাকুরাণ তলা তখন গম্ গম্ করে ওঠে সহস্র জনতার ভীড়ে। তবে মূলত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং মহিলাদের ভীড়ই হয় বেশী। রঙীন এবং নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে আসে সবাই।

এই ঠাকুরাণ তলার ঠাকুরাণ হলেন আসলে রক্ষাকালী। তিনি গ্রামের সবাইকে রক্ষা করেন। কিন্তু এখানে স্থায়ী কোন মূর্তি নেই। ঐ সংক্রান্তির দিনেও কোন মূর্তির পূজা হয় না। তবে যূপকাষ্ঠে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়ে থাকে। লোকে মানত করে। মানত শোধও করে।

মকর সংক্রান্তির দিন ছাড়া ও বিশেষ কোন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ দেখা দিলে বা মড়ক লাগলেও মা ঠাকুরাণের বিশেষ পূজা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া চৈত্র মাসে মা-শীতলার পূজাও হয়ে থাকে।

৪। (ক) এখানে দশহরার সময় বিল এবং নদীর পূজাও হয়ে থাকে। নদী-বিলে মাছ মেলে, চাষের কাজে লাগে নদী ও বিলের জল। স্নান চলে বিলে ও নদীতে তাই নদীও বিলকে সন্তুষ্ট রাখা দরকার বৈকি। আসলে এই নদী ও বিল পূজা গঙ্গা পূজারই নামান্তর।

৪। (খ) এই ঠাকুরাণ তলাকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতি। এই জাগ্রত ও পরিত্র স্থানে কেউ মিথ্যা কথা বললে বা কোন অপকর্ম করলে সঙ্গে সঙ্গেই মিলে যায় কঠিন শাস্তি। শোনা যায় বহু দিন আগে কারা নাকি ছাগল চুরি করে এখানে লুকিয়ে রান্না করে খেয়েছিল কিন্তু দুদিন পরেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যায় তারা।

কে নাকি একবার এখানে এসে মিথ্যা কথা বলেছিল এর ফলে মুখ দিয়ে কথা বলাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার।

এখানে মল মূত্রাদি ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। একবার কারা নাকি ভুল করে এই ভূমিতে মূত্র ত্যাগ করেছিল ফলে তাদের মূত্রই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে অনেক চিকিৎসা এবং ঠাকুরাণ তলায় পূজা দেওয়ার পরেই মুক্তি পায় তারা।

এমন কতো সব কাহিনীই না ছড়িয়ে আছে ঐ ঠাকুরাণ তলাকে ঘিরে।

৪। (গ) কতো যুগ ধরে যে এখানে ঠাকুরাণের পূজা হয়ে আসছে বলতে পারে না কেউই। তবে সবাই জানে দেবী জাগ্রত। তিনি দেবী। মহাদেবী। কল্যাণময়ী এবং সকল বিঘ্ননাশিনী দেবী। তিনি একাধারে লক্ষ্মী কালী-মনসা-দুর্গা-শীতলা—সবই। যে যে ভাবেই দেবীকে ভাবুন বা ডাকুন না কেন তিনি সাড়া দেবেনই।

জিধার ঠাকুরাণ তলায় দাঁড়িয়ে স্থান মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হতে হতে বার বার মনে হয় এই ঠাকুরাণ দেবীর পূজা আসলে প্রাচীন বৃক্ষ পূজারই নামান্তর। এই ঠাকুরাণ দেবী আসলে জিধার মূর্তিহীন লৌকিক দেবীই।

৫। আর্থিক অবস্থা—

গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষক। পাকাবাড়ী বিশেষ নেই বললেই চলে। গ্রামের সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। সহজ সরল তবে ভীষণ ধার্মিক ছেলে বুড়ো সকলেই। চাষবাস আর মাছ ধরাই গ্রামবাসীদের মূল পেশা ও জীবিকার উৎস।

৬। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে প্রচলিত যে কাহিনীটি শোনা যায় সেটি হলো গ্রামবাসীরা পূর্বে ছিলেন খুবই জেদী এবং সেই জন্যই জেদ থেকে জিদে এবং জিদ্দ থেকে হয়েছে জিধা কালক্রমে—জিদ-জিধ্-জিধা-জিধে। অতীতের মতো এ গাঁয়ের লোক এখনো জেদী আছে কিনা জানিনা তবে ধর্মের ক্ষেত্রে এরা যে সত্যিই জেদী আজো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৭। পূজা পার্বণ ও ব্রতাদি—

এই গ্রামে বাৎসরিক দুর্গা পূজা কালীপূজা ও সরস্বতী পূজা হয় বেশ ধুমধাম করেই। মেয়েরা নানা ধরণের ব্রত ও পালন করে থাকে। যথা জয় মঙ্গলের ব্রত, বিপত্তারিণীব ব্রত প্রভৃতি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং ইতু পূজা ও ষষ্ঠী পূজা ও হয়ে থাকে বেশ নিষ্ঠা এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই।

ডাকে যদি ফুল বাড়ী

১। পরিচিতি—

জিধা গ্রামের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে যে প্রাচীন সরস্বতী নদী চলে গেছে তার অপর পারেই হলো প্রাচীন ঐ তিহ্য পূর্ণ গ্রাম ফুলবাড়ী। এই গ্রামকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা গল্প—নানা কাহিনী।

২। গীর্জা—

ফুল বাড়ীতে ঢোকার মুখেই চোখে পড়বে একটি গীর্জা। আগে ওখানে ছিল নীল কুঠী। সেই কুঠী বাড়ীর ওপরেই গড়ে উঠেছে বর্তমান গীর্জাটি। গীর্জার দক্ষিণ পূর্ব দিকে এখনো প্রাচীন নীল কুঠীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। জায়গাটা রীতিমতো উঁচু এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও বড় মনোরম। এখান থেকে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য একবার দেখলে তার চিরস্থায়ী ছাপ থেকে যায় মনে। উত্তর থেকে দক্ষিণে বর্ষায় খল্ খল্ বেগে ছুটে চলে সরস্বতী নদী। পশ্চিম এবং দক্ষিণের খোলা মাঠে সবুজের হিল্লোল। দখিনা বাতাসে হৃদয়ে লাগে দোলা। মন জুড়িয়ে যায়। হৃদয়ে জাগে গান। গুণ গুণ্ করে গাইতে ইচ্ছা করে—'মন মোর মেঘের সঙ্গী..........।

৩। নীলকুঠী—

সত্যিই কুঠীয়াল সাহেবদের স্থান নির্বাচনে রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আজ সেই কুঠীয়ালরা নেই কিন্তু ঐ কুঠী বাড়ীকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা গল্প-নানা কাহিনী। স্থানীয় লোকেরা বলে এখনো মাঝে মাঝে গভীর রাতে নাকি ঐ ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে এবং গীর্জার ভিতর থেকে ভেসে আসে নাচ গানের শব্দ। শোনা যায় হাসির রোল। কখনো কখনো ভেসে আসে ঘোড়ার ক্ষুরের খটা খট্ শব্দও। দেখা যায় বিচিত্র সব ছায়া মূর্তিও। কিন্তু ভোরের আলো ফোটার আগেই অদৃশ্য হয়ে যায় ঐ সব গান হাসি-নাচ এবং শব্দের সঙ্গে ছায়া মূর্তিরাও।

(ক) লোকশ্রুতি— গভীর রাতে বর্ষাকালে ঐ নদীর বুকে নাকি এখনো দেখা যায় এক সাহেবকে ডোঙা বাইতে। তার পরে ডোঙা বাইতে বাইতে হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায় ঠাকুরাণ তলার পাশ দিয়ে কোথায় যেন। আর দেখা যায় না তাঁকে।

শোনা যায় নাকি বহুকাল আগে এক কুঠীয়াল সাহেবের সখ হয়েছিল ডোঙা চালানোর। মাঝে মাঝেই তিনি ডোঙায় চেপে চলে যেতেন দূরে হাল বাইতে বাইতে। তার পরে হঠাৎ একদিন পড়ে যান ঝড়ের মধ্যে। উল্টে যায় ডোঙাটা। সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যান ঐ সাহেব। আর পাওয়া যায় না তাঁকে।

ফুলবাড়ীর লোকেরা বলে ঐ সাহেবের প্রেতাত্মাই নাকি এখনো ঘুরে বেড়ায় ঐ নদীর জলে। তবে বর্ষাকালের জ্যোৎস্নারাতেই শুধু দেখা যায় তাঁকে ভরা নদীর বুকে—অন্য সময়ে নয়।

বর্তমান গীর্জাটি রোমান ক্যাথলিক গীর্জা। বর্তমানে ফাদার হলেন 'আব্রাহাম' তবে দেখা শোনা করেন সুরঞ্জন মণ্ডল। ফুলবাড়ীতে বর্তমানে ২৫ ঘর মতো খৃষ্টান সম্প্রদায়ের

মানুষ বস বাস করে। আগে এখানে বেশ বড় গীর্জা এবং স্কুল ছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মিশন চলে যায় ভবর পাড়ায়।

গ্রামের অর্ধেকেরো বেশী মানুষ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। বাকী সবই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের মানুষই নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম কর্ম এবং উৎসবাদি পালন করে থাকেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ফুলবাড়ী গ্রাম।

৪। প্রাক্ ইতিহাস ও ফুলমতী—

ফুলবাড়ী গ্রামটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি ও ধ্বংসাবশেষ। আছে প্রাচীন বট এবং অশ্বত্থ গাছও। ঐ সব ঢিবিরই একটি হলো ফুলমতীর ঢিবি।

লোকে ঐ ঢিবিটি দেখিয়ে বলে ঐখানেই ছিল ফুলমতীর প্রাসাদ। তিনি ছিলেন রাজকন্যা। প্রাসাদের নীচে ছিল সুড়ঙ্গ পথ। সেই সুড়ঙ্গ পথটি নাকি নদীর তলা দিয়ে চলে গেছে আলফা গ্রামের হেরম্ব পালের দীঘি পর্য্যন্ত।

লোকে বলে ঐ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নাকি ফুলমতী ওপারে যেতেন তাঁর বোনের সঙ্গে দেখা করতে।

আবার কেউ কেউ বলে আসলে ঐ গোপন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ফুলমতী অভিসারে যেতেন তাঁর প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে।

অনেকে মনে করেন ফুলমতী আসলে প্রাচীন আলফারই কোন রাজকন্যা। সুড়ঙ্গ পথেই আলফার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তিনি এবং ঐ দীঘিতে যেতেন স্নানের জন্যই যেহেতু ঐ দীঘির জল ছিল অতি পবিত্র।

হেরম্ব দীঘির উত্তরের সুড়ঙ্গ পথটি আজো দেখা যায় তবে ফুলমতীর ভিটার সুড়ঙ্গ পথটি বন্ধ হয়ে গেছে বহু আগে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার ফুলমতীর প্রাসাদ বলে যে ঢিবিটি রয়েছে সেটি স্তুপাকৃতির ঢিবি। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে ওপারের দিকে। ইটগুলোও সরু এবং পাতলা। আল ফার প্রাচীন প্রাসাদের ইটের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। যদি ঐ ধ্বংস স্তুপটি নিছক কোন বৌদ্ধ বিহার বা স্তুপই হয়ে থাকে তাহলে ফুলমতীর ভিটা বলে খ্যাত হলো কেন—প্রশ্ন এটাই।

লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েই কি এটা হয়েছে? সত্যিই এখানে কি কোন প্রাসাদ ছিল? নাকি বৌদ্ধ স্তুপ অথবা বৌদ্ধ বিহার ছিল?

যথাযথ ভাবে খনন কাজ না চালিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ কঠিন।

৫। ফুলবাড়ী কি বৌদ্ধ গ্রাম ?

বর্তমানে ফুলমতীর ভিটা বা ঢিবি বলে কথিত ঐ ধ্বংস স্তুপের ওপরে ছোট্ট কুড়ে বেঁধে বসবাস করছেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীযুক্ত শান্তিবাবু।

তিনি বছর কয়েক আগে ঐ ঢিবির ইট সরাতে গিয়ে অশোক স্তম্ভ যুক্ত একটি,ছোট ইট পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন প্রাচীন একটি রৌপ্য মুদ্রাও। ঐ গুলি বর্তমানে নগেন্দ্রনগরের মোহিত রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ শালায় জমা আছে বলে জানান এই লেখককে তিনি।

শান্তি বাবুর মনে হয়েছে ঐ ইটটি ছিল সম্ভবত শীলমোহর এবং মুদ্রাটি প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের বা কম পক্ষে পাল রাজাদের আমলের তো বটেই।

বছর কয়েক আগে ঐ ঢিবিতে তিনি ইটের স্তুপ সরাতে গিয়ে পেয়েছিলেন একটি কঙ্কাল। তবে ঐনব কঙ্কালটি ছিল বসা অবস্থায়। কঙ্কালটি তুলে তিনি ফেলে দেন নদীর জলে।

ঐ কঙ্কালটি কি কোন সাধকের ? তিনি কি সমাধি অবস্থাতেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন ? তিনি কি কোন বৌদ্ধ সাধক বা সাধিকা ছিলেন ? এসব নানা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায় মনের মধ্যে।

ঐ কঙ্কালটিই লোকশ্রুতির উৎস সেই বিখ্যাত ফুলমতীর নয়তো ? কে জানে ?

প্রসঙ্গত বলা দরকার ফুলবাড়ীর থেকে আলফার দূরত্ব সামান্যই। নদী বাদ দিলে একটা মাঠই শুধু ব্যবধান যেখানে ছিল রাজাদের হাতি ঘোড়া এবং সেনাদের আবাস স্থল এবং পরবর্তী কালের কাছারী বাড়ী।

অতীতে প্রাচীন আলফার সঙ্গে যে ফুলবাড়ীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং এই দুটি স্থানই ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রাম এমন অনুমান করা হয়তো খুব অসঙ্গত নয়।

এমনো হতে পারে যে যুগে আলফা গ্রামে প্রচীন বৌদ্ধ রাজা ছিলেন সেই যুগেই হয়তো ফুলমতীর অভিলাষে এখানে প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল। তার পরে শত্রুরা যখন আলফা আক্রমণ করে সব কিছু ধ্বংস করে তখন এই ফুলবাড়ীর প্রাসাদও ধ্বংস হয় তাদের হাতে এবং ফুলমতী স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিয়ে মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকেন।

প্রাচীন গ্রাম ফুলবাড়ী বৌদ্ধ গ্রাম ছিল কিনা কিংবা আলফার সঙ্গে এ গ্রামের নিবিড় যোগ সূত্র ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ফুলমতী নামে কোন অসামান্যা রমণী যে এই গ্রামে বাস করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফুলমতী যে প্রাচীন ঐ বিহার বা প্রাসাদেই থাকতেন এ কথাও অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। নইলে ঐ প্রাচীন ঢিবিকে লোকে এতকালধরে ফুলমতীর ঢিবিই বা বলে আসবে কেন ?

ফুলমতীকে সবাই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন বলেই এ গ্রামের নামও কালক্রমে ঐ ফুলমতীর নামেই হয়ে যায় 'ফুলবাড়ী' অর্থাৎ ফুলমতীর বাড়ী।

৬। লোকগীতি—

ফুলমতী যে ঠিক কে ছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। কিন্তু তিনি যে সুন্দরী স্নেহময়ী এবং সকলের প্রিয় পাত্রী ছিলেন তা লোক কবির রচিত লোকগীতির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে আছে আজো—

—"ফুলকন্যা ফুলমতী ঐ সে নদীর ধারে।
পুণ্যবতী সরস্বতী হাস্যময়ী সেরে।
শত্রু এলো কখন রাতে জানলো না তা কেউ।
জানলো বুঝি দীঘল রাতে ঐ সে নদীর ঢেউ।
ফুল ভিটাতে ফুল ফোটে না—নেই পুণ্যবতী।
ফুল বাড়ীতে নিশুত রাতে—সেই সত্যবতী।"

—এই গান শুনে কার না হৃদয় কাঁদে ? কার না বুকের ভিতরে হায় হায় করে ?

শুটিয়ায়

১। পরিচি। .

সীমান্তবর্তী গ্রাম শুটিয়া। গ্রামটি প্রাচীন। অনেকে মনে করেন এই শুটিয়া আসলে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রাম। বর্তমানে আশে পাশের গ্রামের কেউ পারত পক্ষে এই গ্রামের নাম উচ্চারণ করে না। উচ্চারণ করলে তিনবার থুথু ফেলে প্রায়শ্চিত্য করে। এই গ্রামের নাম কোন কারণে যদি করতেই হয় তবে বলে 'শুখ্নো আদা'। ভীষণ অযাত্রা নাকি এই গ্রামের নাম। যদিও শুটিয়ার অধিবাসীরা একথা মানতে চায় না কোন মতেই। গ্রামবাসীদের দাবী পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামের থেকে ধনে মানে সংস্কৃতিতে শুটিয়া উন্নত বলেই অন্যরা হিংসা করে এই সব কথা বলে থাকে।

২। বৌদ্ধ গ্রাম কিনা—

মহামহো পাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে গভীর অনুসন্ধানের পরে আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধদের ঘৃণা করা হতো এককালে তাদের নানাবিধ অনাচারের জন্য। এমনকি যে গ্রামে তারা বাস করতো সেই গ্রামকেও ঘৃণার চোখে দেখতো অন্যরা। হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ধারণা সত্য হলে মেনে নিতে হয় যে এককালে শুটিয়ায় বৌদ্ধরা বাস করতো এবং নানা অনাচারে জড়িয়ে পড়েছিল তারা যার ফলে ঐ সব বৌদ্ধদের তো ঘৃণা করা হতোই সেই সঙ্গে ঐ গ্রামকেও ঘৃণায় চোখে দেখতে শুরু করেছিল অন্যান্য গ্রামের লোকেরা। সেই ধারাটাই আজো চলছে।

৩। গাজন উৎসব—

তবে শুটিয়ার কাছের গ্রাম হলো ফুল বাড়ী এবং আলফা। ঐ দুই স্থানেই বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন মিলেছে। এই গ্রামে বৌদ্ধযুগের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত না হলেও এখনো এই গ্রামের প্রাচীন বটতলায় গাজনের উৎসব হয় চৈত্রের শেষে। হয় ধর্মারাজের পূজাও। সন্ন্যাসীরা নিয়ম মেনেই শুদ্ধাচারে ধর্মরাজের পূজার্চনা করে থাকেন গাজনের সময়। আগে চড়কও হতো। বাণ ফোঁড়া, আগুনে ঝাঁপ দেওয়াও হতো এবং নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করতেন তখন গাজনের সন্ন্যাসীরা। ধর্মরাজ যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা একথা না বললেও চলে।

৪। স্কুল অফিস—

সীমান্তবর্তী শুটিয়া গ্রামটি এখনো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঞ্চায়েত অফিস এবং বি. এস. এফ ক্যাম্প।

৫। জমিদার বাড়ী—

এই গ্রামের জমিদার ভোলানাথ ব্রহ্মদের বিশাল প্রাসাদতুল্য বাড়ীটি বর্তমানে জৌলুষহীন হয়ে পড়লেও একদা যে বেশ জাঁকজমক পূর্ণ ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। পুরণো কাছারী বাড়ীটির গথিক স্টাইলের স্তম্ভগুলোও লক্ষ্য করার মতো যদিও সে বাড়ীটি পরিত্যক্ত আজ। ব্রহ্ম বাড়ীর অনেকেই আজ দেশের নানা স্থানে উচ্চপদে কর্মরত বা উচ্চপদে কাজ করার পরে অবসর নিয়েছেন।

এই গ্রামের ব্রহ্মদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন নীলকুঠীর দেওয়ান এবং সেই সূত্রেই নাকি এদের অবস্থা ফিরেছিল বলে জানা যায়। খুব সম্ভবত পাশের ফুলবাড়ী নীলকুঠীরই দেওয়ান ছিলেন ব্রহ্মদের পূর্ব পুরুষ। আগে খুবই ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হতো ব্রহ্ম বাড়ীতে। এখনো পূজা হয় তবে সেই আগের মতো ধুম ধাম হয় না আর।

গ্রামের প্রাচীন বট গাছটার বয়স যে কতো বলতে পারে না কেউই। আদি গাছের শুখনো কাণ্ডটা লেগে আছে অশত্থ গাছের সঙ্গে। দু পাশে ঐ প্রাচীন বটের ঝুরি থেকে যে দুটি গাছ হয়েছে তারাই ধরে রেখেছে তার স্মৃতিকে। এই স্থানটাই হলো গ্রামের রক্ষা কালীতলা এবং গাজনতলাও বটে। দুটো ছোট মন্দির তৈরী করা হয়েছে এখানে।

৬। পূজাপার্বণ—

মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রক্ষাকালীর পূজা দেওয়া হয়। তখন পাঁঠা বলিও দেওয়া হয়। কার্তিকের অমাবস্যায় খুবই ধুমধাম করে কালী পূজা হয়। বাজিও ফাটানো হয় প্রচুর তখন। পাঁঠা বলিও হয় তখন।

এছাড়া ষষ্ঠী পূজাও হয় এই গাছ তলাতেই বেশ হৈ হৈ রৈ রৈ করে এবং ঐ পূজাটি মূলত গাঁয়ের মেয়েদেরেই পূজা।

চাপড়া ষষ্ঠী, ইতু পূজা এবং অম্বুবাচী ও লক্ষ্মী পূজা ইত্যাদিও করে থাকে গ্রামের হিন্দু মেয়েরা। এছাড়া ব্যাঙের বিয়েও দিয়ে থাকে মেয়েরা বৃষ্টির কামনায়।

এই গ্রামে আগে বিশাল বিশাল আম বাগান ছিল তবে বর্তমানে বাগান কেটে ফেলেছে অনেকে। তাছাড়া দেশ ভাগের ফলে বহু বাগান এবং জমি চলে গেছে ওপার বাংলায়। তবে এই অঞ্চলের জমি এখনো যথেষ্ট উর্বর। এবং গ্রামের লোকের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই।

৭। সীমান্ত ও সীমান্তরক্ষী—

এই গ্রামের পূর্ব দিকেই রয়েছে হৃদয়পুর গ্রাম। গ্রামটি সীমান্তবর্তী বলেই এখানে বসেছে বি. এস. এফ ক্যাম্প। ব্রহ্মদের কাছারী বাড়ীতেই প্রথমে ক্যাম্প হয়েছিল কিন্তু একবার এক রক্ষী বুঝি পাশের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায় তার পরেই ঐ ক্যাম্পটি চলে আসে বর্তমান স্থানে।

বর্তমানে সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে এবং প্রহরাও চলছে কাঠোর ভাবে নিয়ম মেনে ফলে চোরাচালান কমেছে যেমন সীমান্তে তেমনিই গ্রামে ডাকাতি চুরি বা ছিনতাইও বন্ধ হয়ে গেছে পুরো পুরি বলে জানালেন হরেন মণ্ডল ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা।

৮। স্বাস্থ্যকেন্দ্র—

তবে গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্যাপারে খুবই হতাশ। এখনো কোন ডাক্তার বা নার্স আসেননি কাজে যোগ দিতে ফলে গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থেকে কোন উপকারই পাচ্ছেন না বলে জানালেন। এ ব্যাপারে গ্রামের নেতারা জেলাস্তরে যোগাযোগ করছেন বলে অবশ্য শোনা গেল পঞ্চায়েত অফিসে বসে।

৯। যোগাযোগ ব্যবস্থা—

এই গ্রামটি বর্ধিষ্ণু হলেও এবং এখানে সীমান্ত রক্ষীদের ক্যাম্প থাকলেও গ্রামের রাস্তার অবস্থা কিন্তু করুণ। ফুলবাড়ী অথবা শোণপুকুর যেদিক দিয়েই ঢোকা যাক্ এ গ্রামে রাস্তা অতি দুর্গম। গ্রামবাসীদের একান্ত ইচ্ছা শোণপুকুর গামী রাস্তাটি যেন পাকা হয় কেননা বাস রাস্তাটি ঐ দিকেই যে। ঐ রাস্তার অভাবে প্রতিদিন শত শত গুটিয়া বাসীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বর্ষাকালে দুর্ভোগের অন্ত থাকে না গ্রামবাসীদের।

আলফা কি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রাম ?

১। প্রাক ইতিহাস—

নদীয়া জেলার চাপড়া থানার ১০ নং মৌজার নাম আলফা। গ্রামটি অতি প্রাচীন। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বহু প্রাচীন ঢিবি এবং অসংখ্য দীঘি এবং বড় বড় বট ও অশ্বত্থ গাছ। এখানে পাওয়া গেছে বহু প্রাচীন মূর্তি, প্রস্তর ও মৃৎ পাত্র। পাওয়া গেছে বহু প্রাচীন মুদ্রা এবং অসংখ্য কড়িও। প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে পাওয়াগেছে বেশ কয়েকটি নর কঙ্কালও।

২। লোকশ্রুতি—

এই 'আলফা' গ্রামকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে বহু কথা। বহু লোকশ্রুতির কাহিনী। লোকে বলে 'আলফা' আসলে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রাম। পালরাজাদের রাজধানী ছিল এখানেই। তবে এই পাল রাজাদের নাম বলতে পারেন না কালীপদ দাস বা গ্রামের প্রাচীন—প্রাচীনাদের কেউই। তবে অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গ্রামের প্রাচীন দীঘির পাড়ে রাখা প্রস্তর স্তম্ভের গায়ে খোদিত বুদ্ধমূর্তিটি তুলে ধরতে ছাড়েন না।

কিছু দূরেই আলফার উত্তর দিকে রয়েছে এক বিশাল বটগাছ। গাছটার বয়স যে কতো বলতে পারে না কেউই। কেউ বলে একহাজার। কেউ বলে দুহাজার। ঐ গাছের মূল কাণ্ডটি নেই। ঝুরি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বট গাছ গুলোর। বেশ উঁচু জায়গাটা। লোকে বলে এটাই হচ্ছে 'কাপাসডাঙা' এবং এখানেই থাকতো ঐ পাল রাজাদের সেনারা। পাশেই ছিল নাকি ঘোড়ার আস্তাবলও।

কাপাস ডাঙার দক্ষিণে রয়েছে একটা প্রাচীন দীঘি। লোকে বলে হেরম্বদীঘি। ঐ দীঘির উত্তব দিকে রয়েছে একটা ইট বাঁধানো সুড়ঙ্গ পথ। ঐ সুড়ঙ্গ পথটি নাকি চলে গেছে ফুল বাড়ী পর্য্যন্ত। ঐ সুড়ঙ্গ পথকে নিয়েও ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী। লোকে বলে ঐ পথ দিয়ে নাকি রাজ কন্যা বা রাজমাতা ও রাণীরা স্নান করতে আসতেন। আবার কেউ বলেন ঐ দীঘিতে নাকি নৌকাও বাঁধা থাকতো এককালে।

আলফার প্রাসাদ, ধ্বংস স্তুপ বা রাজার পরাজয়ের কাহিনী সম্বন্ধেও ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী। লোকে বলে—পাল রাজাদের ধনসম্পদ লুঠ করার জন্য প্রায়ই শত্রুরা হানা দিত। কিন্তু পাল সেনাদের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে যেতো শত্রুরা। রাজ প্রাসাদের প্রহরায় থাকতো এক বিশ্বস্ত সেনা। সকলকে সে সতর্ক করে দিত বটগাছের মাথা থেকে। রাজপুরীর দরোজা বন্ধ হয়ে যেতো সঙ্গে সঙ্গেই আর সৈন্যরাও প্রস্তুত হয়ে বাধা দেবার সুযোগ পেত। ফলে শত্রুপক্ষ পিছু হঠতে বাধ্য হতো। বেশ কয়েকবার ব্যর্থ হয় শত্রুরা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ সেনাকে হত্যা করে রাজপুরী দখল করে শত্রুরা।

এমন কতো সব মজার মজার কাহিনীই না ছড়িয়ে আছে অলাফায়।

৩। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ নিয়েও শোনা যায় নানা কথা। কেউ কেউ মনে করেন অতীতের নীলকর সাহেব আলফ্রেডের নামেই এই গ্রামের নামকরণ হয়েছে 'আলফা'। —আলফ্রেড-আলফ্রে-আলফা।

অন্য একটি মতে জানা যায় যে এই অঞ্চলের কোন এক জমিদার তাঁর কোন তহশীলদারকে বলেন, 'তুমি একদিনে যতটুকু জমি মেপে নিতে পারবে সেই পর্য্যন্তই জমি তোমাকে দেব।' ঐ তহশীলদার মাপতে মাপতে এই গ্রামের 'আল' পর্য্যন্ত এসে বসে পড়েন আর উঠতে পারেন না। জমিদার কথা রাখেন। ঐ পর্যন্ত জমিই ফাও হিসাবে দান করেন তাঁকে। সেই থেকেই এই গ্রামের নাম হয় 'আলফা'।

আবার কেউ কেউ 'আলফা' নামের পিছনে গ্রীক শব্দের প্রভাব আছে বলে গ্রীক ঐতিহ্য খোঁজারও চেষ্টা করেন।

চাপড়া থেকে হৃদয়পুরের দিকে যে পাকা রাস্তাটি চলেগেছে তারই পাশে পড়ে আলফা গ্রাম। এই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলটির পাশেই দীঘি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া যায় দুই জালাভর্তি' কড়ি। এক সময়ে কড়ি ছিল বিনিমিয় মাধ্যম। যখন কড়ি যার ক্ষমতা তার এই অবস্থাছিল দেশে সেই সময়কারই প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল এই আলফা। এখানে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত সভ্যতা। তখন এ গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যেতো সরস্বতী বা জলঙ্গীর শাখা। নদীর খাত রয়ে গেছে এখনো। ঐ খাতে পুকুর কাটতে গিয়ে বছর কয়েক আগেও পাওয়া গেছে নৌকার ধ্বংসাবশেষ।

৪। কড়ি ও মুদ্রা—

অবশ্য কড়ি এবং অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে এই অঞ্চলের আশে পাশের ফুলবাড়ী, ছোট আন্দুলিয়া, বানিয়াখড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামেও এবং এই সব গ্রাম গুলিরই অবস্থান মোটামুটি একই নদীখাতের পূর্ব প্রান্তে।

প্রাচীনকালে নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই গড়ে উঠতো বাণিজ্য কেন্দ্র এবং নগরগুলো। আর এই সব গ্রাম গুলোতেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন প্রাসাদ সমূহও।

আলফার প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়তে গিয়ে মিলেছে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কঙ্কাল। সম্ভবত এরা জলপ্লাবনের শিকার অথবা মহামারী কিংবা গুপ্তহত্যার নিদর্শন।

কড়ি ছাড়া এখানে পাওয়া গেছে রামসীতার মূর্তিযুক্ত প্রাচীন রূপোর মুদ্রা, এবং বৃটীশ যুগের রূপো ও তামার মুদ্রা। পাওয়া গেছে ভাঙা মৃৎপাত্র এবং পাথরের পাত্রাদিও। অর্থাৎ বেশ কয়েকটি যুগের সভ্যতার সাক্ষী এই প্রাচীন গ্রাম আলফা।

৫। ব্রহ্মাণী তলা—

আলফা গ্রামের ব্রহ্মাণী তলায় বাঁধানো বেদীর ওপরে প্রস্তর স্তম্ভের গায়ে খোদিত বুদ্ধমূর্তি পূজিত হচ্ছেন অন্য দুটি প্রস্তর খণ্ডের সঙ্গে। স্তম্ভটি পাওয়া গেছে পাশের বাড়ীর ভিত খুঁড়তে গিয়ে। তবে পাথরের স্তম্ভ বা ভাঙা পাথরের খণ্ড পাওয়া গেছে প্রচুর এই গ্রামে। শোনা যায় ঐ সব পাথরে যারা পাদেয় তারা নাকি নানা দুঃস্বপ্নও দেখে থাকে।

ব্রহ্মাণী তলায় চৈত্র মাসের শেষে হয় গাজনের উৎসব। তবে বর্তমানে চড়ক হয় না। আগে সন্ন্যাসীরা এক মাস ব্যাপী ব্রত পালন করতেন এবং বাণ ফোঁড়া চড়কে ঘোরা, আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো কঠিন কঠিন ক্রিয়াকলাপ দেখাতেন। তবে বর্তমানে সেসব হয় না মাত্র সাত দিনের ব্রত পালন করেন সন্ন্যাসীরা।

ব্রহ্মাণী দেবীর কোন মূর্তি নেই। প্রস্তর খণ্ডেই পূজিত হচ্ছেন তিনি। অনেকে মনে করেন এই ব্রহ্মাণী ব্রহ্মার শক্তি নন ইনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবী। আর গাজনের উৎসব যে ধর্মরাজের উৎসব সেকথা বলাই বাহুল্য।

এই সব নানা উপাদান ও তথ্যের ভিত্তিতে অনেকেই মনে করেন একদা এই গ্রামটি ছিল বৌদ্ধগ্রামে। তবে কোন্ পাল রাজা এখানে রাজত্ব করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন।

এমন হতে পারে হয়তো পালরাজাদের আত্মীয় কোন সামন্ত রাজাই রাজত্ব করতেন এখানে। পালরাজাদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পালরাজ রামপালের রাজ্য সীমা মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তবে তাঁর পুত্র কুমার পাল দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ করেছিলেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে বঙ্গ-বদ্বীপের বেশ কিছু অংশ পালরাজাদের অধীন ছিল। ঐসব বদ্বীপের মধ্যে নদীয়াও ছিল। কুমার পাল ১১২০ থেকে ১১২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে বসেন। বৈদ্যদেব কুমার পালের পক্ষে নৌযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সম্ভবত, ঐ সময়েই এই অংশে কোন বৌদ্ধ সামন্ত রাজ রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

আলফা গ্রামের উত্তরে হেরম্বপাল দীঘি বলে যে প্রাচীন দীঘিটি আছে ঐ দীঘিটি যাঁর নামে সম্ভবত সেই হেরম্বপালই ছিলেন এখান কার রাজা। ঐ হেরম্বপাল পালবংশীয় রাজাদের বংশসম্ভূত হওয়াই সম্ভব যদিও ঐ নামের কোন পাল রাজার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আরো তথ্যানুসন্ধান করা দরকার বলেই মনে হয়।

নদীয়ায় পালবংশের পরে আসেন সেন বংশীয় রাজারা। লক্ষ্মন সেন বখতিয়ার খিল্‌জির হাতে পরাজিত হয়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। বখতিয়ারও নদীয়া জয় করে চলে যান উত্তরবঙ্গে। সেই সময়েই সম্ভবত নদীয়ার সমৃদ্ধ জনপদগুলি লুণ্ঠিত হয় এবং ধ্বংসও হয়। অনেকের অনুমান ঐ সময়েই জলঙ্গীর স্নেহ পুষ্ট সরস্বতীর তীর বর্তী এই সমৃদ্ধ আলফা ও ধ্বংস হয়। ধ্বংস হয় পার্শ্ববর্তী ফুলবাড়ী, ছোট আন্দুলিয়া এবং বানিয়াখড়ি অঞ্চলও এবং সেই সঙ্গে ধর্মান্তরিত হয় এই অঞ্চলের নেড়া মাথার বৌদ্ধরাও। যার ফলে এখনো এই অংশের মুসলমানদের বলা হয় নেড়ে।

কিন্তু তাই বলে আলফার ইতিহাস ওখানেই শেষ হয় না। এই অংশে বৌদ্ধযুগ শেষ হলেও সবাই যে ধর্মান্তরিত হয় তা কিন্তু নয়। সাধারণত বৌদ্ধ এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাই ধর্মান্তরিত হয়। বহু হিন্দু তখনো এই অংশে বসবাস করতে থাকেন। হিন্দুযুগের নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রামের মাঠের মধ্যে পাওয়া গেছে শিব লিঙ্গ, বালগোপাল এবং নারায়ণ শিলাও। বর্তমানে ঐ লিঙ্গ এবং মূর্তি ও শিলা আছে মদনপুরের কেদারনাথ চক্রবর্তীর বাড়ীতে। প্রতি বছর চড়কের সময়ে তিনি ঐসব মূর্তি-লিঙ্গ ও শিলা নিয়ে আসেন এখানে বিশেষ পূজার জন্য।

৬। বর্তমান অবস্থা—

বর্তমানে গ্রামটি উত্তর দক্ষিণ দুটি ভাগে বিভক্ত। উত্তরে মুসলমান পল্লী এবং দক্ষিণে হিন্দুপল্লী। আগে যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন গ্রামে তাঁরা সবাই চলে গেছেন গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র।

হিরণ্য পুকুর, কাণাপুকুর, ময়রাপুকুর হেরম্ব পাল দীঘি প্রভৃতি সব দীঘি গুলোর সঙ্গেই নানা লোকশ্রুতির কাহিনী জড়িয়ে আছে।

এই গ্রামে রয়েছে ষষ্ঠীতলা, ব্রহ্মাণী তলা, সোনাতলা প্রভৃতি স্থানগুলো নানা কাহিনী বুকে নিয়ে। সোনাতলায় নাকি সোনার মুদ্রা পেয়েছিল কেউ কেউ বলে শোনা যায়।

এখানে যেসব মুদ্রা পাওয়া যায় তার বেশীর ভাগই অবশ্য বৃটীশ যুগের। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এইসব অঞ্চলে ব্যাপক নীলচাষ শুরু হয়েছিল। ফুলবাড়ী, হৃদয়পুর ও আশে পাশের গ্রামে নীলকুঠীও ছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে নীলকর সাহেব 'আলফ্রেড়' এর নাম থেকেই এই গ্রামের নামকরণ হয়েছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় বলেই মনে হয়।

এই অংশ থেকে নীলকর সাহেবরা চলে গেলে তাঁদের কুঠী বাড়ীসহ সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেন নফর চৌধুরী মহাশয়। আলফাও চলে যায় তাঁদের জমিদারীর মধ্যে। পরাধীন যুগে আলফার সঙ্গে মেহেরপুরের যোগাযোগেই ছিল বেশী। কিন্তু দেশ ভাগের পরে কৃষ্ণনগরের সঙ্গেই যোগাযোগ বাড়ে তবে ততদিনে আলফা তার প্রাচীন গৌরব বিসর্জন দিয়েছে।

৭। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

এই গ্রাম আগে নানাবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রছিল। যাত্রা-পাঁচালী কবিগান হতো। হতো গানের প্রতিযোগিতাও। এ গ্রামের কেষ্টযাত্রা, গুণাই যাত্রা, মনসাব গান শুনতে দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসতো বলে জানালেন শৈলেন ঘোষ মশাই।

পালাগান লিখতেন কালীপদ দাস মশাই। তিনি সূত্রধরের ভূমিকায় অভিনয় ও করতেন বলে জানাগেল।

দুর্লভ স্বর্ণকার লিখতেন শ্যামাসঙ্গীত ও ভাটিয়ালী গান। তিনি নিজে গাইতেন ও এসব গান। বড় দরদী গলা ছিল তাঁর।

এ গ্রামের বিখ্যাত সানাই বাদক ও সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন কেদার পণ্ডিত মহাশয়।

অভয় পল্টন ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ। গাছপালা থেকে তিনি ওষুধ তৈরী করতেন এবং রোগীদের চিকিৎসা করতেন।

সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়ায় বহু লোক চলে গেছেন গ্রাম ছেড়ে। গ্রামের বহু কৃতী সন্তান ছড়িয়ে আছে দেশের নানাপ্রান্তে।

আলফা গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন ঢিবি। ঐ সব ঢিবি খুঁড়তে গিয়ে অনেকেই যেমন পুরনো ইট, পাথরাদি পেয়েছেন তেমনি আবার টাকা পয়সা গহনাদিও পেয়েছেন। সিন্দুকও পেয়েছেন জগদীশ বিশ্বাসের মতো অনেকে তবে কে কি পেয়েছেন বলতে চাননা কেউই।

৮। লোককথা—

আলফার পুরনো বাগান এবং মাঠ ও বটগাছ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করতেও শোনা যায় নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার কথা।

আম বাগানে ছোটবেলায় পাঁচু ঘোষ ও ননী ঘোষ দেখেছেন মাটির ঘড়া গড়িয়ে যাচ্ছে এবং বম্ বম্ ধ্বনি উঠছে।

আলফার মাঠেও কাপাস ডাঙ্গার বটতলায় গভীর রাতে দেখা যায় ছায়ামূর্তি ঘুরছে। শোনা যায় খটাখট্ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দও। এছাড়াও কতো কি।

৯। ব্রত পার্বণাদি—

আলফা গ্রামে আগে নানাবিধ ব্রত পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। দুর্গাপূজা, কালী পূজা এখনো হয়। ষষ্ঠী পূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানও হয়। মেয়েলি ব্রতের মধ্যে ইতুপূজার প্রচলন এখনো আছে এই গ্রামে। সুমনা বিশ্বাস ও চৈতলীরা এখন যে মন্ত্রে ইতুপূজো করে সেই মন্ত্রটি হলো—

— "বারো মাসে বারো পূজা।
অঘ্রাণ মাসে ইতু পূজা।
আমি ঠাকুর হ্যাব্‌লা।
ফুলদিই খাব্‌লা খাব্‌লা।
বনের ফুল, মাথার চুল

সেই সঙ্গে ইতুর ফুল—
তুলতে গেলাম দশটা।
শুনে এলাম সই কথাটা—
ছোট ঘর বড় ঘর সবটা।"

১০। উপসংহার—

বর্তমানে আলফার কুমোর পল্লী গড়ে উঠেছে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপরে। চুল্লী তৈরী হয়েছে প্রাচীন সরু ও পাতলা ইট দিয়েই। ঐ সব ইট অন্তত হাজার বছরের পুরনো তো বটেই—আরো আগেরো হতে পারে।

এখানে যেসব কড়ি পাওয়া গেছে সেগুলো বেশ ছোট এবং মসৃণও বটে। বহু হাতে ব্যবহৃত হয়েছে ঐসব কড়ি এবং সম্পন্ন ব্যক্তিরা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন মাটির নীচে এখনকার টাকা পয়সার মতোই ঐসব বিনিময় মাধ্যমকে।

ভগ্নস্তুপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, মূর্তি, মুদ্রা, কড়ি এইসব তথ্য থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এখানে অতি প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল এক সমৃদ্ধ সভ্যতা। আলফা শুধু যে বৌদ্ধ গ্রাম বা গঞ্জ হিসাবেই খ্যাতছিল তাই নয় এর ইতহাস হয়তো আরো প্রাচীন। এখানে খনন কাজ চালালে বেরিয়ে আসতে পারে আরো বহু প্রাচীন উপাদান। কথা কয়ে উঠতে পারে অনাদি অতীত। এই গ্রামের কালীপদ দাস, কৃষ্ণপ্রসাদ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষেরা অন্তত সেই মতই পোষণ করেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার কাপাস ডাঙায় চৌধুরী বাবুদের কাছারী বাড়ী ছিল পঞ্চাশ বছর আগেও। এক ফকির এসেও আস্তানা গেড়েছিলেন ওখনে বট তলায়। তবে এখন কোন চিহ্নই নেই সেসবের। এখন শুধুই হায়-হায় ধ্বনি চারপাশে।

শোণ পুকুরে

১। পরিচিতি—

শুটিয়ার কাছেই রয়েছে শোণপুকুর। কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুরগামী বাস রাস্তায় বড় আন্দুলিয়ার পরেই পড়ে এই শোণপুকুর গ্রাম। গ্রামটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। হিন্দুরা এই গ্রামে সংখ্যালঘু। কাছেই সীমান্ত। চুরি ডাকাতি লেগেই আছে এই গ্রামে। রাত্রি নামলেই সমাজবিরোধীদের দাপাদাপি। নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা গ্রামেই থাকেন কিন্তু তাঁরাও অসহায়। ফলে ভাগ্যের হাতেই নিজেদের সঁপে দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয় গ্রামবাসীদের। খুব বেশীমাত্রায় চুরি ডাকাতি হলে অবশ্য পুলিশের গাড়ী ঢোকে গ্রামে। দুচারদিন টহল দেয় পুলিশ। আবার যেকে সেই। অবশ্য এই করুণ অবস্থা নদীয়ার সীমান্তবর্তী প্রায় সব গ্রামেরই।

২। শিক্ষা ও জীবিকা—

এই গ্রামে প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। চারজন পঞ্চায়েত মেম্বার। গ্রামবাসীদের প্রায় সবাই কৃষিজীবী। দুচার জন ব্যবসা এবং চাকরীও করেন। গ্রামে রয়েছে দুটো প্রাথমিক বিদ্যালয়। আছে দুটি শিশু শিক্ষার কেন্দ্রও। তবে শিক্ষার মান মোটেই আশা ব্যঞ্জক নয়।

গ্রামে একটি লাইব্রেরী এবং সমবায় কেন্দ্র থাকলেও বর্তমানে দুটিই ম্রিয়মান। তবে নির্বাচনের মুখে দুটিই নাকি বেশ সচল হয়ে ওঠে বলে জানালেন গ্রাম বাসীরা।

৩। ধর্মচর্চাও পূজাদি—

গ্রামে রয়েছে দুটি বড় মসজিদ। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ঈদ, মহরম এবং অন্যান্য মুসলিম পর্ব বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই পালন করে থাকেন। বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই 'মেহফিল' হয়ে থাকে মাঝে মাঝেই।

গ্রামের সংখ্যা লঘু হিন্দুদের বেশীর ভাগই এসেছেন ওপার থেকে। তাঁরাও দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান করে থাকেন।

এই মুসলিম প্রধান গ্রামে মুসলিমদের দাপট থাকলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কিন্তু অটুট আছে বলেই জানালেন রিয়াজুল সাহেবরা।

গ্রামের উত্তর পাশ দিয়ে চলে গেছে খাল। লোকে বলে সরস্বতীর খাল। ঐ খালটিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এখনো এবং চাষের কাজেও ব্যবহৃত হয় ঐ খালের জল। সবুজ শস্যের ক্ষেত ঘিরে রেখেছে গ্রামটিকে। পথে পথে ঘুরছে অসংখ্য রাজহাঁসের দল। তবে গ্রামের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। পথ চলা দায়। পঞ্চায়েত সদস্যরা উদাসীন।

৪। বাদল ঢুলী—

এই গ্রামেই বেড়ে উঠেছেন বিখ্যাত ঢোলবাদক বাদল দাস যাঁকে 'বাদল ঢুলী' বলে এক ডাকে চেনে বাংলার মানুষ। তাঁর ঢোলের কাঠিতে বেজে ওঠে কবিতার সুর। রেডিও এবং টি. ভিতেও তিনি ঢোল বাজিয়ে শুনিয়েছেন। দেশের বিভিন্নস্থানে তিনি ঢোল বাজিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন অগণিত রসিক জনের। পশ্চিমবঙ্গ সরকাও স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁকে। শোণপুকুরের গর্ব এই বাদল দাসের দৌলতেই সারাদেশে ছড়িয়েছে এই শোণপুকুরের নাম।

এছাড়াও রয়েছেন বিখ্যাত সানাই বাদক। এঁরও খ্যাতি কম নয়। রয়েছেন জাবেদা খাতুনের মতো মহিলাপল্লী কবিও। আছেন আরো বেশ কয়েকজন গায়ক এবং বাদকও। নিয়মিত সঙ্গীত এবং খেলাধূলার চর্চা হয় গ্রামে।

মুসলিম প্রধান এই শোণপুকুর গ্রামটি প্রাচীন গ্রাম। জনসংখ্যা বৃদ্ধিরহারও খুবই বেশী। কিভাবে গ্রামটি মুসলিম প্রধান গ্রাম হয়ে উঠেছে সে আলোচনায় না গিয়ে গ্রামটির নাম করণের ইতিহাস নিয়ে যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে এই গ্রামে এবার সেই সম্বন্ধেই আলোকপাত করা যাক্।

৫। নামকরণ—

শোনা যায় এই গ্রামটি একদা ছিল নফর পাল চৌধুরীর জমিদারীর অন্তর্গত। গ্রামের লোকেরা নাকি নিয়মিত খাজনা দিত। গ্রামে ফসলও হতো খুবই ভালো। জমিতে নাকি সোনা ফলতো তাই পাল চৌধুরীরা এই গ্রামের নামদেন সোনারপুর বা সোনারপুকুর। পরে লোকের মুখে মুখে বিবর্তিত হয়ে সোনার পুকুর হয়ে দাঁড়ায় শোণপুকুর। (সোনা-শনা-শোন-শোণ।)

অন্য একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে এই গ্রামের মাঠে নাকি আগে শোণ চাষ হতো। সেই জন্যই গ্রামের নাম হয় শোণপুর। গ্রামে অসংখ্য পুকুর থাকার জন্যে ধীরে ধীরে শোণপুরের জায়গায় হয়ে দাঁড়ায় শোণপুকুর।

আবার কেউ কেউ বলেন গ্রামে ছিল আগে সেনেদের পুকুর। ঐ সেন পুকুর থেকেই কালক্রমে হয়ে দাঁড়ায় শোণপুকুর। সেনপুকুর-সন্পুকুর-শোণপুকুর।

আবার কেউ কেউ মনে করেন অতীতে এই গ্রামে প্রচুর 'শোণক' বা 'শোণাল' ফুল হতো এবং ঐ সব ফুল হতো পুকুরের পাড়েই। তাই 'শোণক পুকুর' নাম হয় প্রথমে এবং পরে মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে হয়ে যায় শোণক-শোণ (পুকুর।)

অবশ্য আরো একটা মতেরও প্রচলন আছে। অনেকে মনে করেন এই গ্রামের কোন পুকুরের জল ছিল রক্তাভ বা রক্তবর্ণের এবং ঐ 'শোণিত' বর্ণের পুকুর থেকেই নাম-হয় 'শোণ পুকুর।'

এই গ্রামে অসংখ্য পুকুর আছে এবং গ্রীষ্মকালে জল শুখিয়ে গেলে কোন কোন পুকুরের জল ঈষৎ লাল রঙের দেখায় বটে। কাজেই শোণিত বর্ণের পুকুর থেকে এই গ্রামের নাম 'শোণপুকুর' হওয়াটা আশ্চর্য্য নয় মোটেই।

অতীতে যে ভাবেই নামকরণ হয়ে থাক না কেন বর্তমানে গ্রামবাসীরা সেসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে চাননা তারা নিজেদেব রুজি রোজগার এবং আর্থিক চিন্তাতেই ব্যস্ত।

বাণিয়া খাড়ি

১। পরিচিতি—

বড় আন্দুলিয়া থেকে মাত্র এককিলোমিটার দূরেই বাণিয়াখাড়ি গ্রাম। মাঝখানে রয়েছে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বিল মাঠ লোকে বলে বাণিয়া খাড়ির বিল মাঠ। গ্রামটি মুসলিম প্রধান গ্রাম। গ্রামে ঢোকার মুখেই মাঠের মধ্যে পড়ে গ্রামের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি বিদ্যালয়। নাম 'বাণিয়াখড়ি উদয়ণ সঙঘ প্রাথমিক বিদ্যালয়।' ছাত্র সংখ্যা ভালই। কিন্তু মান তেমন ভাল নয় তবে খেলাধূলায় স্কুলটার খ্যাতি আছে গোটা জেলায়। নবীন শিক্ষকরা এবিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল। তাছাড়া বিদ্যালয়ের নিজস্ব বিশাল খেলার মাঠটাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে। স্কুলটা নূতন।

তুলনায় এই গ্রামের দ্বিতীয় স্কুলটা কিন্তু খেলা ধূলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশাল দীঘির পাড়ে দ্বিতীয় স্কুলটার খেলাধূলার জায়গাও নেই। তবে পড়াশুনার মান উদয়ন সংঙেঘর চাইতে কিছুটা ভাল। এই স্কুল থেকে অনেক কৃতী ছাত্র বেরিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। ছাত্র সংখ্যাও প্রচুর।

২। দে দীঘি—

গ্রামটি অতি প্রাচীন গ্রাম। বর্তমানে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বিশাল দে-দীঘির পাড়েই গড়ে উঠেছে বেশীর ভাগ বসত বাড়ী। দীঘিটা বেশ প্রাচীন এবং নাব্যখাতের ওপরেই কোন এককালে কাটা হয়েছিল ঐ দীঘিটি। ঐ বিশাল দীঘিটি বর্তমানে 'দে দীঘি' বলেই পরিচিত। গ্রামের প্রবীন লোকেরা বলেন যে ঐ দীঘিটি অতি প্রাচীন তবে দে বাবুরা ঐ দীঘিটা কিনে নিয়ে সংস্কার করেন সেই থেকেই ঐ দীঘি 'দে দীঘি' নামেই খ্যাত। দীঘিটিতে আগে প্রচুর পাঁক ছিল গরু-বাছুর নামলে আর উঠতে পারতো না তবে দে বাবুদের হাতে পড়ে এখন দীঘিটি পাকমুক্ত হয়েছে এবং খুব ভাল মাছ চাষও হচ্ছে ঐ দীঘিতে।

আলফা এবং ছোট আন্দুলিয়ার মাঝখানেই পড়ে বাণিয়াখাড়ি গ্রাম। প্রাচীন দীঘিটাই এই গ্রামের প্রাণ এবং প্রাচীন দিনের ইতিহাসের সাক্ষীও বটে ঐ দীঘিটি।

৩। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে শোনা যায় যে আগে এখানে বাস করতো সোনার বেণেরা। তাদের বাড়ী থেকেই এ গ্রামের নাম হয় বেনের বাড়ী-বাণিয়া বাড়ী-বাণিয়া খাড়ি।

ঐ দীঘিটির পূর্ব পাড়ে ছিল পাল বা কুমোরদের পাড়া। এখনো প্রবল বর্ষণ হলেই পূর্বপাড়ের মাটি সরে যায় এবং চোখে পড়ে দীঘির কিনারে প্রচুর ভাঙা চোরা হাড়ি বা মাটির তৈজসপত্রের ভগ্নাংশ। সেই সঙ্গেই পাওয়া যায় প্রাচীন মুদ্রা ইট এবং নানা প্রত্ন দ্রব্যাদিও। মেলে প্রাচীন কড়িও।

গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে ঐ সব ইট কড়িও ভাঙা চোরা মৃৎ পাত্রাদির সন্ধান মিললেও মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেল না শত চেষ্টা করেও যদিও জানাগেল প্রাচীন মুদ্রাদি পেয়েছে অনেকেই।

সোনার বেণে বা পালরা যে কতোকাল আগে এই গ্রামে বসবাস করতো তা বলতে পারেন না কেউই। কেন না বণিক বা পালদের কোন বংশধরই আজ আর নেই এই গ্রামে।

তবে এই অঞ্চলে যে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এককালে তার প্রমাণ ছাড়িয়ে আছে উত্তরের 'আলফা' এবং দক্ষিণের ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে।

৪। নাব্যভূমি ও প্রাক ইতিহাস—

তাছাড়া এই অঞ্চলের নাব্যভূমি বা মরানদীর খাতগুলোর মূলে রয়েছে প্রাচীন ভৈরব নদীর শুখিয়ে যাওয়া শাখা-উপশাখারা। এই সব শাখা বা উপশাখার তীরবর্তী অঞ্চলেই প্রাচীনকালে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনপদগুলো। জলঙ্গীর ধারা এসে ভৈরব নদীর প্রবাহকে ম্লান করে দেওয়ার পরেই ভৈরব ধীরে ধীরে শুখিয়ে যায় এবং তার শাখা উপশাখাগুলো পরে খালে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে নদীয়া জেলার গেজেটিয়ারে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে—

"In this thana (chapra) there are a large number of dead river courses which apparently belonged to the old Bhairab before the Jalangi cuts across its course. Most of the depressions lie in between the Ichamati and Jalangi."

—(Nadia Page-14, Edition 1978)

বলা বাহুল্য বাণিয়াখাড়ি বিল বা নাব্যভূমি এবং আলফা ও ছোট আন্দুলিয়ার নাব্যভূমি বা মরানদীর খাতগুলো যে আসলে অতীতের ভৈরব নদীর শুখিয়ে যাওয়া শাখা-উপশাখা সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহ নেই কারুরই।

বাণিয়াখাড়ির দক্ষিণ পূর্ব দিকে পীচ রাস্তার ওপারের জমিও নাব্য এবং বর্ষাকালে জলে ভরে যায় তখন বিশাল বিল মাঠের রূপ নেয়। পাঁচশো কিংবা হাজার বছর আগে যে ঐসব এলাকা জলমগ্ন সাগর সদৃশ ছিল এমন অমুমান করেন অনেকে। প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত নদীয়ার এই অংশ একদা যে জলমগ্ন ছিল এমন উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে। চাপড়া থানার পূর্ব দক্ষিণে পড়ে কৃষ্ণগঞ্জ থানা। ঐ অংশেও রয়েছে এমন বিস্তীর্ণ নাব্যভূমি বা বিল মাঠ। এ প্রসঙ্গে নদীয়া জেলা গেজেটিয়ারে যথার্থ্যই বলা হয়েছে—

"Like chapra thana this thana also appears to have been on the course of old Bhairab. At present the Ichamati flows through the thana and the churni takes off just from the south. This area was under the oscillations of the Mathabhanga till recently." (Nadia)—Page-15

অনেকে মনে করেন একদা বাণিয়াখাড়ি ছিল বিস্তীর্ণ জলাশয়ের মুখে বা খাড়ির মুখে। ভৈরবের শাখা উপশাখারই তৈরী করেছিল ঐ খাড়ি। আর ঐ খাড়িতে বেণে বা বাণিয়াদের বসতি ছিল বলেই ঐ জনপদের নাম হয়েছিল 'বাণিয়াখাড়ি'। এখান থেকেই স্থানীয় বণিকরা একদা দূর দূরান্তে নৌপথে বাণিজ্যে যেতেন।

এই বাণিয়াখাড়ি যদি এককালের বিখ্যাত স্থান নাইই হতো তাহলে বাণিয়াখাড়ির নামে নিশ্চয়ই 'বাণিয়াখাড়ি বিলে'র নাম প্রচলিত হতো না যদিও আজ এই গ্রামটি একান্তই অখ্যাত এবং অবজ্ঞাত গ্রাম।

'দে-দীঘির' পশ্চিম পাড়ে এবং পূর্ব পাড়ে বাড়ীর ভিত খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে বেশ কয়েকটি নরকঙ্কাল। তবে গ্রামের প্রাচীন লোকরা বলেন ঐসব কঙ্কালগুলো এতই পুরণো যে হাত দিতেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। ঐসব কঙ্কালগুলো যে কতো প্রাচীন বলতে পারেন না কেউই। আলফা, ফুলবাড়ী এবং ছোট আন্দুলিয়ায় যেসব নর কঙ্কাল পাওয়া গেছে সেগুলোর সঙ্গে এখানে প্রাপ্ত নর কঙ্কাল গুলোর সাদৃশ্য আছে বলেই মনে করেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মান্নান সাহেব এবং হারুনরা।

গ্রামের উঁচু ঢাব এবং দীঘির পাড়ে খনন কাজ চালালে হয়তো পাওয়া যেতে পারে প্রাচীন দিনের অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান।

৫। জনবসতি ও পার্বণাদি—

বর্তমানে এই গ্রামে মাত্র বিশঘর হিন্দুর বাস। গ্রামের নব্বুই ভাগ লোকই মুসলমান। সবেবরাত, ঈদ, মহরম প্রভৃতি মুসলিম পর্বগুলো যথাযথ আবেগের সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে তবে হিন্দুদের পূজা উৎসব তেমন হয় না বললেই চলে। হিন্দুরা এই গ্রামে কোণঠাসা হয়ে পড়ে আছে এক দিকে। কেউ কেউ চলেও গেছে প্রাণের ভয়ে।

৬। বর্তমান অবস্থা—

গামে রাজনৈতিক দলাদলি চূড়ান্ত পর্য্যায়ে। কেউ কাউকে মানে না। সব্বাই মাতব্বর হতে চায়। মারামারি খুনোখুনি লেগেই আছে। চোর-ডাকাত আর সমাজ বিরোধীদের দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত। রাত্রি নামলেই বাণিয়াখাড়ির মাঠ-ঘাট চলে যায় সমাজবিরোধীদের দখলে॥

৭। যোগাযোগ ব্যবস্থা—গ্রামের রাস্তা এখনো সেই মধ্যযুগের। বর্ষায় এককোমর কাদা ভেঙে ছেলে মেয়েদের স্কুলে যেতে হয়। অন্য সময়েও গভীর গর্ত দিয়ে পথচলা দায়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের রাস্তা ঘাট বা শান্তি শৃঙ্খলার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই বলে দুঃখ করেন প্রবীণরা। কিন্তু তাঁদের কথা শোনে কে? পরামর্শই বা নেয় কারা? মান্নান সাহেবদের তাই নীরবেই মুখ বুঝে সহ্য করে যেতে হচ্ছে এইসব কিছু রুদ্ধ কণ্ঠে বাঁশীর সঙ্গীত হারিয়ে।

ছোট আন্দুলিয়া

১। পরিচিতি—

চাপড়া ছাড়িয়ে করিমপুরের দিকে যে পীচ রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তার ডানদিকেই পড়বে সবুজ গাছের ছায়ায় ঢাকা প্রাচীন একটা গ্রাম। ঐ গ্রামটির পশ্চিম দিকে রয়েছে প্রাচীন নদীরখাত। যেমন রয়েছে আলফা আন্দুলিয়া ও বানিয়াখড়ির পাশে। ঐসব খাত বর্তমানে বিল বলে খ্যাত হলেও একদা ছিল ভৈরবের শাখা-উপশাখা। তখন ঐসব শাখা নদী বেয়ে নৌকা ছুটতো। তিরতির করে বয়ে যেতো বাণিজ্য তরী দেশ-বিদেশের বন্দরে। বাণিয়াখড়ি আলফা এবং এই সব অঞ্চলে তখন ছিল সমৃদ্ধ ধনী বণিকদের বসবাস। সেসব কাহিনী হয়তো হাজার—দু হাজার বছর কিংবা তারো আগেকার কথা। তখন দেশে বিনিময় মাধ্যম ছিল কড়ি। সুবর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার ছিল খুবই কম। প্রাচীন বাংলায় কড়ির যে ব্যাপক প্রচলন ছিল তার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে আমাদের সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। —'ফেল কড়ি মাখো তেল' কিংবা কাণাকড়ির দাম নেই, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'—প্রভৃতি প্রবাদ ও গল্পের শিরোনাম সেই সাক্ষ্যই দেয়।

২। প্রাক্ ইতিহাস—

পার্শ্ববর্তী আলফা এবং বাণিয়াখড়ির মধ্যে এই ছোট আন্দুলিয়াতেও পাওয়া গেছে বহু কড়ি এবং প্রাচীন মাটির হাঁড়ি কলসী, এবং মুদ্রাও। এই তো কিছুদিন আগেই পাওয়া গেছে জালাভর্তি কড়ি। এই গ্রামের এক চাষী 'তালেফ মণ্ডল' তার বাড়ীর পশ্চিম পাশের ডোবাটা একটু বড় করার জন্য মাটি কাটছিল ঐ ডোবায়। হঠাৎ ঠকাস্ করে উঠলো একটা শব্দ। বুক কেঁপে উঠলো 'তালেফের'। ভাবলো গুপ্তধনই বুঝি পেয়ে গেছে সে। সাবধানে মাটি সরিয়ে দেখতে পেল একটা প্রাচীন কলসী। ভিতরে রাশি রাশি কড়ি। কড়িগুলো মসৃণ এবং ছোট। বহুহাত ঘুরেই যে কোন ধনী বণিক বা বড়লোকের ঘরে জমা হয়ে ছিল ঐসব কড়ি সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ ওগুলোর মূল্য না থাকলেও এককালে ছিল। নইলে সযত্নে কলসীতে ভর্তি করে মাটির নীচে পোঁতাই বা থাকবে কেন ঐসব ধবধবে সাদা কড়ি ? খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল চারধারে। ছেলে বুড়োর দল ভীড় করেছিল কড়ি দেখতে। বর্তমান লেখককেও ছুটতে হয়েছিল সেখানে। মাত্র হাত দুয়েক মাটির নীচেই মিলেছিল ঐ কড়িগুলো। আকারে ছোট খুবই মসৃণ ঐ কড়িগুলো। দু তিনশো কড়ি তালেফ দিয়েছিল আমকেও। সেই সঙ্গে সেই কলসীর ভাঙা টুকরোও কিছু। আমার সংগ্রহে আছে সেই সব প্রাচীন বেশকিছু কড়ি। কড়িগুলো সবই যে একই আকারের তা কিন্তু নয়। তবে বর্তমান কড়ির সঙ্গে ঐসব প্রাচীন কড়ির পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। বর্তমানে ঐ ধরণের কড়ি চোখেই পড়েনা।

মনে রাখতে হবে সেই যুগে ব্যাঙ্ক ছিল না। অতএব মাটির নীচে ধনসম্পদ পুঁতে রাখাই ছিল ধনসম্পদ বাঁচানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। এই অঞ্চলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের যে বসবাস ছিল ঐ সব কড়িই তার প্রমাণ। আর ঐ সব কড়ির ব্যবহার থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে ন যে এই অঞ্চল একদা বেশ সমৃদ্ধই ছিল। বহু বণিক এবং ধনী ব্যক্তির বাসছিল এখানে।

(ক) রামচন্দ্রপুর—

প্রসঙ্গত বলা দরকার এই ছোট আন্দুলিয়া গ্রাম এখনো 'আলফা অঞ্চলের অন্তর্গত। তবে এ গ্রামের আদি নাম ছিল 'রামচন্দ্রপুর'। পাশেই বড় আন্দুলিয়া গ্রামের সঙ্গে এ গ্রামের পার্থক্য অথবা সাদৃশ্য নির্ণয়ের জন্যই সাম্প্রতিক কালে এই নামকরণ করা হয়েছে সম্ভবত।

তবে ঐ রামচন্দ্র কে ছিলেন তা বলতে পারেন না কেউই। ইনি কি কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র সমাদ্দার ? অথবা শ্রীরামচন্দ্র নাকি রামপাল ? কিংবা কোন সামন্ত রাজা অথবা জমিদার ? ইতিহাস নিরুত্তর।

এই গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী হজরত আলিশেখ বা খোদা বক্স মল্লিক বেশকিছু প্রাচীন ঢিবি এবং দীঘির সন্ধান দিলেন। ইতিহাস মুখ গুঁজে আছে ঐসব ঢিবি এবং দীঘিতে। খনন কাজ চালালে হয়তো উঠে আসতে পারে হারানো দিনের কথা ও কাহিনী কিন্তু এগিয়ে আসে কে?

(খ) নরকঙ্কাল—

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে নেমে সোজা পূর্ব দিকে হাঁটা দিলেই দুপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত জানাবে সাদর আমন্ত্রণ। তার পরে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ছেড়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই চোখে পড়ে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের পাশেই উঁচু ঢিবি। ঢিবির ওপরে একটা অশত্থ গাছ। বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্কের ঐ ঘরটির নীচেও ছিল ঢিবি। ক্লাবের ছেলেরা ঐ ঢিবির মাটি খুঁড়তে গিয়ে পেয়ে যায় পুরনো ইঁটের ভিত্। আরো খোঁড়া খুঁড়ি করতেই বেরিয়ে আসে পর পর বেশ কয়েকটা কঙ্কাল। বেশদীর্ঘ ছিল কঙ্কাল গুলো। মাথা গুলোও ছিল বেশ বড় বড়। কঙ্কাল গুলো ছিল খুবই প্রাচীন। হাত দিতেই নাকি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় সব।

প্রশ্ন জাগবে ঐসব কঙ্কাল গুলো কাদের ? তাঁরা ওখানে সমাধিস্থই বা হলেন কিভাবে ? কতদিন আগে সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন তাঁরা ? ওটা কি সমাধিস্থান ছিল ? নাকি কোন প্রাসাদ ছিল ? অথবা ঐসব কঙ্কাল যাঁদের তাঁদের কি গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল ? নাকি ঘুমন্ত অবস্থায় জলপ্লাবনে বা অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন তাঁরা ?

গ্রামের প্রবীণ লোকেরাও কোন সদুত্তর দিতে পারেন না এসব প্রশ্নের। দু একজন বর্গী হামলার কথাও অবশ্য বলেন।

এ অঞ্চলে কঙ্কাল পাওয়া গেছে আলফা, ফুলবাড়ী ও বাণিয়াখড়িতে এবং অন্যান্য গ্রামে পাওয়া গেছে পুরণো পাথর ইট, মুদ্রা এবং মৃৎ পাত্রদিও। এসব উপাদান সাক্ষ্য দেয় প্রাচীন দিনের ইতিহাসের। কিন্তু কোন লিপি বা মুদ্রা হাতে না পাওয়া পর্য্যন্ত সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন। ফলে নির্ভর করতে হয় লোকশ্রুতির ওপরেই।

৩। জনবিন্যাস ও ধর্ম—

বর্তমানে এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই মুসলমান। এদের অনেকেরই উপাধি মণ্ডল দাস ও সর্দার রয়েছে এখনো। এদের অধিকাংশই যে ধর্মান্তরিত মুসলমান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যাঙ্ক তথা অশথ তলার পাশেই রয়েছে পীরদীঘি। অর্থাৎ পীরের স্থান ছিল পাশের ঐ উঁচু ঢিবিতেই এমন অনুমান করা যেতে পারে।

গ্রামের উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত দীঘিগুলো সাক্ষ্যদেয় প্রাক মুসলিম যুগের। আমাদের অনুমান ফুলবাড়ী-আলফা-বাণিয়াখড়ি এবং ছোট আন্দুলিয়া তথা রামচন্দ্রপুর প্রাচীন কালের একই উন্নত সভ্যতার সাক্ষ্যবহনকারী অঞ্চল। বন্যা বা ভূমিকম্প অথবা মহামারী নয়

তুর্কী আক্রমণের সময়েই ধ্বংস হয়েছে এই সব সমৃদ্ধ জনপদ। তার পরে পীর দরবেশ এসে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং ধর্মান্তরিত হয়েছে এই এলাকার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অথবা বৌদ্ধরা।

৪। **শিক্ষা**—

এই ছোট আন্দুলিয়ার আটহাজার অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি হাইস্কুল রয়েছে গ্রামে। খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেও নাম আছে এই গ্রামের।

(ক) লোকগীতি— এই গ্রামের জারি গানের খ্যাতি ছিল গোটা জেলায়। আজিমুদ্দীনের বিরাট দল ছিল জারিগানের। এখনো নিয়মিত চর্চা হয় এই গানের (১) একটা গানের উল্লেখ করছি—

কোথায় গেলে পাব তারে
খুঁজি দেশে দেশে।
যার তরে মন পাগল হলো
হায় থাকে যে কোন্ বেশে ?

চাপড়া থানায় নাম আছে এই গ্রামটির। খেলধূলা ও সংস্কৃতির চর্চায় এটি সেরা মুসলিম প্রধান গ্রাম হিসাবে খ্যাত। গ্রামের বহু কৃতী সন্তান ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে। শিক্ষিতের হারও বেশ ভালই।

৫। **পূজাপার্বণ**—

গ্রামে মুসলিম পার্বণ ছাড়াও দুর্গাপূজা এবং কালীপূজাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবং অন্যান্য পালা পার্বণও হয় বছরের বিভিন্ন সময়ে।

৬। **লোককথা**—

গ্রামের প্রাচীন ঢিবি এবং দীঘিদের নিয়ে প্রচলিত আছে নানা কথা, নানা লোক কাহিনী—

(ক) পীরগাথা— শোনা যায় জ্যোৎস্নারাতে এখনো নাকি ঐ পীর দীঘিতে এক প্রাচীন দরবেশকে দেখা যায় বছরের কোন বিশেষ দিনে স্নান করতে।

(খ) ব্রাহ্মণ কন্যা— আবার গ্রামের বামনদীঘি কে নিয়েও শোনা যায় নানা কথা— সুদূর অতীতে কোন এক দিন এক ব্রাহ্মণ কন্যার ওপর দৃষ্টি পড়ে এক বিধর্মীর। ছলে বলে কৌশলে সে আয়ত্ত করতে চায় ঐ কন্যাকে। এক রাত্রে যখন ঐ শয়তানটি আসে ঐ মেয়েটিকে ধরতে তখন সে ঘর ছেড়ে পালাতে থাকে। ঐ শয়তান তার পিছু ধাওয়া করে। শেষ পর্য্যন্ত আর কোন উপায় না পেয়ে মেয়েটি ঝাঁপ দেয় ঐ দীঘির বুকে। আর ওঠে না। তলিয়ে যায় গহন দীঘির বুকে কোথায় যেন।

কতো যুগ আগের কথা কিন্তু লোকের মুখে মুখে আজো ফেরে সেই হৃদয় বিদারক কাহিনী।

মাঘী পূর্ণিমার রাতে ঐ বামনদীঘিতে আজো নাকি কেউ কেউ দেখতে পায় একটি মেয়েকে স্নান করতে। লোকে বলে সে নাকি সেই হারিয়ে যাওয়া ব্রাহ্মণের মেয়েটিরই মতো দেখতে। সত্য মিথ্যা কে জানে ?

এমন কতো কথা, কতো কাহিনীই না ছড়িয়ে আছে জলঙ্গীর তীরে তীরে নদীয়ার গ্রাম গঞ্জে।

লক্ষ্মীগাছা ও দেওলিয়া

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলায় লক্ষ্মীযুক্ত যে কটি গ্রাম নাম আছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো 'লক্ষ্মীগাছা' গ্রামটি।

২। নামকরণ—

চাপড়া থানার অন্তর্গত এই লক্ষ্মীগাছা গ্রামটি কৃষ্ণনগর—করিমপুর সড়কের ওপরেই অবস্থিত। ছোট আন্দুলিয়া থেকে এর দূরত্ব অল্পই। গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায় অতীতে গ্রামটি ছিল খুবই লক্ষ্মী শ্রীযুক্ত তাই নাম হয়েছিল লক্ষ্মীগাছা।

আবার কেউ কেউ বলেন লক্ষ্মী শ্রীযুক্ত গাছের থেকেই নাম হয়েছিল একদা লক্ষ্মীগাছা।

এই গ্রামের প্রবীন ব্যক্তিদের মতে একদা এখানে ছিল বসুলক্ষ্মী বা লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির এবং লক্ষ্মী নারায়ণের নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছিল লক্ষ্মীগাছা। যদিও আজ সেই মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই।

গাছ শব্দ যুক্ত বহু গ্রাম আছে নদীয়ায়। গাছ মানুষের বন্ধু। ছায়া দিয়ে, ফল, ফুল, কাঠ দিয়ে নানাভাবে মানুষের উপকার করে এসেছে গাছ যুগ যুগ ধরে। মানুষের কাছে গাছ হয়েছে দেবতার মতো। একদা এই গ্রামের গাছ পালাও হয়তো হয়ে উঠেছিল দেবতার মতো। গাছের নীচে স্থান হয়েছিল ঠাকুর দেবতার। অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন হয়তো বা লক্ষ্মীঠাকুরাণ। চলেছিল পূজা পাঠ। ধীরে ধীরে ঐ প্রাচীন বসতির নাম হয়েছিল লক্ষ্মীগাছা।

৩। প্রাক্ ইতিহাস—

লক্ষ্মীগাছা গ্রামটি যে অতি প্রাচীন গ্রাম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় এ গ্রামের 'জাঙ্গুলীতলা'। এই জাঙ্গুলী হলেন বৌদ্ধ দেবী। তিনি সর্পের দেবী হিসাবেই পরিচিতা বৌদ্ধশাস্ত্রে। গাছের তলাতেই পূজা হতো ঐ 'জাঙ্গুলী দেবীর।' এখনো প্রাচীন অশথ গাছটি আছে ঐখানে। কিন্তু পরবর্তীকালে জাঙ্গুলী দেবীর স্থান গ্রহণ করেন বাশুলী বা বিষহরি। বর্তমানে ঐ স্থানটি পীরের থান হিসাবেই মান্য এবং তার পাশের প্রাচীন দীঘিটিও খ্যাত পীরপুকুর নামে।

অর্থাৎ লক্ষ্মীগাছায় বৌদ্ধযুগ হিন্দুযুগ এবং মুসলিম যুগের প্রভাব পড়েছে বলা যায়। বৌদ্ধ জাঙ্গুলী দেবী হয়েছেন হিন্দুযুগে বাশুলী এবং ঐ গাছের নীচেই বা ঐ গ্রামের কোন স্থানে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন বসুলক্ষ্মী বা লক্ষ্মীনারায়ণ। তার পরেই এসেছে ইসলামী প্রভাব। আবির্ভাব হয়েছে পীরের এবং ধর্মান্তরিত হয়েছে এ গ্রামের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা। ন্যাড়া বৌদ্ধরা হয়ে গেছে নেড়ে।

লক্ষ্মীগাছার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীন লক্ষ্মীগাছার যে সব ঢিবি এবং দীঘি ইত্যাদি আছে সে গুলোর নাম বিশ্লেষণ করলেও বেরিয়ে আসতে পারে বহুতথ্য। আবার খনন কাজ চালালেও বেরিয়ে আসতে পারে বহু তথ্য। জানা যেতে পারে বিলুপ্ত দিনের বহু কথা। উদঘ্যাটিত হতে পারে বহু আশ্চর্য ইতিহাস।

(ক) বর্তমান অবস্থা—বর্তমানে লক্ষ্মীগাছায় কোন ব্রাহ্মণের বাস নেই। একদা বিখ্যাত লোহারাম গাঙ্গুলীর বাস ছিল এই গ্রামেই। বর্তমানে তাঁর বংশধরগণ কৃষ্ণনগরে বাস করেন।

এই গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে জেলেরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। তবে গোয়ালা, মাহিষ্য, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দু ও কিছু আছে।

(খ) লোকশ্রুতি— এই গ্রামে প্রচলিত লোকশ্রুতি এই যে অন্নদাদেবী নাকি নদী পার হয়ে এই গ্রামের পথ দিয়েই ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ী গিয়েছিলেন।

৪। দেওলিয়া—

লক্ষ্মীগাছার পূর্ব দিকে রয়েছে 'দেওলিয়া' গ্রাম। এটি আসলে অতীতে ছিল লক্ষ্মীগাছারই একটি পাড়া বলে মনে করেন অনেকে। কিন্তু ঐ পাড়ার লোকজনের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিলনা। তাই অন্য পাড়ার লোকেরা বলতো ওরা 'দেওলে' পাড়ার লোক। তার পরে ক্রমে দেউলে-দেওলিয়া। লোক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এই পাড়া কালক্রমে হয়ে দাঁড়ালো গ্রাম। নাম হয়ে গেল দেওলিয়া গ্রাম।

৫। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ নিয়ে প্রচলিত আছে আরো বেশ কয়েকটি মত।

একটি মত হলো একদা এই গ্রামে ছিল বিখ্যাত দেউল বা মন্দির এবং ঐ দেউল থেকেই দেউলে-দেওলিয়া হয়েছে। প্রাচীন বসুলক্ষ্মীর দেউল নাকি এই দেওলিয়াতেই ছিল বলে মনে করেন অনেকে।

লক্ষ্মীগাছার ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান এ গ্রামের। একটি লক্ষ্মী যুক্ত অন্যটি লক্ষ্মীছাড়া নইলে 'দেউলে' হবে কেন ?

দেউলিয়া গ্রামের প্রাইমারী স্কুলটির নাম কিন্তু এখনো লক্ষ্মীগাছা প্রাইমারী স্কুলই আছে। এর থেকেই লক্ষ্মীগাছার লোকেরা দাবী করেন যে দেউলিয়া অঞ্চলটি তাদেরই গ্রামের একটি পাড়া ছাড়া কিছু নয়।

৬। অতীত গাথা—

সম্ভবত বন্যা এবং মহামারীতেই উজাড় হয়ে যায় দেউলিয়া এবং লক্ষ্মীগাছার লোকজন আশে পাশের অন্যগ্রামের লোক জনদের মতোই। তার পরেই আসে তুর্কী আক্রমণ— ধ্বংস হয়ে যায় এই অঞ্চলের বহু সমৃদ্ধ জনপদ। কেউ কেউ মনে করেন এ অঞ্চলে বর্গীর হামলাও হয়ে ছিল।

প্রাচীন দিনের ইতিহাস ঘাঁটলে এই জলঙ্গী ভৈরব বিধৌত প্রাচীন অংশে যেসব সমৃদ্ধ জনপদের নাম পাওয়া যায় সেগুলো হলো দোগাছি, বাগোয়ান, মহৎপুর, শালিগ্রাম লক্ষ্মীগাছা, আলফা, ফুলবাড়ী, বাণিয়াখড়ি ও রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি। শালিগ্রামের সঙ্গে কেউ কেউ শালবাহন রাজাদের স্মৃতিকে বিজড়িত করতে চান। চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন বলে শোনা যায়। বাগোয়ান বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের রাজধানী ছিল বাগোয়ান।

প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মীগাছারই একটি পাড়া হলো দেউলিয়া এবং এই দুটি গ্রাম বা পাড়াই একদা ছিল বৌদ্ধগ্রাম এবং পরে সেন আমলে হিন্দু প্রধান হয় এবং পরবর্তীকালে মুসলিম প্রধান গ্রাম হয়ে দাঁড়ায়।

৭। বর্তমান অবস্থা—

এই দুই গ্রামে বর্তমানে হিন্দু ও মুসলিমরা বেশ সম্প্রীতির মধ্যেই বসবাস করছেন এবং বিভিন্ন পূজা পার্বণও অনুষ্ঠিত হচ্ছে বেশ সাড়ম্বরেই।

রাণাবন্দে

১। পরিচিতি—

চাপড়া থানার শ্রীনগর থেকে যে পাকা রাস্তাটা পূর্ব দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই পড়বে একটা ছোট নদী। হ্যাঁ এই নদীটাই দাঁড় নদী? আর ঘাটের নাম 'রাণাবন্দঘাট'। নদীর ওপারের গ্রামটাই হলো বিখ্যাত রাণাবন্দ গ্রাম।

এই গ্রামে রয়েছে 'বিশাল গীর্জা এবং অদূরেই আছে বিখ্যাত 'শ্যাওড়া তলা'। বেশ প্রাচীন গ্রাম এই রাণাবন্দ। হিন্দু-মুসলিম এবং খৃষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষের বাস এই গ্রামে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই নদীয়ার সীমান্তবর্তী গ্রামটি।

(ক) ইতিহাস— প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বাস এই গ্রামে। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশী। গ্রামের তিন দিক দিয়ে বয়ে গেছে দাঁড় নদী। এই দাঁড় নদী আসলে জলঙ্গীরই শাখা। এখনো শোণপুকুর, ভাতগাছি, বেতবেড়িয়া ও রাণাবন্দের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এই নদীর ক্ষীণ যোগসূত্র চোখে পড়ে জলঙ্গীর সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে এই নদীটিই এই গ্রামের প্রাণ। এই নদী এক কালে প্রবল ছিল। তখন এর বুক দিয়ে জাহাজও চলতো। কিছুদূরেই এই নদীর তীরে 'জাহাজ পোতা' গ্রামটি সেই সাক্ষ্যই দেয়।

রাণাবন্দ গ্রামে রয়েছে পোষ্ট অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, সেন্ট মেরীস হাইস্কুল, ক্যথলিক চার্চ, এবং নদীর ঘাটের পাশে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মডেল। গ্রামের রাস্তা ঘাট ভালই। অধিকাংশ লোকই চাষী তবে চাকুরী এবং ব্যবসাও করে অনেকে।

২। পূজাপার্বণ—

হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালী পূজা এবং সরস্বতী পূজা বেশ ঘটা করেই হয়ে থাকে। তবে রাণাবন্দের প্রধান আকর্ষণ হলো বড়দিনের উৎসব। সাতদিন ধরে বেশ জাঁকজমক সহকারেই পালিত হয় এই উৎসব। আলোর বন্যা বয়ে যায়। বহু দূর দূরান্ত থেকে দেখতে আসেন এই উৎসব অসংখ্য নরনারী।

৩। গীর্জা—

তাছাড়া সুদৃশ্য গীর্জাটিও দেখার মতো। গীর্জার প্রবেশ দ্বারের কাছেই রয়েছে যে গুহাটি সেটিও দর্শনীয়। ছায়াময় পরিবেশে ফুলে ফুলে ঢাকা নারকেল শোভিত রাণাবন্দ গীর্জাটি সত্যিই দেখার মতো। এই গ্রামে প্রথম কাঁচা গীর্জাটি নির্মাণ করেন ফাদার পেজোট্টি উনবিংশ শতকের শেষার্ধে। পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফাদার ট্যাভেগ্লিয়া এখানে আসেন। ফাদার 'আলেকজাণ্ডার বেরেট্টা রাণাবন্দের উন্নতির জন্য বহু কাজ করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ফাদার সানচেজ সাইপ্রিয়ানের প্রচেষ্টায় এখানে স্থাপিত হয় 'সেন্টমেরিজ' বিদ্যালয়টি। তিনি প্রতি বুধবার একটি হাটের ব্যবস্থা করেন এই গ্রামে। ঐ হাটটি চলছে আজো। তিনি বিলের ধারে একটি ক্রুশনির্মাণ করেন ফাদার লোপেজের সাহায্যে কলেরার হাত থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের ভবরপাড়া থেকে শোভাযাত্রা সহকারে আটফুট উচ্চতার মারীয়ার কাঠের মূর্তিটি এখানে আনা হয় এবং রাণাবন্দের নাম রাখা হয় 'মারীয়াম পুর'।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয় দোতলা পুরোহিত আবাস গৃহটি। বহু বিখ্যাত পুরোহিত এসেছেন এখানে এবং রাণাবন্দ গীর্জাও এই গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে গেছেন তাঁরা নানা ভাবে। বর্তমান সুদৃশ্য গীর্জাটি হাল আমলেই তৈরী হয়েছে।

সত্যিকথা বলতে কি রাণাবন্দ গ্রামের উন্নতির জন্য খৃষ্টান মিশনারীদের অবদান অসামান্য।

৪। শেওড়াতলা ও আহাদ শাহ্ ফকির—

গীর্জা ছাড়া রাণাবন্দের অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান হলো 'শেওড়া তলা'। দাঁড়নদীর তীরে এক মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে শেওড়াতলার আশ্রম। আম-জাম-কাঁঠাল ও তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঘেরা আশ্রম। রয়েছে সুদৃশ্য নারকেল কুঞ্জও। পশ্চিমদিকে রয়েছে বিশাল এক অশ্বত্থগাছ। এর পাশেই ইট বাঁধানো কবর। ঐ খানেই সমাধিস্থ আছেন বিখ্যাত ফকির আহাদ ফকির। আশ্রমের দক্ষিণের পুকুরটির জল পবিত্র বলে মানে ভক্ত এবং আর্তগণ। ঐ পুকুরের জল পান করে এবং জলে স্নানও করে লোকে রোগমুক্তির বাসনায়। দরগার মাটির প্রলেপ গায়ে লাগিয়েও রোগমুক্ত হবার চেষ্টা চালায় অনেকে। আশ্রমে রয়েছে কয়েকটি কুড়ে ঘর। স্থায়ীভাবে কয়েক জন রোগী বাসও করে এখানে। প্রতি বৃহস্পতিবার দূর দুরান্ত থেকে বহু লোক আসে এখানে তাদের রোগমুক্তি ও কামনা বাসনা পূরণের আশায়।

রাণাবন্দের শেওড়াতলা যে ফকিরের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে সেই ফকির আহাদশাহ ১২৪৮ সনে রাণাবন্দের এক গরীব চাষীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মাদার বিশ্বাস এবং মায়ের নাম অমৃতা বিশ্বাস। মাদার বিশ্বাস কিছু কিছু কবিরাজী চিকিৎসা করতেন। অমৃতা বিবি ছিলেন ধর্মশীলা নারী। মাত্র পাঁচবছর বয়সেই পিতৃ বিয়োগ হয় তাঁর। উনিশ বছর বয়সে সায়রাবিবির সঙ্গে বিবাহ হয়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই এক কন্যা হয় তাঁদের। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে কিছুদিনের মধ্যেই সায়রাবিবি ও তাদের কন্যাটির মৃত্যু ঘটে। আহাদ শাহের মনে এলো বৈরাগ্য। বেরিয়ে পড়লেন মনের মানুষ সন্ধানে।

শেষ পর্য্যন্ত তরণীপুর গ্রামের মজদীন শাহের শিষ্য হয়ে চালাতে লাগলেন সাধন ভজন। কিন্তু মজদীন শাহও দেহত্যাগ করলেন একদিন এবং যাবার আগে বলে গেলেন তিনি 'শেওড়াতলায়' থাকবেন।

এরপর থেকেই আহাদশাহ পড়ে রইলেন ঐ শেওড়াতলায়। সিদ্ধি লাভও করলেন কঠোর সাধনার ফলে ঐ খানেই। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। বহু ব্যক্তি শিষ্য হলো তাঁর। রোগমুক্তিও ঘটলো বহুজনের তাঁর কৃপায়। কুষ্ঠরোগ, বাত, পেটের অসুখ থেকে শুরু করে পঙ্গু এবং বোবাও সুস্থ হয়ে ফিরেছে তাঁর কৃপায়। বহু অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে আছে তাঁর সম্বন্ধে। তিনি নাকি অসময়ের ফল এনে দিতে পারতেন। মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাঁচাতে পারতেন এবং জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন।

৫। অম্বুবাচীর মেলা—

প্রায় ১০০ বছর জীবিত ছিলেন তিনি। ১০ই মাঘ পালিত হয় ফকিরের তিরোধান দিবসের উৎসব। অম্বুবাচীতে বিশেষ উৎসব ও মেলা হয় এখানে। চলে তত্ত্বালোচনাও। বহু লোকের ভীড় হয় তখন এখানে।

৬। নামকরণ—

রাণাবন্দ গ্রামটি প্রাচীন এবং বেশ ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম। এই গ্রামের নামকরণের ব্যাপারে যে দুটি মত প্রচলিত আছে তার একটি হলো এই যে—বহুদিন আগে এই গ্রামের মধ্যে যে

পুরণো দীঘি আছে তার তীরে ছিল গভীর জঙ্গল ঐ জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতো 'রাণা' নামে এক ডাকাত। ঐ রাণাকে বহু চেষ্টা করেও কেউ বন্দী করতে পারেনি। সেই থেকেই ঐ স্থানের নাম হয় রাণাবন্দ। ক্রমে এই গ্রামেরোই নাম হয় রাণাবন্দ।

অন্য একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে যখন বাংলার বারভূঁইয়াদের নেতা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করতে বিশাল মোগল বাহিনী যশোহরের দিকে যাচ্ছিল তখন এই দাঁড় নদীতে প্রতাপের নৌ সেনারা বাধা দেয় রাণা মানসিংহের বাহিনীকে এবং মোগল বাহিনীকে জলযুদ্ধে পরাজিত করে রাণার পথ বন্ধ করে দেয় এবং সেই থেকেই এই স্থানের নাম হয় রাণা বন্ধ এবং পরে হয় রাণাবন্দ।

তবে এই মতের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া না গেলেও এই রাণাবন্দের অদূরেই রয়েছে 'বাগোয়ান' এবং বাগোয়ান রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার যে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করে পুরস্কার স্বরূপ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ১৪টি পরগণার সনদ লাভ করে নদীয়া রাজ হন সে কাহিনী ইতিহাস স্বীকৃত।

হয়তো এমনো হতে পারে এই খানে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে বন্দনা করেছিলেন এবং নদী পারাপারে সাহায্য করে যশোহরের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলেন কেননা এই স্থানটা ছিল তখন বাগোয়ানেরই অধীন। রাণার বন্দনা থেকেই পরবর্তীলকালে এই স্থানের নাম হয়ে যায় রাণাবন্দ—এবং এই মতটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

ভাতগাছি

১। পরিচিতি—

'রাণাবন্দ' ঘাট বাসস্টপেজে নেমে পায়ে হেঁটে উত্তর-পশ্চিম দিকে আরো দু কিলোমিটার গেলে পড়বে খালবিল নদী দিয়ে ঘেরা বাংলাদেশ সীমান্তে একটা গ্রাম। ঐ গ্রামেরই নাম 'ভাতগাছি'।

গ্রামের দু প্রান্তে দুটো সাঁকো রয়েছে। ঐ সাঁকোই অন্য গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। গ্রামে কোন পাকা রাস্তা নেই। বর্ষায় দুর্গতি চরমে ওঠে। নৌকা এবং ডোঙা ছাড়া তখন যাতায়াত করা যায় না। সভ্য জগৎ থেকে তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সীমান্তের এই গ্রামটি।

২। নামকরণ—

'ভাতগাছি' নামটির অর্থ ভাতের গাছ অর্থাৎ ধান গাছ। একদা এখানে প্রচুর আমন ধান হতো যা অন্যান্য অঞ্চলে হতো না। ধানের প্রাচুর্যে থেকেই এই গ্রামের নাম হয়ে যায় ভাতগাছি।

এই অঞ্চলের মাটি এঁটেল এবং চারপাশে খালবিল থাকায় জলসেচের সুযোগও প্রচুর ফলে সবুজ শস্যে ভরে থাকে মাঠ সারা বছরই।

৩। প্রাক ইতিহাস—

ভাত গাছির চারধারেই মাঠ। একদা বহু পূর্বে বাংলা দেশের দিক থেকে কয়েকজন লোক এসে প্রথমে মাঠের মাঝখানে উঁচু জায়গায় বসতিস্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নির্জন দ্বীপে এক গ্রাম। সে কাহিনী আজ প্রায় তিনশো বছরের আগেকার কাহিনী।

ভাতগাছির লোক সংখ্যা আজ প্রায় পাঁচ হাজার। দেশভাগের ফলে যেমন প্রচুর লোক এসেছে এখানে তেমনি ১৯৭১ এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়েও এসেছে ওপার থেকে বেশ কিছু লোক।

৪। মসজিদ ও মন্দির—

মুসলিম প্রধান এই গ্রামে রয়েছে তিনটি মসজিদ একটি গীর্জা এবং একটি মন্দিরও আছে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে একটি এবং শিশু বিকাশ প্রকল্প আছে দুটি।

৫। পূজাপার্বণ—

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট আছে আজো। ইদলফিতর, মহরম ইত্যাদির পাশা পাশি দুর্গাপূজা কালী পূজা এবং বড় দিনের উৎসবও বেশ জমকালো ভাবেই হয়ে থাকে এই গ্রামে। মেহফিল এবং যাত্রা ও ফকিরি গানের আসরও বসে শীতের সময়ে।

৬। লোকগীতি ও ফকিরি গান—

ফকিরি গানের দলের বেশীর ভাগ সদস্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের। রাণাবন্দের শেওড়া তলাতেও ফকিরি গানের বাৎসরিক আসর বসে অম্বুবাচীর মেলার সময়। ওপার থেকেও আউল-বাউল ও ফকিরগণ আসেন ঐ মেলার গানে অংশ নিতে।

৭। শিক্ষা—

বর্তমানে ভাতগাছির ছেলে-মেয়েরা লেখা পড়াতে তেমন উন্নতি করছে না। তবে শিক্ষকতা করছে হেকমত আলি মোল্লার মতো দুচারজন এই গ্রামের স্কুল থেকে পাশ করেই। কৃষিনির্ভর অবহেলিত সীমান্তবর্তী এই গ্রামটির রাস্তাঘাটের দিকে কেন যে গ্রামবাসীরা নজর দিচ্ছেন না এটাই বিস্ময়ের।

৮। সার্বিক অবস্থা—

গ্রাম বাংলার আদি রূপটি এখনো চোখে পড়ে এই ভাতগাছিতে গেলে। সহজ সরল গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত সবাই। চাহিদা তাদের অতি সামান্যই—দুমুঠো অন্ন আর মাথা গোঁজার ঠাঁই।

এই গ্রামে প্রায় নশো ঘর লোকের বাস কিন্তু পাকাবাড়ী মাত্র ৩৮টি। এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি। পাঁচ হাজার লোকের বাস যে গাঁয়ে সেই গাঁয়ে যে দরকার আরো দুটি অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের—কিন্তু কে নজর দেয় সেদিকে ? গ্রামবাসীরা উদ্যোগী নাহলে রাস্তা ঘাটেরই বা উন্নতি হয় কি ভাবে ? হেকমত ভাইরাকি বলেন ?

চাপড়ায়

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'চাপড়া'। থানা, বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্টাফিস, স্কুল, কলেজ বাজার হাট নিয়ে চাপড়া আজ বেশ জম-জমাট শহরের রূপ নিয়েছে।

দুটি ব্লকে বিভক্ত চাপড়ার লোকসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো। বেশ কিছু প্রাথমিক স্কুল আছে এই চাপড়ায়। আছে হাইস্কুল এবং কলেজও।

জলঙ্গীর তীরে অবস্থিত চাপড়া হলো একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এখানে হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান এই তিন ধর্মেরই লোক বসবাস করে। দেশ ভাগের পরে ওপার থেকে বহুলোক চলে এসেছেন এখানে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই গড়ে উঠছে চাপড়া। গ্রাম থেকে আজ বর্ধিষ্ণু গঞ্জে পরিণত হয়েছে চাপড়া। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ছে। দোকান বাড়ছে। লোক সংখ্যা বাড়ছে। স্কুল বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গঞ্জ ছাড়িয়ে শহরের রূপ নিতে চলেছে চাপড়া।

২। প্রাক্ ইতিহাস—

চাপড়া গ্রামের সমৃদ্ধির মূলে ইংরেজ এবং খৃষ্টান মিশনারীদের অবদান কম নয়। এখানে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম তৈরী হয় মিশন বাড়ী। ঐ বছরই গড়ে ওঠে গীর্জা। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। ধীরে ধীরে ওটি হয় মিডল ইংলিশ স্কুল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের স্থাপিত কিং এডওয়ার্ড স্কুলটিও এই অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে নিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

৩। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

নদীয়া জেলার মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে চাপড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সারাবছরই এখানে কোন না কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। চাপড়ার সন্তান সামিয়েল বেতার শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাউল গানে তিনি মুগ্ধ করেছেন অগণিত দেশবাসীকে।

চাপড়ায় রয়েছে তিনটি সঙ্গীত বিদ্যালয়। এদের মধ্যে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ এবং প্রয়াগ সঙ্গীত বিদ্যালয় সরকার অনুমোদিত। এছাড়া বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক নির্মলেন্দু বিশ্বাসের গীতি কুঞ্জও বেশ নামী প্রতিষ্ঠান।

চাপড়ার বিভিন্ন ক্লা ব যেমন 'হেভেন ক্লাব', 'কসমিক ক্লাব', 'টাউন ক্লাব', 'অজানা ক্লাব' প্রভৃতি প্রতি বছর সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে এবং বিজয়ীদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করে থাকে।

এছাড়া চাপড়ার 'মেরীইমাকুলেট' স্কুল এবং চাপড়া গালর্স স্কুলও প্রতি বছর দলগত নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দলগত ভাবে পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকে। কিংএডওয়ার্ড স্কুলেও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

৪। সাহিত্য চর্চা—

চাপড়ায় বহু কবিতা এবং সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে থাকে। শিক্ষক শ্রী রামপ্রসাদ মুখার্জীর সম্পাদনায় 'আনন্দম' সাহিত্য ও কাব্য চর্চায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

৫। সঙ্গীত ও নাট্যচার্চা—

বহু গায়ক-বাদক এবং নাট্য শিল্পীরও জন্ম দিয়েছে এই চাপড়া। বহু গায়ক আছেন চাপড়ায় যাঁরা লোকগীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতিতে নাম করেছেন সারা জেলায়।

৬। উৎসব ও পূজা পার্বণ—

চাপড়ায় হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক জনই সারা বছর ধরে মেতে থাকেন নানা উৎসব অনুষ্ঠান এবং পূজা পার্বণে। তবে (ক) **দুর্গা পূজার** উৎসবের পরেই যে উৎসবের জন্য চাপড়ার খ্যাতি সেই উৎসবটি হলো (খ) **বড়দিনের** উৎসব। সাতদিন ধরে চলে ঐ উৎসব। মেলাও বসে গীর্জার পাশে। হয় ফুটবল খেলাও। জেলার নানা স্থান থেকে ঐ উপলক্ষ্যে দর্শনার্থীদের ভীড় হয় এখানে। (গ) **গাজন**— এছাড়া চাপড়ার ঘোষপাড়ায় চৈত্র শেষে যে গাজন উৎসব হয় সেই উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে। বহু লোকের ভীড় হয় ঐ গাজনের মেলায়। (ঘ) রথের মেলা—চাপড়ার রথের মেলারও খ্যাতি আছে আশে পাশের গ্রামে। বহু লোকের ভীড় হয় ঐ মেলায়। ভেঁপু আর বাঁশীর শব্দে কানে তালা ধরে যায়। ছোটরা আনন্দে পাগল হয় রথের মেলায় এসে। (ঙ) বই মেলা— এছাড়া ২০০২ সাল থেকে চাপড়ায় যে বই মেলা শুরু হয়েছে তারও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

৭। লোকসংস্কৃতি—

নদীয়ার লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও চাপড়ার অবদান কম নয়। নৃত্যে-গানে-ব্রত ও পালাপার্বণে চাপড়াবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকেন নানাভাবে। তবে লোককথা—লোক উৎসব-লোকাচার ও লোক শিল্প ইত্যাদির চাইতে লোকগীতির ক্ষেত্রেই চাপড়ার অবদান বেশী।

১। লোকগীতি— চাপড়ার বিখ্যাত লোকগীতি হলো ধুয়োজারি।

(ক) ধুয়োজারি— 'জারি' একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো প্রয়োগ বা প্রবর্তন করা। আর ধুয়ো হলো ধ্রুব অর্থাৎ যে পদ দোহার গণ বার বার গায়। এই গানে মূল গায়েন একবার গায় এবং দোহারগণ শেষ পংক্তির পুনরাবৃত্তি করে থাকে। ধুয়োজারির বিখ্যাত গায়ক হলেন চায়েন উদ্দীন মল্লিক। সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে এই গান চায়েন উদ্দীনের প্রচেষ্টায়। চাপড়ায় বহুল প্রচলিত একটি 'ধুয়োজারি' গান হলো—

১। (আহা) এই যে বনের থেকে ধরলাম টিয়া।
ও টিয়ার পায়ে শিকল দিয়া
আমি রাখলাম নজরবন্দী গো।
ও টিয়ার বনের কথা মনে হইলে
শিকলে দেয় ঝাঁকিরে।
তাই আসতে পাখী যাইতে পাখী ভাইরে,
ও শিকল যায় যাক্ ছিঁড়েরে।
মোর আল্লাজীর বানানো দেহগো
কোথায় রবে পড়েগো।

(খ) লালনগীতি—

এছাড়া চাপড়াতে লালন গীতিরও প্রচলন আছে। আছে বাউল গানেরও প্রচলন। বহুল প্রচলিত একটি লালন গীতি হলো—

২। 'কবে সাধুর চরণ ধূলি লাগবে মোর গায়।
আমি বসে আছি আশা সিন্ধুর তীরেতে সদায়।

(গ) বাউল গান—

চাপড়া অঞ্চলে প্রচলিত একটি বিখ্যাত বাউল গান হলো—

৩। গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল।
ঔষধে আর মন মানে না।
চল্ সজনি, যাইগো নদীয়ায়।

চাপড়া অঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শোনা যায় এইসব নানা ধরণের লোকগীতি। বাঁশী ঢোলক, হারমোনিয়াম, দোতারা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঐ সব গানে।

মূলত খেমটা, আড়খেমটা, কার্ফা, ছক্কি ইত্যাদি তালেবাঁধা গান গুলিই গাওয়া হয় বাউল গানের সময়।

গাঁটরা ভাতছালা

১। পরিচিতি ও নামকরণ—

চাপড়া থানার অধীন নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম এই গাঁটরা ও ভাতছালা। এই দুই গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে যে লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে তা হলো এই যে—

শোনা যায় গাঁটরার পূর্ব নাম নাকি ছিল গাণ্ডীব নগর। এখানেই নাকি শমীবৃক্ষে পাণ্ডবরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে রেখেছিলেন অজ্ঞাত বাসের সময়। গাণ্ডীব ধনুর থেকেই নাম হয় গাণ্ডীব নগর।

অন্যদিকে ভাতছালার লোকশ্রুতিটি হলো একদা এই গ্রামে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিবাহ উপলক্ষ্যে যে মহোৎববে হয় সেই উৎসবে নাকি পাহাড় প্রমাণ ভাত রান্না হয়েছিল এবং খাওয়া দাওয়ার পরেও যে প্রচুর ভাত থেকে যায় সেই সব ভাত নাকি গরীব লোকেরা ছালায় করে বেঁধে বাড়ী নিয়ে যায় এবং সেই থেকেই এই গ্রামের নাম হয় 'ভাতছালা'।

এক্ষেত্রে ভাতছলার কাহিনীটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলেও গাঁটরার কাহিনীর বিপক্ষে বলা যায় যে বিরাট নগরের অবস্থান জানা গেছে আজ। আসলে পাণ্ডবদের নিয়ে এমন কাহিনী ভারতের নানা প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে। নিজেদের অঞ্চলের খ্যাতি বাড়ানোর জন্যই এমন সব কাহিনীর প্রচার করা হয়েছে সুকৌশলে। পাণ্ডবরা এ অঞ্চলে এসেছিলেন এমন কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি আজো।

গণ্ডগ্রাম থেকে 'গাঁটরা' হতে পারে—গণ্ড-গাণ্ডা-গাঁটরা। কিন্তু গাণ্ডীব থেকে গাঁটরার উৎপত্তি একটু কষ্ট কল্পনাই হয়ে যায়।

২। শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্কুল—

বর্তমানে গাঁটরা গ্রামে রয়েছে একটা হাইস্কুল ও দুটো প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়াও আছে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুলিশ ফাঁড়ি এবং পঞ্চায়েত অফিস। শিক্ষার হার বাড়ছে দ্রুত। কৃষি প্রধান গ্রাম। হিন্দু-মুসলিমরা মিলে মিশেই আছে এখানে যদিও রাজনীতির উত্তাপে এই গ্রাম-জীবনেও প্রায়ই অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে নদীয়ার আর পাঁচটা গ্রামের মতোনই।

৩। নিত্যানন্দ আশ্রম ও প্রভুনিত্যানন্দ—

এই গ্রামে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর যে আশ্রমটি রয়েছে সেই আশ্রমকে ঘিরে যে কাহিনী প্রচলিত তা যেমন রসাত্মক তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক।

শোনা যায় নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্যদেবের নির্দেশে 'হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হন এই গ্রামে। তিনি সপার্ষদ আশ্রয় নেন এক গাছতলায় জমে ওঠে হরিনামের আসর। দলে দলে লোক জন আসতে থাকে ঐ আসরে। ধীরে ধীরে সেখানে গড়ে ওঠে আশ্রম।

ঐ সময়ে গাঁটরায় বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছিল দুটি মেয়ে। কিন্তু ঐ গরীব ব্রাহ্মণ মেয়ে দুটির বিয়ে দিতে পারছিলেন না কিছুতেই অর্থাভাবে। নিত্যানন্দ ঐ ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাঁর একটি মেয়ে বসুন্ধরাকে বিয়ে করতে রাজী হন। মেয়ের বাবাও রাজী হয়ে যান। কিন্তু সমাজ পতিরা বৈষ্ণবের সঙ্গে ব্রাহ্মণকন্যার বিয়েতে বাধা দেন এবং নিত্যানন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের বিতাড়িত করেন গ্রাম থেকে। তাঁরা আশ্রয় নেন পাশের গ্রামে।

কিছুদিন পরে বসুন্ধরার মৃত্যু হয় সাপের কামড়ে এবং তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এক দীঘির জলে। যথা সময়ে ঐ খবর পৌঁছায় নিত্যানন্দের কানে এবং তিনি বসুন্ধরার বাবা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের অনুমতি নিয়ে ঐ মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তোলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা রটে যায় চতুর্দিকে এবং ধন্য ধন্য পড়ে যায়। বসুন্ধরার সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহে আর কেউ বাধা দেয় না। সেই সঙ্গে ছোট মেয়ে জাহ্নবী দেবীকেও গরীব বাবা তুলে দেন নিত্যানন্দের হাতে।

মহাধুম ধামের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায় বিবাহনুষ্ঠান। আয়োজন হয় মহোৎসবের। শোনা যায় ঐ মহোৎসবে এত ভাত রান্না হয় যে পাহাড় প্রমাণ ভাত জমা হয়। লোকে ছালায় ভর্তি করে অবশিষ্ট ভাত বাড়ী নিয়ে যায়। আর ঐ সময় থেকেই ঐ গ্রামের নাম হয় 'ভাতছালা'।

৪। উৎসব ও মেলা—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আশ্রম আজো আছে ভাতছালা গ্রামে। স্থাপিত আছে নিত্যানন্দ বসুন্ধরা ও জাহ্নবীদেবীর পাথরের মূর্তিও সেখানে। নিত্যপূজা পাঠ চলে আশ্রমে। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে এখানে যে মহোৎসব ও মেলা বসে তাতে হাজার হাজার ভক্ত বৈষ্ণবের ভীড় জমে। ঐ উৎসব চলে আসছে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে।

৫। বিশ্বনাথ সর্দার—

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে বিখ্যাত গরীব দরদী দস্যু সর্দার বিশ্বনাথ এই গাঁটরা ভাতছালারই সন্তান। তিনি ছিলেন কৃপণ ধনীর যম। বহু গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যাদায় থেকে যেমন উদ্ধার করেছিলেন তিনি তেমনি বহু গরীব ব্যক্তির সংসার ও চালিয়েছিলেন। জাতিতে বাগ্দী এবং দস্যু হলেও দয়ামায়া-শৌর্য বীর্য এবং উদারতায় পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়।

চৌগাছার পাশে ডাকাত গাড়ীর মাঠইছিল তাঁর মূল ঘাঁটি। নদীয়ার বিস্তীর্ণ অংশে নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে এই বিশ্বনাথ ডাকাত বা বিশে ডাকাতকে ঘিরে।

গাঁটরা-ভাতছালা যে একদা সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ এই গ্রামের ওপরে বর্গী হাঙ্গামার উল্লেখ করা যায়। গঙ্গারাম রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বা 'ভাস্কর পরাভব' গ্রন্থে নদীয়ার যে সব গ্রামে বর্গী হাঙ্গামার উল্লেখ আছে তার মধ্যে আছে 'ভাটছালা' বা ভাতছালারও নাম। সমৃদ্ধ গ্রাম না হলে বর্গীদের হাঙ্গামা হতো না এই গ্রামে।

৬। পূজা পার্বণ—

এই গাঁটরা-ভাতছালায় দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতী পূজা খুবই ধুমধাম করে হয়ে থাকে প্রতিবছর।

৭। ব্রত পার্বণ—

ইতু পূজো, জয়মঙ্গলবার, বিপত্তারিণীর ব্রতপালন করে মেয়েরা। এছাড়া ষষ্ঠী পূজা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমীও পালিত হয় বেশ নিষ্ঠাসহকারে।

৮। গাজন—

চৈত্রমাসে গাজন উৎসব হলেও চড়কে চাপেনা কেউ। ঐ উপলক্ষ্যে একটি মেলাও হয় ছোট ধরণের।

৯। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—

মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক নাচগান ও আবৃত্তির আসর বসলেও নাট্যচর্চা তেমন নেই এখানে

মহৎপুরে

১। পারাচাত—

মহৎপুর একটি প্রাচীন গ্রাম। একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ৮৪ পরগণার অন্যতম পরগণা ছিল এই মহৎপুর। ধনে জনে পরিপূর্ণ সেই প্রাচীন মহৎপুরে আজ শুধুই ধ্বংসস্তুপ। চারিদিকে হায় হায় রব। নেই বড় বড় বাড়ী। দেবদেউল। দীঘি ও মজে গেছে সব। এখন মাত্র ৩৫ ঘর লোকের বাস সেই গ্রামে। চারপাশে উঁচু উঁচু টিবি। ধান পাটের চাষ হচ্ছে প্রাচীন দিনের বসতি এলাকায়। তবে পুরনো আম বাগান কয়েকটা আছে। আর আছে প্রাচীন বটবৃক্ষের ছায়ায় সুপ্রাচীন পঞ্চানন তলা।

২। পঞ্চানন তলা—

সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের ঝুরি নেমে চারধাবে চার পাঁচটা নতুন বট গাছ হয়েছে পঞ্চানন তলায়। রয়েছে দুটো প্রাচীন তেঁতুল গাছও। বাঁধানো বেদীর ওপবে একখণ্ড পাথবকেই পঞ্চানন দেব বলে পূজা কবা হযে থাকে। স্থানীয লোকদেব বিশ্বাস উনি অনাদি শিবলিঙ্গ। মাটির নীচে কোথায় যে তাঁব শেষ বলতে পারেনা কেউ।

একদা এখানে চড়কের মেলা হতো। গাজনের উৎসব হতো সাড়ম্বরে। বসতো বাউল ও তর্জাগানের আসর। যাত্রাও হতো। হতো মনসা এবং রক্ষাকালীর পূজাও। কিন্তু সেই সব আজ হারানো দিনের ইতিহাস।

বর্তমানে মহৎপুর অতীতের কঙ্কাল মাত্র। ৭৬ এর মন্বন্তরের আগে বর্গী হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত হয় এই মহৎপুর এবং প্রায় ধ্বংস হয়ে য়ায় ৭৬এর মন্বন্তরে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে বেদীর ওপরে পঞ্চানন দেবের থান। উনি গ্রামদেবতা। শিশুদের মঙ্গলের জন্যই মূলতঃ পঞ্চাননের পূজা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার বন্ধ্যানারীর সন্তান কামনাতেও এই দেবতার পূজা দেয় মেয়েরা। গৃহপালিত পশু পাখীর মঙ্গল কামনাতেও পূজা দেওয়া হয় পঞ্চাননের কোথাও কোথাও। মহৎপুরের এই পঞ্চানন দেবের পূজা হয়ে আসছে যে কতো কাল ধরে তা বলতে পারেনা কেউই।

বর্তমানে যাঁরা পূজা পরিচালনা করেন তাঁদের নেতা কামাখ্যা ঘোষ জানালেন চাঁদা তুলে গ্রামের সবাই মিলে পূজার ব্যবস্থা করে থাকেন। কোন বিশেষ পূজা কমিটিও নেই। বৈশাখী পূর্ণিমায় বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের একটি ছোট মেলাও বসে এখানে। পাঁঠা বলিও হয়। বহুলোক আসে তখন।

পাশেই জলঙ্গী নদী। রমণীয় স্থান। একদা ধর্মরাজের গাজনও হতো এখানে। বর্তমানে আর গাজন হয় না বটে তবে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিশেষ বাৎসরিক পূজার সঙ্গে অনেকেই ধর্মরাজ বা বৌদ্ধ দেবতার সঙ্গে এই পূজার যোগসূত্র খোঁজার প্রয়াস পান। পঞ্চানন তলার পঞ্চাননকে অনেকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতা বলেই মনে করে থাকেন।

৩। প্রাক্ইতিহাস—

মহৎপুরের আশে পাশের গ্রামগুলো মুসলমান প্রধান গ্রাম। এদের অধিকাংশই নিম্ন বর্ণের হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিলেন অতীতে। ধর্মান্তরিত হয়েছেন তুর্কী আমলে।

মহৎপুরে একদা নাকি ১০৮টা পুকুরই ছিল। ছিল বহু বড় বড় বাড়ীও। বর্তমানে মাত্র দুটো পুকুর অবশিষ্ট আছে বড়বাড়ীর চিহ্নমাত্র নেই। গ্রামের জমিদার গাঙ্গুলীরাও চলে গেছেন গ্রাম ছেড়ে। ঐ গাঙ্গুলীদেরই বংশধর ৮২ বছর বয়স্ক গণেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন তাঁদের পূর্ব পুরুষকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় ঢাকা থেকে আনান এবং মহৎপুর গ্রামটি দান করেন। কিন্তু বর্তমানে দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা। জমি জমা খাস হয়ে গেছে সব। তাঁদের ষোলটি আম বাগানের একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে আর।

৪। **নীলকুঠী—**

মহৎপুরের গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের স্থানেই ছিল প্রাচীন নীলকুঠী। গণেশবাবুর জ্যেঠামশাই এর সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবদের বিবাদ বাধে এবং পরিণামে ঘটেছিল এ অঞ্চলে নীলবিদ্রোহ। স্বরূপ গঞ্জের পালচৌধুরীরা নীলামে কিনে নেন এই মহৎপুরের নীলকুঠী বাড়ী।

৫। **পূজা ও ব্রতপার্বণাদি—**

আগে নাকি মহৎপুরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, ইতু পূজা ও নানা মেয়েলি ব্রতাদির অনুষ্ঠান হতো। তবে বর্তমানে সেসব আর হয়না। আগে গাঙ্গুলীদের বাড়ীতে ঘটা করে দূর্গা পূজা হতো এবং মজুমদারদের বাড়ীতে হতো জগদ্ধাত্রী পূজা। বর্তমানে এঁদের কেউই আর মহৎপুরে থাকেন না। মহৎপুরে একদা যেসব লাঠিয়াল আনিয়েছিলেন গাঙ্গুলীরা বর্তমানে তারাই শুধু বসবাস করছে ঐ গ্রামে।

৬। **কেল্লাপাড়া—**

মহৎপুরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থান হলো ‘কেল্লাপাড়া’। প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে জাহাঙ্গীরের সময়ে বার ভুঁইয়াদের দমন করতে যখন মানসিংহ নদীয়ায় আসেন তখন জলঙ্গীর তীরে মোগল বাহিনীর তাঁবু পড়ে। ভবানন্দ মজুমদার সাহায্য করেন তাঁদের। বিনিময়ে মহৎপুর সহ চৌদ্দ পরগণার জমিদারী লাভ করেন তিনি। মোগলরা এখানে থাকার সময় যেসব দীঘি কাটিয়েছিলেন তারমধ্যে একটি এখনো গাঙ্গুলীদের দখলে আছে বলে জানালেন গণেশ বাবু।

৫৬ সালেই জমিদারী চলে যায় গাঙ্গুলীদের। বর্তমানে সহায় সম্বলহীন হয়ে অতি দীন ভাবে দিন কাটাচ্ছেন মহৎপুরের প্রাক্তন জমিদার বাড়ীর বংশধর গণেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় সাত মাইলের পাশে এক ছোট্ট ঘরে। কেই বা দেখে তাঁকে ?

মহারাজ পুরে

১। পারিচিতি—

প্রাচীন মহারাজপুর আজ নেই। নেই কোন রাজা বা মহারাজাও কিন্তু ছড়িয়ে আছে স্মৃতির পসরা গাছে গাছে বনান্তরে—ভগ্নস্তূপে—দীঘির বুকে পুরনো ইট আর ভগ্ন মৃৎপাত্রের বুকে—ও দেবতার থানে।

বর্তমানে সীমানগরের পূর্ব দিকে যে বিস্তীর্ণ বনভূমি সৃজন করা হয়েছে তারই পূর্ব দিকে যে সূর্য্য হারা অরণ্য এলাকা সেইখানেই ছড়িয়ে আছে অতীত দিনের মহারাজপুরের বিলুপ্ত ইতিহাস। লোকে বলে এখনো গভীর রাতে ঐ জঙ্গলে শোনা যায় নানা বিচিত্র শব্দ। কখনো ভেসে আসে আর্তনাদ। কখনো বা শোনা যায় অট্টহাসির শব্দ। ঠুংঠাং শব্দও আসে ভেসে। শোনা যায় ঝনঝন অসির ঝংকারও।

২। প্রাক্ ইতিহাস—

মহারাজপুরের পাশেই জামরী ডাঙায় রয়েছে 'ঝন্ঝনিয়ার' মাঠ। এই মাঠেই নাকি হয়েছিল অসিযুদ্ধ। ঝন্ঝন্ শব্দের ঝংকার উঠেছিল একদা প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়। লোকে বলে সেই অসিযুদ্ধের স্মৃতিই ধরে রেখেছে ঝন্ঝনিয়ার মাঠ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো ঐ যুদ্ধ হয়েছিল কাদের মধ্যে ? আক্রামণকারী ও প্রতিরোধকারী ছিল কারা ? মহারাজপুরের রাজসৈন্যদের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল কি বখ্তিয়ার খলজীর বাহিনীর ? নাকি ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী বাহিনীর ? অথবা যুদ্ধ হয়েছিল অন্য কোন দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে ?

আজ এতকাল পরে সেই ইতিহাস খুঁজে বের করা কঠিন। তবে মহৎপুর এককালে যে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এ কাহিনী ইতিহাস স্বীকৃত। এখানে বর্গী হামলাও হয়েছিল। জামরী ডাঙার মাঠ ঐ মহৎপুর মৌজার মধ্যেই পড়ে। জাহাঙ্গীর যে ১৪টি পরগণা ভবানন্দ মজুমদারকে দিয়েছিলেন ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তার মধ্যে 'মহৎপুর পরগণা'ও ছিল। ভবানন্দ তাঁর বিশাল জমিদারী দেখা শোনার জন্য মাটিয়ারীতেও একটি রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু বাগোয়ান ও মাটিয়ারী ত্যাগ করে ভবানন্দ পৌত্র রাঘব রাজধানী স্থানান্তরিত করেন 'রেউই' নামক স্থানে যা আজ কৃষ্ণনগর বলে খ্যাত।

কাজেই একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে বর্তমান জঙ্গলাকীর্ণ মহারাজপুরের ভবানন্দ মজুমদারের বংশধরদের কেউ বসবাস করেনি বা রাজত্বও করেনি যদিও মোগল যুগেও সমৃদ্ধ অঞ্চলে হিসাবেই গণ্য ছিল মহৎপুর পরগণার অধীন বর্তমান মহারাজপুরও আশে পাশের অঞ্চল।

অনেকে মনে করেন 'মহৎপুরই' বিবর্তিত হয়ে 'মহারাজ পুর' হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে মহৎপুর পরগণার জমিদার বা শাসকের প্রাসাদ ছিল হয়তো বর্তমান অরণ্য বেষ্টিত স্থানে এবং সেই সূত্রেই এলাকারনাম হয়ে যায় মহারাজপুর।

মহারাজপুরে যে জমিদার বা শাসকই থাকুননা কেন ১৬১২ এর পরে তিনি ভবানন্দমজুমদার এর অধীনেই যে শাসন চালাতেন এবং কর সংগ্রহ করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কেননা ঐ অংশের মূল মালিক তখন তিনিই।

এখন প্রশ্ন হলো ঐ সমৃদ্ধ অঞ্চল প্রাসাদাদিসহ ধ্বংস হলো কি ভাবে ?

'ঝন্‌ঝনিয়ার মাঠ সাক্ষ্যদেয় যে একদা ওখানে অসি যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু আক্রামণ কারী ছিল কারা ? বক্তিয়ার খল্‌জীর বাহিনী অথবা পরবর্তী কোন তুর্কী বা আফগান বাহিনী ? যদি তাইই হয় তবে ঐ ঘটনা ঘটেছিল ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বা তার পরে অর্থাৎ সেন যুগের শেষ পর্বে। তাহলে ধরে নিতে হয় ঐ অংশে তখন রাজত্ব করছিলেন সেনদের অধীনস্থ কোন সামন্ত রাজা।

কিন্তু তুর্কী বা আফগান সেনাদের হাতে ঐ সামন্তশাসক পরাজিত বা নিহত হলে নিশ্চয়ই তার পরে কোন তুর্কী বা আফগান শাসকেরই ঐ অংশে রাজত্ব করার কথা কিন্তু তা যে হয়নি পরীক্ষিত মন্দির এবং পরীক্ষিত তলাই তার প্রমাণ। অথচ তার বহু বছর পরেও ঐ অঞ্চল সমৃদ্ধ অঞ্চল বলেই গণ্য ছিল এবং ঐ পরগণা লাভ করেছিলেন ভবানন্দ মজুমদার ১৬১২ খৃষ্টাব্দে। তাহলে কি তুর্কী বা আফগানদের হাতে ধ্বংস হবার পরেও নতুন করে জেগে উঠেছিল ঐ অঞ্চল পুনরায় বিদেশী শক্তিকে পরাভূত করে ?

নাকি বর্গী আক্রমণে ধ্বংস হয়েছিল মহারাজপুর ? ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী বাহিনীর সঙ্গেই কি লড়াই হয়েছিল মহারাজপুরের শাসকের এবং ৭৬ এর মন্বন্তরে বাংলার বহু সমৃদ্ধ জনপদের মতো এই অংশও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ? নাকি কালান্তক ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পালিয়েছিল সবাই ঘর বাড়ী ছেড়ে ? অথবা মহাপ্লাবন বা ভূমিকম্পেই ধ্বংস হয়েছিল এই এলাকা ?

এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজ আর পাওয়ার উপায় নেই। ইতিহাস যে নীরবে মুখ বুজে আজ মহারাজপুরের দুর্গম জঙ্গলে কাঁটা ঝোপ আর বেত বাগানের অন্তরালে হিস্ হিস্ অজগরের প্রহরায়।

৩। বর্তমান অবস্থা—

তবু বিশাল বিশাল প্রাচীন দীঘি, ইট, ভাঙা মৃৎ ও প্রস্তর পাত্র এবং প্রাচীন দিনের মুদ্রারা আজো জিজ্ঞাসুদের কাছে ডাকে। গহন গভীর বনের মধ্যে ফিস্ ফিস্ কথা ভাসে। অশথ-শাল-বাঁশ, অর্জুন আর যগ ডুমুরের ডালে ডালে বিস্ময় জাগে। পরীক্ষিৎ তলায় বছরের একটা দিনে ঢাক বাজে, পুজো হয় পরীক্ষিৎ দেবের ভগ্ন মন্দিরে। ভক্তজনরা আসেন। মেলাও বসে। নির্জনতা ভেঙে জেগে ওঠে বনভূমি প্রাচীন দিনের স্মৃতি সূত্রে অবগাহনের আশায়।

কিন্তু সে ঐ একটি দিনের জন্যই। আগে বাউলের দল আসতো। গান বাজনা হতো। কীর্তনও হতো কিন্তু বর্তমানে আর হয় না। নতুন একটা পরীক্ষিৎ তলাও হয়েছে দৈয়ের বাজারের কাছে এই দুর্গম বনে লোক আসতে চায় না বলে। সেখানেও ঐ একই দিনে অর্থাৎ উল্টোরথের পরের দিন পূজাপাঠ হয়। পূজা কমিটির মধ্যে মতান্তরের ফলেই নাকি দুটি ভাগ হয়েছে।

এই অঞ্চলটি পড়েছে ২নং মহৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। মূল পরীক্ষিৎ তলায় ভগ্নমন্দিরের একাংশে কিছু ছোট ছোট পাতলা ইটের গাঁথনি আছে মাত্র। আর আছে একখণ্ড পাথর পরীক্ষিৎ দেবের প্রতীক। পাশেই রয়েছে ফল্‌গাছ। রয়েছে বাঁশ বনও।

এইদেব স্থানটি নাকি খুবই জাগ্রত পীঠস্থান। এই অংশের কোন গাছপালা কাটলে নাকি মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মৃত্যু নিশ্চিত।

৪। কে এই পরীক্ষিৎ দেব ?

কতো যুগ ধরে যে এই পরীক্ষিৎ দেবের পুজো হয়ে আসছে তা বলতে পারে না কেউই। কিন্তু জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে যাঁর পুজো হচ্ছে আজো এই গহন বনে তাঁর পরিচয়ই বা কি ? বলতে পারেনা এই মৌজার প্রাচীন-প্রাচীনাদের কেউই।

ইনি কি শিবের প্রতিভূ ? নাকি ছদ্মবেশী ধর্মরাজ ? নাকি অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিৎ ? অথবা পরীক্ষিৎ নামের অন্য কোন রাজা ? নাকি রাজকুল গুরু ? অথবা কোন বিখ্যাত সন্ন্যাসী বা দৈবজ্ঞ ?

মহারাজপুরের জনমানব শূণ্য বনান্তরে শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশে এক মহিলা সহ পাঁচজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কাঁটা আর বিছুটির হাতে লাঞ্ছিত হতে হতে সারাটা দুপুর শুধু নানা প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছি সেদিন কিন্তু সমাধান হয়নি কোন প্রশ্নেরই।

নির্ণয় করতে পারিনি ঐ রাজার কাল। সনাক্ত করতে পারিনি রাজাকেও। পরীক্ষিৎ দেবকেও চিহ্নিত করতে পারিনি তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে।

পৌরাণিক অভিধানে দুজন পরীক্ষিতের কথা আছে। একজন দ্বাপর যুগের অর্জুন পুত্র অভিমন্যুর সন্তান যিনি অশ্বত্থমার ব্রহ্মশির অস্ত্রে উত্তরার গর্ভেই নিহত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পুনর্জীবন দান করেন। অবশ্য পরে তিনি মৃগয়ার কালে শমী নামে এক মৌনব্রতী তপস্বীর গলায় মৃত সাপ ঝুলিয়ে দিয়ে ঐ শমীক মুনীর পুত্র শৃঙ্গী কর্তৃক অভিশপ্ত হন এবং সাত দিনের মধ্যেই তক্ষকের দংশনে প্রাণ হারান।

দ্বিতীয় জন হলেন ইক্ষাকু বংশীয় রাজা। তিনি একদা মৃগয়ার কালে তৃষ্ণার্ত হয়ে সরোবরে জলপান করতে গেলে এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখতে পান এবং বিবাহ করতে চান ঐ কন্যাকে। ঐ কন্যা সর্তদেন যে রাজা তাঁকে জল দেখালেই তিনি প্রস্থান করবেন। পরীক্ষিৎ রাজী হন। বিবাহ হয় তাঁদের। এই ঘটনার বহুদিন পরে ঐ রাজা একদিন প্রতিশ্রুতি ভুলে রাজ উদ্যান সংলগ্ন এক মনোরম দীঘিতে ঐ রাণীকে নামতে বললেন ঐ রাণী ঐ দীঘিতে নেমেই অদৃশ্য হয়ে যান।

রাণীর অন্বেষণে রাজা ঐ দীঘির জল ছেঁচে ফেলেন এবং দেখতে পান একটি ব্যাঙকে। ক্রোধে রাজা সমস্ত ব্যাঙ ধ্বংসের আদেশ দিলে ব্যাঙেদের রাজা তপস্বীর বেশে পরীক্ষিতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রাজাকে বিরত হতে বলেন এবং জানালেন পরীক্ষিতের স্ত্রী সুশোভনা তাঁরই কন্যা। রাজার প্রার্থনায় তিনি সুশোভনাকে ফিরিয়ে দিলেন বটে কিন্তু অভিশাপ দিলেন তাঁদের পুত্র শল, দল ও বল ব্রাহ্মণ কুলের ক্ষতি করবেন।

এখন প্রশ্ন হলো এই দুই পরীক্ষিতের মধ্যেই কোন একজন কি মহারাজ পুরের পূজ্য দেবতা পরীক্ষিৎ ? নাকি পরীক্ষিত তলার পরীক্ষিৎদেব অন্য কেউ ?

চন্দ্রবংশীয় রাজা অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিৎ এবং ইক্ষাকু বংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ দুজনের ভাগ্যেই জুটেছে অভিশাপ। একজনের প্রাণবিয়োগ ঘটেছে অন্যজন ব্রাহ্মণ কুলের ক্ষতির কারণ হয়েছেন।

পৌরাণিক যুগের এই দুজনের মধ্যে যদি কেউ পরীক্ষিত তলার পূজ্য দেবতা হন তবে অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিতের দাবীই বেশী বলে মনে হয় আমাদের। কেননা উল্টোরথ যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই পূজা। কৃষ্ণ সুভদ্রা, বলরাম মাসীর বাড়ী থেকে স্বস্থানে যেদিন ফিরছেন ঠিক তার পরের দিনই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পরীক্ষিৎ দেবের পূজা। দাদু-দিদারা ফিরছেন আর নাতির পূজা শুরু হচ্ছে—মন্দকি ?

তবে পরীক্ষিৎ দেবের পূজা ভারত বর্ষের আর কোথাও হয় বলে জানা নেই আমাদের। এ এক বিরল ঘটনাই বলতে হবে। মাতৃগর্ভে নিহত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে প্রাণ পেয়েছিলেন বলেই কি তিনি পূজ্য ? নাকি পাণ্ডবদের মহা প্রস্থানের সময় ভারতের রাজ্যভার তাঁর হাতে পড়েছিল বলেই তিনি পূজ্য ?

বর্তমানে অবশ্য শিবমন্ত্রেই পূজিত হচ্ছেন পরীক্ষিৎ দেব তবে অতীতে কোন্ মন্ত্রে পূজিত হতেন জানা নেই কারো। অতীতে কোন মূর্তি ছিল কিনা জানা যায় না সে কাহিনীও।

বার্ণিয়া

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার এক উল্লেখযোগ্য স্থান এই বার্ণিয়া। বর্তমানে বার্ণিয়া আর গ্রাম নেই। রূপ নিয়েছে গঞ্জের। দোকান-বাজার স্কুল, ভিডিও হল নিয়ে গম্ গম্ করছে অজ বার্ণিয়া। এই বার্ণিয়ার নামকরণ নিয়ে আছে নানামত—

২। নামকরণ—

কেউ বলেন বার্ণিয়া নামটি এসেছে কোন নীলকর সাহেবের নাম থেকে। যেমন বার্ণপুর হয়েছে বার্ণ সাহেবের নাম থেকে। তবে বার্ণিয়া বলে এই অঞ্চলে কোন নীলকর সাহেবের নাম পাওয়া যায় না।

আবার কেউ বলেন বার্ণিয়া নামটি এসেছে বন্যা বা বান থেকে। বান-নিয়া > বার্ণিয়া। এখানে নাকি বান লেগেই থাকতো। বান নিয়ে বসত করতো লোকেরা তাই বাননিয়া > বার্ণিয়া।

আবার কেউ মনে করেন বরণীয়া থেকে এসেছে বার্ণিয়া। বরণীয়া > বার্ণিয়া > বার্ণিয়া।

আবার কেউ কেউ মনে করেন একদা এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাসছিল। ব্রাহ্মণের অধ্যুষিত স্থান বলেই 'বার্ণিয়া' নাম হয়েছে—ব্রাহ্মণ > ব্রাহ্মণিয়া > বার্ণিয়া।

৩। বার্ণিয়ার বুদ্ধ মূর্তি—

বার্ণিয়ায় একদা ব্রাহ্মণদের দাপট ছিল। কিন্তু তারো আগে এখানে ছিল বৌদ্ধ প্রভাব। প্রাচীন দীঘির পাড়ের বকুলগাছের তলায় স্তম্ভের গায়ে যে বুদ্ধ মূর্তিটি ছিল সেটাই এই বৌদ্ধ প্রভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ঐ স্তম্ভের গায়ে যে বুদ্ধ মূর্তিটি ছিল সেটি পাওয়া যায় জমিদারদের বড় দীঘিটি খননের সময়। দীঘিটার সিঁড়ি থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পার্টিসান দেওয়া আছে স্নানের জন্য। মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। স্নান সেরে ঐ বুদ্ধমূর্তির পায়ে ফুল জল দিত আগে পুরুষ ও মহিলারা। দেবতা জ্ঞানে ঐ স্তম্ভের মূর্তিকে পূজো করতো। কিন্তু কিছুদিন আগে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ঐ মূর্তিটা ভগ্নস্তম্ভ সহ চুরি করে নিয়ে গেছে। কোন প্রত্নদ্রব্য রসিক ব্যক্তিই যে ঐ ঐতিহাসিক পুরাবস্তুটি অপহরণ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্তম্ভের গায়ে যে বুদ্ধমূর্তিটি ছিল সেটি কষ্টি পাথরের। বর্তমানে সেই বকুলগাছটিও শুখিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ঐ বুদ্ধমূর্তিটি চুরি হয়ে যাবার পরেই গাছটি শুখিয়ে যেতে শুরু করে।

এখন প্রশ্ন হলো স্তম্ভের গায়ে ঐ বুদ্ধমূর্তিটা ওখানে এলো কিভাবে ? একদা নিশ্চয় এখানে কোন বৌদ্ধ বিহার ছিল অথবা কোন ধনবান বৌদ্ধ ব্যক্তির প্রাসাদ ছিল বা কোন বৌদ্ধ দেবালয় বা উপাসনাগার ছিল নিশ্চয়—এমন অনুমান করা যেতে পারে।

পালযুগে বা তারে আগে এই অঞ্চলে ও অন্যান্য গ্রামে যে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে জলঙ্গীর পূর্বতীরে আলফা-ফুলবাড়ীর স্তূপে এবং শিব বা ধর্মরাজের পূজাতেও বৌদ্ধ ভাবনার পরিচয় মেলে। হর প্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় জামালপুরে মনসা গাছের

ডালে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের চিহ্নযুক্ত একখণ্ড পাথরও পেয়েছিলেন। পূজার মন্ত্র ছিল 'শিবায় ধর্মরাজায় নমঃ।' সেখানে শূয়োর-মোরাগ এবং পাঁঠা বলি হতো আগে।

আবার নবদ্বীপের ব্রহ্মাণীতলা বা কালী গঞ্জের ব্রহ্মাণী তলাতেও ধর্মরাজের পূজা হয়ে থাকে। নদীয়ার আরো বহুস্থানে ধর্মরাজের পূজো হয়ে থাকে এখনো।

আগে বার্ণিয়ার ঐ বুদ্ধ মূর্তির বিশেষ পূজো হতো বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমায়। ছোট একটি মেলাও বসতো। তবে বর্তমানে স্তম্ভসহ মূর্তিটি চুরি হয়ে যাবার পরে সেই বিশেষ পূজাও হয় না এবং মেলাও বসেনা। হায়, এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কতো প্রাচীন ঐতিহ্য এদেশে তার হিসাবই বা রাখে কে ?

তবে বার্ণিয়ার ঐ দীঘির আশে পাশে খনন কাজ চালালে হয়তো এখনো মিলতে পারে বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন কিন্তু এই কর্মযজ্ঞে হাত লাগায় কে ? দেশপ্রোমিক সুধীজনের দৃষ্টি কি এই সব প্রাচীন দিনের স্মৃতি উদ্ধারে নিবদ্ধ হবে না এই এক বিংশ শতকেও ?

৪। জমিদার বংশ—

বর্তমানে বার্ণিয়ার লোক সংখ্যা প্রায় চার হাজার। বার্ণিয়ার পাশেই রয়েছে বরেয়া, মাঠকরালিয়া, আড়বেতাই, হাঁসপুকুর ও উজিরপুর গ্রাম। একদা এই অঞ্চলে প্রচুর ফসল ফলতো তাই প্রচলিত প্রবাদ ছিল—"যার নেই চাল চুলো
সে যায় পার কুলো।"

বার্ণিয়ার প্রাক্তন জমিদার হলেন ঘোষ চৌধুরীরা। এঁদের পূর্ব পুরুষরা এসেছিলেন উত্তর ভারত থেকে। মোষের দল নিয়ে তাঁরা আসতেন এই অঞ্চলে। মোষ চরাতে চরাতেই নাকি তাঁদের ভাল লেগে যায় এই চারণভূমি। এখানে মোষের বাথান করে থেকেও যেতেন তাঁরা বেশ কয়েকমাস। মোষ ও দুধ বিক্রী করে টাকা পয়সা কামিয়ে প্রথম প্রথম দেশে ফিরে যেতেন তাঁরা আবার বর্ষার আগে চলে আসতেন মোষ নিয়ে। নাব্যভূমিতে তখন খুব ভাল ঘাস জন্মাতো। ঘোষ চৌধুরীরা নীলামে কিনে নিলেন এই এলাকার সব জমি। ঘর বাড়ী তৈরী করে গুছিয়ে বসলেন এখানে জমিদার হয়ে।

বার্ণিয়ার প্যারী মোহন ঘোষ বা অন্যান্য প্রাচীন ব্যক্তিদের মতে ঘোষ চৌধুরীরা বিত্তশালী ছিলেন বটে কিন্তু শিক্ষা বিস্তার বা জনকল্যাণমূলক কাজে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এমন নজির বিশেষ নেই। তবে একদা এই ঘোষ চৌধুরীদের প্রতাপ ছিল খুবই। খুবই জাঁকজমক করে দুর্গাপূজা হতো আগে দুর্গামণ্ডপে। তবে বর্তমানে দুর্গাবাড়ীর ভগ্নদশা। বহু জমি বর্গা হয়ে গেছে এঁদের। বংশগৌরব এবং প্রাচীন ঐতিহ্যে তবু এঁরা এখনো গর্বিত।

৫। বক্সো মিঞার দরগা ও বক্সো মিঞা—

সিদ্ধপুরুষ বক্সো মিঞাকে নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে এই অঞ্চলে। শোনা যায় বক্সোমিঞা ছিলেন আত্মভোলা সাধক। লোকে তাঁকে ডাকতো খ্যাপা বাবা বলে।

প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন জনমজুর। এক গৃহস্থের বাড়ীতে কাজ করতেন বক্সো মিঞা। একদিন ঐ গৃহস্থ ধানক্ষেতে ভুরুই পাখী তাড়ানোর দায়িত্ব দিলেন বক্সো মিঞাকে। মাঠে গেলেন বক্সো মিঞা। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হলো ধান খাওয়ার পরে ভুরুই পাখীদের নিশ্চয় জল পিপাসা লেগেছে তাই তাদের না তাড়িয়ে পাতার ঠোঙায় জল এনে তাদের তৃষ্ণা নিবারণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই সব দেখে গৃহস্থতো রেগে লাল। এই মারেন তো ঐ মারেন।

অবশেষে ধান যখন কাটা হলো তখন পাওয়া গেল মাত্র এক ধামা ধান। গৃহস্থের রাগ আর থামে না এবার খ্যাপাকে তিনি কাজ থেকে ছাড়াবেনই ছাড়াবেন। খ্যাপা বক্‌সো তবু নির্বিকার। মুখে তাঁর মৃদুহাসি। বাবুর রাগ দেখে খ্যাপা বললেন—'বাবু, আপনি গোলায় ওঠেন আমি ধান তুলে দিচ্ছি। কিছু ভাববেন না আপনি। দ্যাখেনই না গোলা ভর্তি হয় কিনা? বিরক্ত হয়েই শেষ পর্য্যন্ত গোলায় উঠলেন মালিক। ধান তুলে দিতে লাগলেন বক্‌সো খ্যাপা। দেখতে দেখতে গোলা গেল ভর্তি হয়ে। ধামায় যা ধান ছিল সেই ধানই রয়ে গেল তখনো। মনিব এতক্ষণে বুঝলেন 'এ খ্যাপা তো সাধারণ খ্যাপা নয়।' সেই থেকেই খ্যাপা বক্‌সোর সব অপরাধ মাপ হতে লাগলো।

ক্ষ্যাপা বক্‌সো মিঞার সম্বন্ধে প্রচলিত অন্য একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে তাঁর মৃত্যুর পরে যখন বাড়ীর লোকজন কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে ঠিক তখনই বার্ণিয়া থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে মাটিয়ারীর গঙ্গার ঘাটে বার্ণিয়ারই একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। বক্‌সো মিঞা তাকে বলেন—'আমার ঘরের তাকের ওপরে একটা বাক্সে কিছু টাকা আছে। ঐ টাকাটা অমুক লোক পাবে। তাকে যেন দিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ব্যক্তি বার্ণিয়ায় ফিরে শোনেন বক্‌সো মিঞার দেহাবসান হয়েছে। টাকাটা পাওয়া যায় যথাস্থানে এবং সেই বিশেষ ব্যক্তিকে দিয়েও দেওয়া হয়।

বক্‌সে মিঞার সম্বন্ধে এমন বহু কাহিনী প্রচলিত আছে বার্ণিয়ায় ও তার আশে পাশে।

বক্‌সো মিঞাকে বার্ণিয়া ও তার আশে পাশের গাঁয়ের লোকেরা জানে 'খ্যাপা বাবা' বলে। ঐ খ্যাপা বাবার দরগাকে সকলেই মান্য করেন হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান সব ধর্মের লোকই আসেন ঐ দরগায়। মানতও করেন। ঐ পীরের থানকে অতি জাগ্রত বলেই মানে সবাই। মানত পূরণ হলে সিন্নিও দেয় লোকে দরগায়। খ্যাপা বাবার দরগাকে মেয়েরা এতটাই মানে যে কারো সঙ্গে ঝগড়া বাধলে বলে—"তোর সর্বনাশ হোক। আমি খ্যাপা বাবার কাছে সিন্নি দেব।"

প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের শেষ বৃহস্পতি বারে পীরের দরগা ঘিরে মেলা বসে। নানা প্রান্ত থেকে হাজার হাজার নরনারী আসে ঐ মেলায়। বাংলাদেশ থেকেও আসে বহু নরনারী। লোকে সিন্নিদেয়, গাছের প্রথম ফল দেয়, টাকা-পয়সা, অলংকারাদিও দেয় অনেকে।

বহু কঠিন কঠিন রোগ সেরে যায় পীরের দয়ায়। মেলার সময়ে পীরের দরগায় ক্ষীরের প্রসাদ দেওয়া হয় আজো। এ প্রসঙ্গে যে লোক শ্রুতিটি প্রচলিত আছে সেটি হলো এইযে—'একবার নাকি ঐ পীর নিজে হাতে ক্ষীর রেঁধেছিলেন ভক্তদের নিজের হাতে খাওয়াবেন বলে। কিন্তু সেদিন কেউই এলো না দেখে অভিমানে পীর ঐ ক্ষীর পুঁতে ফেলেন মাটির তলায়। পরের বছর মেলার সময় মাটি খুঁড়ে যখন তোলা হলো ঐ ক্ষীর তখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে দেখা গেল ঐ ক্ষীর থেকে। সকলেতো ঘটনা দেখে হতবাক্।

বর্তমানে ঐ দরগার ওপরে পাকা বাড়ী হয়েছে। এখনো দীঘির পাড়ে মেলা বসে শ্রাবণ মাসে। হাজার লোকের ভীড়ে জমে ওঠে মেলা। নিত্য দর্শন করে বহু ভক্ত সেই দরগা। বর্তমানে লখাই ফকিরই দেখ্‌ভাল করে ঐ দরগার। ৩১ বছর ধরে সেই লেগে আছে ওখানে। ধোয়া মোছা করে। প্রণামী গুছিয়ে রাখে। দরগার পাশেই রয়েছে মুসলমান পাড়া। অন্য পাশে অবশ্য হিন্দু পাড়াও আছে। সবাই মান্য করে দরগাকে।

৬। উজির পুর—

বার্ণিয়ার দক্ষিণে কিছু দূরেই রয়েছে উজিরপুর। কোন রাজা অথবা বার্ণিয়ার ঘোষ চৌধুরীদের উজিররা এখানে বাস করতেন বলেই এ স্থানের নাম উজিরপুর হয়েছে কিনা

তা জানা না গেলেও উজিরপুরের ছায়া সুনিবিড় পরিবেশটি কিন্তু খুবই মনোরম। হৃদয় জুড়িয়ে যায় উজির পুরের বুড়ীনিমা এবং হরিতলার স্নিগ্ধ পরিবেশে।

৭। **বুড়ীনিমা**—

এখানে রয়েছে প্রাচীন দীঘির পশ্চিমপাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ১৫টি বিশাল তেঁতুলগাছ, ২টি প্রাচীন অশত্থ গাছ, তিনটি নিমগাছ, দুটি কদবেল ও একটি তমাল গাছ। বুড়ীনিমার থানটি উঁচু মাটির ঢিবিতে। চারপাশে ইট দিয়ে বাঁধানো। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় বেদীতে। প্রাচীন নিম আর অশত্থ জড়াজড়ি করে আছে এখানে। বুড়ীনিমা লৌকিক দেবী। চৈত্রমাসে বিশেষ পূজা হয় দেবীর। এটি আসলে মা শীতলারই থান। দীঘিতে ডুব দিয়ে স্নান সেরে তবে পূজা দেওয়া যায় বুড়ীনিমার।

কতো যুগ ধরে যে বুড়ী নিমার পূজা হয়ে আসছে বলতে পারেনা কেউই। সম্ভবত আদিম বৃক্ষ পূজারই প্রতিভূ এই বুড়ীনিমার পূজা। তবে আগে যেমন ধুমধাম করে বার্ষিক পূজা হতো বর্তমানে তেমনটা হয়না। এর প্রধান কারণ হলো হরি মন্দির স্থাপন। বসন্তকালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় খুবই ধুমধাম হয় হরিতলায়। হাজার হাজার লোকের ভীড়ে গমগম করে ওঠে তখন হরিতলা। মেলাও বসে। খিচুড়ী ভোগ হয়। তৃপ্ত হয় হাজার হাজার ভক্তজন। ঐ খিচুড়ী খেলে নানা রোগও সেরে যায় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। আগে রাঁধা খিচুড়ী, মাটিতেই রাখা হতো কিন্তু বর্তমানে সিমেন্টের বাঁধানো চৌবাচ্চায় রাখা হয়।

বুড়ীনিমাকে আবার অনেকে ষষ্ঠী তলাও বলে থাকে। অতি জাগ্রতা এই বুড়ীনিমা। কোন মূর্তি নেই এখানে। মানত করে অনেকেই বুড়ীনিমার কাছে। বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে আজও যে পূজা হয়ে আসছে বুড়ীনিমা তারই দৃষ্টান্ত।

বর্তমানে বুড়ীনিমা এবং হরিতলা উজির পুরের অন্তর্ভূক্ত হলেও আসলে এই অংশটি বার্ণিয়ারই অংশ।

৮। **ব্রত পূজাপার্বণ**—

ইতুপূজা, ষষ্ঠীপূজা এবং জন্মাষ্টমীর উৎসব হয় খুব ঘটা করে এই গ্রামে। আগে গাজন হলেও বর্তমানে গাজন উৎসব উঠে গেছে। তবে ১লা বৈশাখ হালখাতা হয় ঘটা করে। গণেশ পূজো [illegible] থাকে।

দুর্গাপূজা, কা[illegible] এবং সরস্বতী পূজার সময় অন্যান্য অঞ্চলের মতো বার্ণিয়াতেও আনন্দের হাট বসে য[illegible]।

বার্ণিয়ার দোল উৎসবে[illegible]খ্যাতি ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে।

।। চিলাখালিতে ।।

১। ভূমিকা—

জিতপুর থেকে মনোজিত, সেমিম, বাবলু ও আমি সাইকেলে এগিয়ে চলেছি শীতের মিঠে রোদ্দুর মাখতে মাখতে লক্ষ্য চিলাখালি। মাঠে সবুজ শস্যের হাসি। ঝল্‌মলে রোদ। গুণগুণিয়ে উঠছে মনের ভিতরে—

—এমন মায়াবী শীতের দিনে
ছায়াময় পথে আহা নিজ ভূমি চিনে—
চলা আর চলা শুধু সময়ের টানে
ঝিল্‌মিল্‌ সোনারোদে বাংলারি গানে.....

২। পরিচিতি—

রীতিমতো আবেগদৃপ্ত হয়েই এক সময় পীচ রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে ঢুকে পড়ি আমবাগানে। হ্যাঁ এটাই চিলাখালি। ছবির মতো বাহারি গ্রাম।

৩। নামকরণ—

লোকে বলে আগে নাকি চিলাখালির নামছিল চিত্রখালি অর্থাৎ ছবির পরে ছবি। খালি চিত্রের বাহার। পরবর্তীকালে চিত্র থেকে চিত্তর—চিল—চিলা।

আবার কেউ বলেন একদা পাশেই ছিল নদী সেই নদীর আশে পাশে ছিল বহুচিল। আকাশে যখন পাখী উড়তো তখন দেখা যেতো শুধুই চিল আর চিল। ঐ চিলের আধিক্যই এ গ্রামের নামকে প্রভাবিত করেছে। নাম হয়েছে চিলাখালি।

৪। ভাদুড়ী বাড়ী—

এই চিলাখালির নাম ছড়িয়ে পড়েছে মূলত যে পরিবারের জন্য সেই পরিবার হলো ভাদুড়ী পরিবার। চিলাখালির ভাদুড়ী বংশ অতিপ্রাচীন বংশ। প্রথমে এদের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন ঢাকায়। চিলাখালির ভাদুড়ীরা দাবী করেন যে আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়ে ছিলেন কনৌজ থেকে তাঁদের অন্যতম হলেন এই ভাদুড়ীদের পূর্বপুরুষ। কালক্রমে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন বাংলার নানা অঞ্চলে।

(ক) কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী—

চিলাখালি তথা নদীয়ার ভাদুড়ীরা হলেন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধর। আদিতে এঁরা থাকতেন ঢাকায়। এই বংশের কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজা গিরীশ চন্দ্র রায়ের সভাকবি। তাঁর অসামান্য রসজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের জন্য গিরীশচন্দ্র তাঁকে 'রসসাগর' উপাধি দেন। ভাদুড়ীদের বাসগৃহের সম্মুখে কৃষ্ণকান্তের স্মৃতি সৌধ নির্মিত হয়েছে। ঐ সৌধের ওপরে একটি শ্বেত চন্দনের গাছ লাগানো হয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি সুন্দর তমাল গাছও।

একদা চিলাখালির ভাদুড়ীদের বাড়ীতে চতুষ্পাঠীও ছিল। প্রচুর শিক্ষার্থীও ছিল। চিলাখালির চতুষ্পাঠীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল আশে পাশের জেলাতেও। প্রচুর হাতে লেখা পুঁথিও ছিল তখন চতুষ্পাঠীতে। মাটির আটচালা ঘরে চলতো পড়াশোনা। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং যে পুরানো গ্রন্থাদি ছিল সেসব গতবারের বন্যায় ভেসে গেছে। পড়ে গেছে সেই মাটির আটচালা ঘরও। ন্যায়, ব্যাকরণ, তন্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদির পাঠ দেওয়া হতো

যেখানে বিপুল উৎসাহে সেখানে আজ বিরাজ করছে নিঃসীম নির্জনতা। ছাত্র নেই। অধ্যাপক নেই। নেই কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা বা মন্ত্র উচ্চারণ। নেই কোন তর্ক বা সূক্ষ্মবিচার কিংবা কোন বিতর্কসভা।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এই চিলাখালির ভাদুড়ীদের। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি চিলাখালিতে এসেও ছিলেন।

৫। বর্তমান অবস্থা—

চিলাখালির বাসিন্দারা মূলত কৃষি নির্ভর হলেও লেখাপড়ার চর্চা আছে গ্রামে। বহু কৃতি সন্তান ছড়িয়ে আছে জেলার নানা প্রান্তে। রাজনৈতিক দলাদলি এবং বিরোধ থাকলেও গ্রামে শান্তি আছে। রাস্তার ধারে দোকান-বাজার বসতে শুরু করেছে। গ্রামে আম-কাঁঠালের বাগান রয়েছে। একদা গ্রামের কাছেই নদী ছিল। বর্তমানে সেই নদী মৃত। তবে পুরনো নদীর খাত আছে। বর্ষাকালে জল জমে সেই খাতে। তখন বিলের রূপ নেয় মাঠ।

তবে চিলাখালির খ্যাতি ছড়িয়েছে মূলতঃ ভাদুড়ীদের জন্যই। বর্তমান ভাদুড়ীরা দাবী করেন তাঁদের বংশেই নদীয়ার শেষ সতীদাহর ঘটনা ঘটেছে। নদীর পারে যে স্থানটা আজ 'মড়িঘাট' নামে পরিচিত ঐ খানেই ঘটেছিল সেই সতীদাহ।

৬। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাদুড়ীরা—

চিলাখালির ভাদুড়ীরা যেমন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন পাণ্ডিত্যের জন্য তেমনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছিলেন এঁরা। জেলও খেটেছেন এই বংশের লোকজন। চাঁদা তুলেছেন দেশের জন্য। ঘটিয়েছেন জন জাগরণও। কিন্তু এই বংশের কেউই আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশান্ নেননি।

ভীষণ জেদিও ছিলেন ভাদুড়ীরা। স্থানীয় জমিদার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জমিজমা এবং আম বাগান নিয়ে মামলাও চলেছে দীর্ঘদিন। সর্বস্বান্ত হয়েছেন তবু হারমানেননি ভাদুড়ীরা। মামলার জন্য গৃহদেবতার সিংহাসন পর্য্যন্ত বিক্রী করেছেন এরা তবু পিছু হঠেননি।

চিলাখালির ভাদুড়ীদের বাড়ীতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি বা পুঁথিপত্রই শুধু ছিল না ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনও। আকবরী রূপোর সিক্কা ছিল বেশ কয়েকটা। ছিল মীরকাশিমের দেওয়া মূল্যবান একটিও তরবারিও। বর্তমানে ঐ তরবারি এবং সিক্কা নগেন্দ্র নগরের মোহিত রায়ের বাড়ীতে আছে। মিউজিয়ামে জমা দেবেন বলে ঐ সব দ্রব্যগুলি নাকি মোহিত বাবু নিয়ে গেছেন বলে জানালেন ভাদুড়ীদের বর্তমান দরিদ্র বংশধরগণ।

বর্তমানে খড়ের চাল দেওয়া একটা মাটির ঘরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নিত্য পূজা হচ্ছে কালী মায়ের।

আম কাঁঠালের ছায়া ঘেরা মায়াময় পরিবেশে মন উদাস হয়ে যায় অতীত দিনের কাহিনী শুনতে শুনতে। ভেসে আসে চিলের করুণ সুর। হায়রে অতীত ! হায় স্মৃতি !

৭। পূজা পার্বণ ব্রতাদি—

গ্রামে দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং সরস্বতী পূজা বেশ ধুমধাম সহকারেই হয়। আবার ইতুপূজা, ষষ্ঠীপূজাও করে থাকেন মেয়েরা। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতও পালন করেন অনেকে।

(ক) গাজন— ধুমধাম করে আগে গাজন হতো তবে বর্তমানে তেমন উৎসাহ চোখে পড়ে না।

৮। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—

পূজোর সময় গান বাজনা হয়। নাটকও মঞ্চস্থ হয়ে থাকে কখনো কখনো। তবে চর্চা তেমন নেই। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে সব কিছুই।

কড়ুইগাছির কথা

১। পূজা পার্বণ—

চিলাখালি ছেড়ে এগিয়ে যাই চারজনে মাটির রাস্তা দিয়ে কড়ুই গাছির দিকে। এসে দাঁড়াই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের গোড়ায়। বারোয়ারীতলা হয়েছে সেখানে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা হয় বেশ ধুম ধাম করেই শুনলাম। বারোয়ারী তলার পাশেই রয়েছে প্রাচীন দীঘি। সেই দীঘিতে স্নান করছে বৌঝিরা।

২। মসজিদ—

শীতের রোদ্দুর মাখতে মাখতে লোকের উঠোন পার হয়ে এসে দাঁড়াই আগাছা মাড়িয়ে বাঁশ বাগানের পাশে। চোখে পড়ে এক ভগ্নমসজিদ। বট-অশথের শিকড় নেমেছে মসজিদের ইট-কাঠ চিরে। ভিতরে সাপ এবং বিষাক্ত কীটের আড্ডা। অন্ধকার চার পাশে। হাততালি দিতে দিতে ভিতরে ঢুকি। চোখে পড়ে সাপের খোলস্। বিরক্ত হয়ে মাথার ওপরে ঘুরতে থাকে চামচিকার দল।

পরিত্যক্ত হয়েছে এই মসজিদটি প্রায় আটচল্লিশ বছর আগে। বর্তমানে কড়ুইগাছিতে একঘর মুসলমানও নেই। মসজিদের পাশেই রয়েছে ছোট্ট ডোবা। শোনাগেল এখনও কেউ কেউ অসুখ সারাতে মসজিদে ঢোকে। ধুলো মাখে। আবার মাদুলী বা জল নিয়ে এসে মন্ত্রও পড়ে নেয় অনেকে। কঠিন কঠিন অসুখও নাকি সেরে যায় ঐ মন্ত্রপূত জল বা মাদুলীতে। শরদিন্দু বাবুদের গোমস্তা বিধুভূষণ বিশ্বাসের বংশধররা জানালেন ঐ মসজিদটি তৈরী হয়েছিল ১৩৩০ সালে এবং পরিত্যক্ত হয় ১৩৫২ সালে।

৩। ক্যাথলিক গীর্জা—

কড়ুইগাছিতে বর্তমানে হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করছে বেশ কিছু খৃষ্টানও। গ্রামের ক্যাথলিক গীর্জাটি হয়েছে প্রাক্তন জমিদার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই। কাছারী বাড়ীতে হয়েছে আদিবাসী ছাত্রদের হোস্টেল। বর্তমানে ঐ সব ছাত্রদের দেখাশোনার দায়িত্ব মধ্যপ্রদেশ থেকে আগত এক আদিবাসী খৃষ্টান ফাদারের। বয়সে নবীন ঐ ফাদার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছাত্রাবাস এবং ছাত্রদের নিজের হাতে তৈরী সব্জীর ক্ষেত ও ফুলের বাগান দেখালেন। ঢ্যাঁড়শ-লাউ-কপি বেশ ভালই হয়েছে দেখলাম। ছেলেরাও ভীড় করলো চারপাশে ক্যামেরা হাতে দেখে। ফটো তোলা হলো ওদের।

প্রাচীন নদীর খাতে যে বিশাল দীঘি রয়েছে জমিদারদের তার পাড়ে গীর্জার সাহেবরা আদিবাসীদের জন্য ছোট ছোট পাকাবাড়ী করে দিয়েছেন বেশ কয়েকটা। বেশ পরিচ্ছন্ন বাড়ীগুলো।

গীর্জার কর্তৃপক্ষ এখানে আদিবাসী খৃষ্টানদের জন্য ছোট খাটো কুটীর শিল্পের ব্যবস্থাও করেছেন। নানাভাবে ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা চালাচ্ছেন গীর্জার কর্তৃপক্ষ এখানে। এই সাধু প্রচেষ্টা দেখে বেশ ভালই লাগলো।

অশত্থতলার পাশে চোখে পড়ে সিধুকানুর নামে সদ্য নির্মিত সভাগৃহটিও।

৪। প্রাক্ ইতিহাস—

একসময়ে কড়ুই গাছির পাশ দিয়ে বয়ে যেত প্রাচীন জলঙ্গী নদী। ব্যবসা বাণিজ্য চলতো এই পথেই। জমিদারদের প্রাচীন দীঘিটি যখন নদীর মরাখাতে কাটা হয় তখন প্রচুর গুণ, নৌকার মাস্তুল, ভাঙা কাঠ ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল বলে শোনা যায়।

এখানকার আদিবাসী সাঁওতালদের স্থানীয় জমিদাররাই আনিয়েছিলেন চাষ বাস ও অন্যান্য কাজের জন্য। ভাগ্যের পরিহাসে আজ এখানে জমিদাররা নেই কিন্তু আছে আদিবাসী ও অন্যান্য প্রজারা। ভূমির সন্তান ভূমিতেই আছে জমির মালিক জমিদাররা চলেগেছেন শহরে-নগরে।

৫। নামকরণ—

লোকশ্রুতি বলে একদা নাকি এই কড়ুইগাছিতে খুব ভাল কলাই হতো। তার থেকেই নাম হয় কলাইগাছি—কড়াইগাছি—কড়ুইগাছি।

আবার কেউ কেউ বলেন একদা ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষিতে সমৃদ্ধ ছিল এই অঞ্চল। এখানে নাকি প্রচুর কড়াই কেনাবেচা হতো। তার থেকেই নাম হয় কড়াইগাছি—কড়ুইগাছি।

৬। বর্তমান অবস্থা—

বর্তমানে গ্রামটির সেই প্রাচীন সমৃদ্ধি না থাকলেও গ্রামে শান্তি আছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও আছে। হিন্দু এবং খৃষ্টানদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান বেশ ঘটা করেই হয়ে থাকে এগ্রামে। রাজনৈতিক দলাদলি বা বিরোধ ও তেমন নেই। তবে শিক্ষাব মান তেমন উন্নত নয় এটাই যা বেদনার।

শিবপুরে

১। পরিচিতি—

যদিও নদীয়া জেলার তেহট্ট মহকুমার শিবপুর এক সমৃদ্ধ গ্রাম তবু যোগাযোগের ব্যবস্থা আজো সেই স্বাধীনতা পূর্ব যুগের মতো নই।

শোণপুকুর থেকে হাতিশালার দিকে ভাঙা চোরা আধলা ইট আর খোয়ায় পদে পদে হোঁচট লাগানো মধ্যযুগের যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটার পরেই মিলবে হাতিশালার ঘাট। নৌকা ধরে যেতে হবে ওপারে। উঁচু পাড় ভেঙে পারে উঠতেই দম যাবে ফুরিয়ে। তার পরে বাবলা ছায়ায় ঢাকা কাঁচা রাস্তা ধরে এক কিলোমিটার যাবার পরেই চোখে পড়বে গ্রামের ঘর বাড়ী।

শিবপুরের লোক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় সাড়ে চারহাজারের মতো। এখানে আছে পাঁচটা প্রাথমিক স্কুল এবং একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। পঞ্চায়েত মেম্বার চার। এক সময়ে গ্রামে রাজনৈতিক দলাদলি চরমে উঠেছিল আশির দশকের শেষের দিকে। নিহতও হয়েছিল দু একজন ঐ সময়। গাজন তলায় একজনের মর্মর মূর্তিও রয়েছে। তবে বর্তমানে গ্রাম অনেকটা শান্ত।

২। পূজা পার্বণ—

একদা গাজন হতো খুবই ধুমধাম করে। চড়কও হতো। সন্ন্যাসীদের হর-হর-ব্যোম্ ধ্বনিতে মুখরিত হতো তখন শিবপুরের আকাশ বাতাস। তবে চৈত্র শেষে এখন গাজনের উৎসব হলেও চড়ক হয় না আর। বন্‌বন্ করে চড়কে ঘোরেনা আর সন্ন্যাসীরা। গাজনের সময় ছোট্ট মেলা অবশ্য বসে আজো। যাত্রা এবং বোলান গানের আসরও বসে।

গাজন তলায় ষষ্ঠী পূজা হয়। অশথ গাছের গোড়ায় যে ছোট্ট মন্দির রয়েছে সেখানে রয়েছে কালী ঠাকুরের পটও। পূজা মণ্ডপে দুর্গাপূজাও হয় বেশ ধুম ধাম করে। সরস্বতী পূজাও হয় গ্রামে বেশ কয়েকটা।

৩। জমিদার বাড়ী—

গ্রামের ভিতরে কাঁচা রাস্তায় মাটি পড়ছে। প্রাচীন জমিদার বাড়ীর পূজা মণ্ডপের জীর্ণ দশায় বেদনা জাগে। প্রাচীন প্রাসাদের মলিন দশা আজ। স্বদেশী যুগে এই জমিদার বাড়ীতে ডাকাতি করেছিল স্বদেশীরা। সন্ধ্যাবেলায় মশাল জ্বেলে দশবারোজন ডাকাত ঢুকেছিল জমিদারদের বাড়ী। মোহর এবং সোনার গহনা সহ প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা লুট করেছিল স্বদেশী ডাকাতরা। সেই থেকেই শিবপুরের নাম হয়ে যায় 'ডাকাতে শিবপুর।' তবে চাঁদের ঘাট শিবপুরও বলে অনেকে।

শিবপুরের এই জমিদারদের আদিপুরুষ হলেন শ্রীনিবাস বিশ্বাস। তাঁর বর্তমান বংশধরদের মধ্যে বাবলু বিশ্বাস সরকারী চাকরী করেন। তাঁর এক ভাই কানাডায় থাকেন অন্য ভাই জমিজমা দেখাশুনা করেন। বর্তমানে বিশ্বাস বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল হলেও আগের মতো সেই রমরমা ভাব নেই। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরেই এঁদের অবস্থা পড়ে যায়। আগে মালদা এবং বার্ণিয়াতেও এঁদের জমিজমা ছিল।

৪। গ্রামের কৃতি সন্তান—

শিবপুরের বহু কৃতি সন্তান ছড়িয়ে আছেন দেশের নানা প্রান্তে। শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডক্টর বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এই গ্রামের গর্ব। তাঁর পুত্র সুমিত্র বিশ্বাস বর্তমানে শিশু বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়া ডাক্তার কমলেশ বিশ্বাস এবং ইঞ্জিনীয়ার সুজিত বিশ্বাসও খ্যাতি অর্জন করেছেন স্বস্ব কর্মক্ষেত্রে।

৫। সাংস্কৃতিক চিত্র—

গ্রামের ঠিক মাঝখানেই রয়েছে দুর্গাদালান। পাশেই লাইব্রেরী এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। তারইপূর্ব দিকে রয়েছে পাকা হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের এই বারোয়ারী তলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে।

গ্রামবাসীরা যেমন রাজনীতি বিষয়ে সচেতন তেমনিই সংস্কৃতি সচেতনও বটে। পূজায় বা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নাটক-গান আবৃত্তি ও কুইজের প্রতিযোগিতা হয় নিয়মিত। পুরষ্কারও দেওয়া হয়ে থাকে ছেলে মেয়েদের উৎসাহিত করতে।

(ক) বোলান গান—

তবে শিবপুরের বোলান গানের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে গোটা নদীয়ায়। বেশ কয়েকটা দল আছে এই বোলান গানের। গ্রামের বাইরেও এই সবদল গান গেয়ে থাকে। পয়সাও উপার্জন করে থাকে।

বোলান ছাড়াও সাজনা গান, গৌর বচন, যাত্রা, পাঁচালীও হয় শিবপুরে। টি. ভি. র যুগেও যে এই সব প্রাচীন দিনের যাত্রা পাঁচালী ও দেশীয় গান এই অংশে এখনো প্রচলিত আছে এর থেকেই প্রমাণিত হয় এদের জীবনীশক্তি কতো।

শিবপুরের বোলান গানে এখন ঢুকে পড়েছে স্থানীয় বা সামাজিক ঘটনাও। বর্তমানে রচিত একটা বোলান গানের উদাহরণ হলো—

(ক) বোলান—

নীল রতনের পুত্র স্বরাজ
ডুবলো কনক-দীঘিতে।
বাঁচবেনা প্রাণ কনক ছাড়া
মরলো স্বরাজ পিরিতে।

(খ) সাজনা—

শিবপুরের অন্য আরেকটা লোকগীতি হলো সাজনা গান। গাজনের সন্ন্যাসীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে যে গান গায় তাকেই বলা হয় সাজনা গান। একটি উদাহরণ হলো—

বল্ সাজনে আম পাকলে লালে লাল
জাম কেন কালরে ?
শিবের মাথায় বিশাল জটা
জল এলো কেমনে ?

(গ) গৌর বচন—

শিবপুরের অন্য একটা বিশেষ লোকগীতি হলো গৌর বচন। সাধারণত বিয়ের বাসরে নাপিত বা পুরোহিত আশীর্বাদ ধর্মী এই গানটি গেয়ে থাকে। গৌর বচনকে এক অর্থে আনুষ্ঠানিক গীতি বা লোকাচার গীতিও বলা যেতে পারে। গৌর বচনের একটি উদাহরণ হলো—

"কতো উর্ধে মাত্রা বসু,
তস্য দাতা মৃগ পশু।

হরি হরি, গৌরী নারায়ণ হরি।
দেববন্দন—দেবের গুরু,
সভা বন্দন—সভার গুরু।
যা কিছু বললাম সবি সরস্বতীর বরে।
ডাইনে হর বামে গৌরী,
বলুন সবে হরি—হরি।"

(ঘ) ঝাপান গান—

শিবপুরে শ্রাবণ মাসে এখনো মনসা পূজা হয় এবং ঐ উপলক্ষ্যে ঝাপান গানের অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতাও চলে।

শিবপুরে এখনো এমন বহু লোকগীতি ও স্ত্রী আচারাদি প্রচলিত আছে যা বাংলার অন্য প্রান্তে বিলুপ্ত হয়েছে বহু আগে এবং এই শিবপুরেও লুপ্ত হওয়ার মুখে।

৬। স্বাধীনতা সংগ্রামে শিবপুর—

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে নদীয়া জেলার যেসব গ্রাম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল শিবপুর ছিল তাদের অন্যতম। এখানে হয়েছিল নীলবিদ্রোহ ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন।

শিবপুরের গৌরব প্রয়াত গোপীপদ বিশ্বাস যোগ দিয়েছিলেন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে। ইংরেজ সরকার গোপী বাবুকে বন্দী করতে না পেরে বাজেয়াপ্ত করেছিল তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি।

বেতাই এর আর্চিবল্ডহিল্‌সের কুঠী বাড়ী যাঁরা আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এই শিবপুরের প্রয়াত হেলাবিশ্বাস ও খেলারাম সর্দারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ধ্বনি তুলেছিলেন—

"নীল ছেড়েছি ছাড়বো
না হয় সবাই মরবো।

জালিয়ানওয়ালা বাগের স্মরণে চাঁদের ঘাটে যে স্মরণ সভা হয় ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় তাতে শিবপুরের অনুকূল মজুমদার, মুকুল বিশ্বাস, কিশোরী মোহন বিশ্বাস, দ্বিজপদ, যতীন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে বীর রমণী রোহিত বালা বিশ্বাসও অংশ নেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-উৎসব ও লোকগানে শিবপুরের যেমন খ্যাতি রয়েছে তেমনিই খ্যাতি তার স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়েও।

৭। সাত পোতার মাঠ—

শিবপুরের হাইস্কুলের উত্তরের মাঠকে বলা হয় সাতপোতার মাঠ। ঐ মাঠে বুদ্ধ পূর্ণিমায় গাছের গোড়ায় ঘটপেতে পূজো হয় বুদ্ধ পূর্ণিমায়। একখণ্ড পাথরও আছে। বৈদ্যনাথের পূজো হয়ে থাকে। মেলাও বসে। এখানে লাঙলের ফলায় উঠে আসে ভাঙা প্রাচীন ইট এবং মৃৎ পাত্রাদির অংশ এখনো। প্রাচীন সভ্যতারই নিদর্শন ওগুলো। কেউ কেউ বলেন বৈদ্যনাথ আসলে ধর্মরাজেরই বিবর্তিত রূপ। এককালে এই এলাকায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল বলে মনে করেন অনেকে।

চাঁদের ঘাটে

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার নাকাশী পাড়া থানার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই চাঁদের ঘাট। জলঙ্গীর স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠা এই গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ হাজার। গ্রামটি নানা পাড়ায় বিভক্ত। গ্রামে রয়েছে পঞ্চায়েত অফিস। পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি হাইস্কুল। নদীয়া জেলায় এত বড় গ্রাম বোধ হয় আর নেই। গ্রামে রয়েছে লাইব্রেরী ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। রাস্তাঘাটও বেশ ভালই। তিনদিক ঘিরে রয়েছে জলঙ্গী। নদীর পূর্বপাড়ে বাস রয়েছে। আবার গ্রামের ভিতরেও রয়েছে বাসস্ট্যাণ্ড বার্ণিয়া-পলাশী ও জেলার অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য। মূলত কৃষি নির্ভর গ্রাম হলেও ব্যবসা এবং চাকরীও করেন বহু ব্যক্তি।

২। পূজা-ব্রত-পার্বণাদি—

এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় শুধু দুর্গা পূজাই হয়ে থাকে এগারোটা। এছাড়া গাজন, দোল, জন্মাষ্টমী, রাধা অষ্টমী, কালী পূজা, সরস্বতী পূজাও হয়ে থাকে বেশ আড়ম্বর সহকারেই। গ্রামের মেয়েরা আজো ইতুপূজো ও শিবরাত্রির ব্রতাদি বেশ ভক্তি ভরেই পালন করে থাকে। ব্যাঙের বিয়েও দেয় মেয়েরা বৃষ্টির কামনায়।

৩। সংস্কৃতি চর্চা—

চাঁদের ঘাটের বোলান গান, মনসার ভাসান, সাজনা গান, গৌরবচন এবং অন্যান্য লোকগীতি ও সুধী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

৪। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ নিয়ে নানাকাহিনী প্রচলিত আছে। একটি কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে প্রায় পাঁচশো বছর আগে শ্রী চৈতন্যদেব শ্রীহট্ট যাবার পথে অগ্রদ্বীপ থেকে পদব্রজে এসেছিলেন এখানে। চৈতন্য পাড়ায় চৈতন্যদেবের আগমনের স্মৃতি আজো অম্লান। এই চৈতন্যদেব হলেন নদের চাঁদ বা গোরাচাঁদ। গোরাচাঁদ এখান থেকেই ঘাট পার হয়ে তেহট্ট হয়ে শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন। যে ঘাট দিয়ে তিনি পার হয়েছিলেন সেই ঘাটের নাম হয়েছিল 'গোরাচাঁদের ঘাট' বা চাঁদের ঘাট। পরে এই গ্রামেরই নাম হয়ে যায় চাঁদের ঘাট।

আবার কেউ কেউ বলেন এখানে আগে হাট বসতো নিয়মিত। জমজমাট ছিল নদী তীরের সেই হাট। যেন চাঁদের শোভা বসে যেতো সেই হাটে। সেই থেকেই এই জনপদের নাম হয়ে যায় চাঁদের হাট। পরে বিবর্তিত হয়ে ঐ হাটই হয়ে যায় চাঁদের ঘাট।

আবার অনেকে বলেন গ্রামের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি দেখে মনে হতো এখানে নিত্যই চাঁদের শোভা বিরাজ করছে। তাইই নাম হয়েছে চাঁদের ঘাট।

শ্রী চৈতন্যদেব এখানে এসেছিলেন এই কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য। প্রাচীন অশথ গাছের নীচে তিনি নাম সংকীর্তন করেছিলেন এবং মহোৎসবও করেছিলেন বলে শোনা যায়। এখানে রয়েছে মহাপ্রভুর মন্দির এবং বিগ্রহ। নিত্য ভোগ পূজাদি হয়। দোল উৎসব হয় খুব ধুমধাম করেই। সপার্ষদ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এই গ্রামে যে সেদিন চাঁদের হাট

বসেছিল এ আর বিচিত্র কি ? আর সেই সূত্রেই এ গ্রামের নাম হয়েছিল হয়তো চাঁদের হাট এবং পরে বিবর্তিত হয়ে এই চাঁদের হাটই হয়ে গেছে 'চাঁদের ঘাট'।

আবার কেউ কেউ বলেন এই গ্রামে 'চাঁদ' বলে এক ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি নদীর ঘাটে এক হাট বসিয়েছিলেন। তাঁর নামেই ঐ হাটের নাম হয় চাঁদের হাট। ঐ চাঁদের হাটই লোক মুখে বিবর্তিত হয়ে হয়ে গেছে চাঁদের ঘাট।

পুরনো দলিল ও কাগজপত্রে এই স্থানের নাম চাঁদের হাট বলেই বিবৃত হয়েছে। তবে কবে কখন কিভাবে যে ঐ হাট ঘাটে রূপান্তরিত হয়েছে তা অবশ্য বলা যায় না।

৫। প্রাক্ ইতিহাস—

তবে নামকরণ যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন এই গ্রাম যে অতি প্রাচীন গ্রাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চৈতন্যদেব পাঁচশো বছর আগে যখন এসেছিলেন এই গ্রামে তখনই এই গ্রাম বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তবে তিনি যে অশথ গাছের নীচে বসে কীর্তন ও মহোৎসব করেছিলেন সেই গাছটি কিছুদিন আগে বাজ পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

চাঁদের ঘাটের মহাপ্রভুর মন্দির, হরিদাসের মন্দির, রাধা মাধবের মন্দির ও অন্যান্য দেবালয়ে নিত্য পূজা পাঠ হয়ে থাকে। গ্রামে উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই আছে। ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেও অংশ নেয় গ্রামের আবাল বৃদ্ধ নরনারী।

৬। লোক সংস্কৃতি—

(ক) লোকগীতি—

নদীয়া জেলার লোকগীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো এই জেলার 'বোলান গান।' জলঙ্গীর দুই তীরেই এমনকি চূর্ণী ভাগীরথীর দুই তীরেও এগানের সমান জনপ্রিয়তা। চৈত্রমাসে ঢাকে বাড়ি পড়তেই নদীয়ার মানুষ আবেগে অধীর হয়ে ওঠে। গাজন এগিয়ে আসে। দিকে দিকে জাগে উল্লাস। গাজনের সন্ন্যাসীদের 'হর হর ব্যোম—দেবের দেব—মহাদেব।' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস হয়ে ওঠে মুখরিত। বাড়ী বাড়ী ঘোরে তারা কাঠের শিবলিঙ্গ মাথায় করে। দুধ-মিষ্টি ফল দেয় গৃহস্থরা। সন্ন্যাসীরা বাড়ী বাড়ী ঘোরার সময়ে যে গান গায় তাকে বলা হয় সাজনা গান।

১। সাজনা গান—

সাজনা শব্দটা সম্ভবত এসেছে সাধনা থেকে। সাধনা—সাধন—সাধা—সাজা—সাজ—সাজনা। সন্ন্যাসীরা গান ধরে—

(ক) 'ও সাজনে, প্রথমে বন্দনা করি
অনাদি চরণ।
ওগো, দ্বিতীয় বন্দিলাম আমি
পরম কারণ।
ওগো, তৃতীয় বন্দিলাম আমি
বিষ্ণু যাঁদের পতি
সেই লক্ষ্মী-সরস্বতী।
ওগো, চতুর্থ বন্দিলাম আমি
শিব সেই গণেশ সহিতে
অর্ধঅঙ্গে হর গৌরী গঙ্গা যাঁর মাথাতে।
পূর্বের নন্দন ভানু পশ্চিমেতে গেল
গয়া-কাশী কৈলাসেতে হরধ্বনি তোল।

উড়িষ্যাতে বন্দি প্রভু ঐ সে জগন্নাথে।
মায়ের দুই স্তন বন্দি—আর্দ্রের ভাণ্ডার।
একস্তনের দুগ্ধ মায়ের লক্ষ মুদ্রা মূল্য
আমি পুত্র বেচিলে না হয় সমতুল্য।
পিতামাতার চরণ বন্দি আমি বারং বার
যাহাদের ঔরসে জন্ম—মানব আকার।

কাঠের শিবলিঙ্গ মাথায় করে যখন সন্ন্যাসীরা বাড়ী বাড়ী যায় তখন গৃহবধূরা জল ঢেলে দেয় মাটিতে ঐ স্থান পবিত্র করার জন্য। ফল মিস্টিও দেয় গৃহবধূরা। তার পর ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যায় দ্বিতীয় বাড়ীর দিকে। সেখানে চলে গান। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যে সাজনা গান হয় এখানে তাব একটা উদাহরণ দেওয়া হলো—

২। (প্রশ্নধর্মী গান) (খ) "ও সাজনে, পৃথিবীর ফুলে যখন
লেগেছিল জ্বরা
তখন কোন্ ফুল তুলে
করলে শিবের পূজা ?

উত্তর— যখন ফুলে লেগেছিল জ্বরা গো সাজনে,—
তখন মন ফুলে কবলাম শিবের পূজা।

প্রশ্ন— তোমরা হলে শিব ভক্ত—শিবের চেলা।
মস্তক ফুঁড়ে কোন্ রমণীর হয়েছে সন্তান
ও সাজনে, বলো, বলো, বলো এই বেলা।

উত্তর— কলাবতী কন্যা ছিল গণেশ রমণী—
মস্তক ফুঁড়ে সন্তান তার হয়েছিল
শোন বলি—পুরাণ-কাহিনী।

প্রশ্ন— 'যখন ধরণীতে ছিল জল
তিল প্রমাণ মেঝে
তখন কোথায় রাখলে ফুলের সাজি
কোথায় করলে পূজা ?

উত্তর— তখন মাথায় রাখলাম ফুলের সাজি
শোনগো সাজনে, মনে করলাম পূজা।

(গ) পাঁচালী ধর্মী গান—

বন্দনা বা প্রশ্নোত্তরের ঢঙেই শুধু নয় পাঁচালীর ঢঙেও চলে এই সাজনা গান। এক্ষেত্রে কোন বাস্তব ঘটনার উপরে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এই গান। সমবেত স্বরে গাওয়া হয় সুর করে এই পাঁচালী ধর্মী গান। অঙ্গ ভঙ্গীও করা হয়। নৃত্যের ছন্দে জমে ওঠে গান। একটা উদাহরণ— "ও সাজনে দুই জনাতে দেখতে গেলাম
অগ্রদ্বীপের মেলা।
ভীড়ের মাঝে দুই দিকেতে
দিলরে ভাই ঠেলা।
সেই ঠেলাতে পড়লাম গিয়ে
পাশেই ছিল নালা।

ঘন্টাতিনেক সেই নালাতে
থাকলাম যে বেঘোরে।
বলবোকি আর হুঁস্ এলো ভাই তিন ঘন্টার পরে।
মনে ভাবি গিন্নিটা মোর গেলযে কুথায় ?
সাত সকালে মনের ঘোরে আখড়াতে বেড়াই।
ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি এক বাবাজীর পায়
মরি মরি সাত জনেতে তেল যে মাখায়।
লক্ষ্মী লক্ষ্মী ডাক ছাড়ি আর এদিক ওদিক চাই,
তবু সেতো কয়না কথা মেলাতে হারায়।

মনের দুখে ঘরের মুখে ফিরছি একা ভাই।
হঠাৎ দেখি পথের মাঝে এক রমণী কাঁদিয়া ভাসায়।
—'কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? বলো দেখি তুমি ?
—সাঁঝ বেলাতে হারালো হায় আমার গুণের স্বামী।
—ভালই হলো চলো তবে ভেক নেব দুইজনা।
গোপী নাথকে সাক্ষী রেখে করবো যে সাধনা।

ও ভাই, গুপ্তকথা বলছি আমি মন দিয়ে সব শোন।
বৌহারানো মেলা যে এই মিথ্যা তো নয় কোন।

গান বাঁধলো সুবল ওস্তাদ—চাঁদের ঘাটে বাড়ী।
তার চরণে শির রেখে এই গান যে প্রচার করি।

চাঁদের ঘাট অঞ্চলে সাজনা গানের তিনটে পর্ব লক্ষ্য করা যায় (১) বন্দনা (২) প্রশ্নোত্তর বা কবিয়াল পর্ব (৩) রংপাঁচালী পর্ব।

এমন অসংখ্য গান রচিত হয়েছে এই অঞ্চলে। বেশ কয়েক জন নাম করা গীতিকারও আছেন এই অঞ্চলে। সুবল বাবু তাঁদের একজন। নতুন নতুন তথ্যাভিত্তিক গান বেশ রসালো করে গাওয়া হয় চৈত্র মাসে এবং গ্রামীন নরনারী দারুণভাবে উপভোগ করে এইসব লোকগীতি।

২। বোলান গান—

তবে 'সাজনা' নয় মূলত বোলান গানের জন্যই চাঁদের ঘাটের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়। এই বোলান গানের তিনটি পর্ব থাকে। (১) বন্দনা (২) যাত্রা (৩) রং পাঁচালী। বন্দনা অংশে মূলত দেব দেবীর বন্দনা করা হয়। দ্বিতীয় অংশে থাকে 'যাত্রা পালা'। কাহিনী ভিত্তিক পালা গান রচিত হয় এবং অভিনীত হয়। তৃতীয় পর্বে হাল্কা রসের পাঁচালী গান গীত হয়।

(ক) বন্দনা—(১) **'আমি প্রথমে বন্দনা করি দেবের চরণ।**
সিদ্ধি দাতা গণেশ ওগো হরের নন্দন।
না জানি সাধনা আমি তবু মনেতে বাসনা
এসো প্রভু মুষিক বাহনে মম হৃদয় আসনে।

২। ওগো, ওমা, বীণাপাণি, বীণা ধরে
এসো মাগো কণ্ঠভরে।
আমি কাতরে ডাকি তোমা
দয়া করো মোরে।
ঝংকার তুলে দাও বীণার তারে।

৩। প্রণাম জানাই আমি কৃষ্ণের চরণে
আঁধার হলো বৃন্দাবন যাঁহার বিহনে।
কৃপা কর কৃপাময় অধম সন্তানে
চাঁদের ঘাটে বাড়ী যার এই নীল রতনে।

(খ) যাত্রা পালা—

বোলানের দ্বিতীয় পর্ব হলো এই যাত্রাপালা। এই যাত্রাপালা রচিত হয় ঐতিহাসকি এবং সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে থাকে গ্রামের সাধারণ মানুষরাই। এই সব যাত্রার মাধ্যমে একদিকে যেমন আনন্দ দানের চেষ্টা হয় তেমনিই সামাজিক অত্যাচার ও অন্যায়কে তুলে ধরে জনশিক্ষা ও জন জাগরণের চেষ্টাও করা হয়ে থাকে। কখনো কখনো বিখ্যাত কোন নাটকও মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।

(গ) রং পাঁচালী—

বোলানের তৃতীয় পর্ব হলো রং পাঁচালী। সাধারণত গ্রামের কোন মজাদার ঘটনা বা কাহিনী অথবা জেলার বা দেশের কোন রসালো কাহিনী নিয়েই গান বাঁধা হয়। আসরে বসে হাত নেড়ে বা অঙ্গভঙ্গী করে অথবা নেচে নেচে সুর করে গাওয়া হয় এই রং পাঁচালী।

চাঁদের ঘাটের একটি জনপ্রিয় রংপাঁচালী হলো—'গৃহশিক্ষক পালা'। এই পালা গানে এক ছাত্রী ও তার গৃহশিক্ষকের কাহিনী কেমন রসালো ভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে তার একটু উদাহরণ দেওয়া যাক্—

ছাত্রী— হায়, হায়, মাষ্টার আজ,
কেন পড়াতে এলোনা ?
শুধু 'পড়ো, পড়ো' বলে মাষ্টার
পড়াতে মন লাগেনা।
শোন গো ও মাষ্টার মশাই,
শোন বলি মনের বাসনা—
তোমায় আমি করবো বিয়ে
নইলে তো ছাড়বোনা।

মাষ্টার— শোন বলি ও করুণা
বৃথাই বসে থেকো না।
সামনেতে পরীক্ষা তোমার
না পড়লে পাশ হবে না।
কষো কষো অঙ্ক কষো
বৃথাই বসে থেকো না।

ছাত্রী— পড়াতে আর মন বসে না
করেন মাষ্টার ক্ষমা।

তোমার সাথে নাহলে বিয়ে
বিষ খাবো ঠিক যম দূয়ারে জানা।
মাষ্টার— ছিঃ ছিঃ ছিঃ ও করুণা
এসব কথা বলো না।
মন্দ বলবে লোক সমাজে
তাও কি জানো না ?

'রং পাচালী'তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পণপ্রথা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার প্রতিকারের নানাদিক নিয়েও গান বাঁধা হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

(২) (ক) —'শোনেন শোনেন গ্রাম বাসীরা
শোনেন দিয়া মন।
এই আসরে কইবো আমি
দেশের বিবরণ।
তেলের দাম বাড়ছে দ্যাখো
কয়লা ডিজেল আরো।
জীবন হলো ঝালা পালা
এবার সবাই মরো।
মেয়ের বিয়ে সৎপাত্রে
কেমনে যায় দেয়া ?
বাপ মা বসে ভাবেন ঘরে
কে দেয় গাঙে খেয়া ?

(খ) জনসংখ্যা যায় যে বেড়ে
দেশনে তারা ভাবে।
ছোট সংসার সুখের অতি
নইলে যে দেশ যাবে।
বিজ্ঞাপন তাইতো দেখি পেপারে পেপারে
যাও লুবিনের হাসপাতালে
অপারেশান তরে।
মিলবে সেথায় আরও জিনিষ
নাওগো পকেট ভরে।
বাঁচবে নিজে বাঁচবে যে দেশ
লোক কমারই হারে।

চাঁদের ঘাটে গিয়ে দ্যাখো নব নব রঙ্গ
এই গান বাঁধলো ঐ কার্তিক চন্দ্র।

(৩) গৌর বচন—

চাঁদের ঘাটেও গৌর বচনের প্রচলন আছে। এই 'গৌর বচন' শব্দটি এসেছে মূলত 'গৌ' শব্দ থেকে। এককালে শুভ বিবাহের প্রাক্কালে গরুদান করা হতো। আবার বৈদিক যুগে বলিও দেওয়া হতো গোশাবক যজ্ঞ স্থানে বা বিবাহের আসরে। পুরোহিত বা নরসুন্দর

ঐ সময়ে গোরুর স্তুতি করতেন এবং তার পরেই উৎসর্গ করা হতো। পরে গোহত্যা নিষিদ্ধ হলেও গোদান প্রথা থেকে যায়। গৌর বচন ঐ 'গো' শব্দ থেকেই চলে এসেছে আজ পর্য্যন্ত। বিবাহ আসরে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করা হয়ে থাকে এই অঞ্চলে ঐ গৌর বচনের মাধ্যমেই।

চাঁদের ঘাট অঞ্চলে প্রচলিত একটি গৌর বচন হলো—

(ক) শিব শিব মহাশিব হর গৌরীর জয়।
মহাদেবেব বরে পুণ্য হবে সুনিশ্চয়।
বামেতে বসেন গৌরী ডাইনেতে হর।
নবীন জীবনে সুধা হোক সুখকর।

৪। ঝাপান বা মনসাগান—

শ্রাবন মাসের শেষে এখানে মনসার গান হয়। ঝাপানও হয়। ওঝা বা গুণীনবা জমায়েত হন। মন্ত্রের প্রতিযোগিতাও হয। মনসাগানের একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে এখানে—

(ক) সর্বাগ্রে বন্দিলাম আমি দেব নিরঞ্জন।
তারপরে বন্দি আমি মনসাচরণ।
বন্দ বন্দ বন্দ শিব দুর্গা অবধান।
বিষ হরি মাতা বন্দি নাগের প্রধান।
দীক্ষা শিক্ষা গুরু বন্দন—পিতার চরণ।
যার হতে দেখিলাম সকল ভুবন।
ডাকিনী-যোগিনী বন্ধন করি এইখানে।
পিশাচ-পিশাচী বন্ধন করি এইগানে
মন্ত্রগুণে বাঁধি যতো শত্রু শত শত
প্রণাম রাখি দেবের পায়ে—হায় দেবতা যতো।

৫। চাঁদের হাটের মন্দির ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—

চাঁদের ঘাটের পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেমন এ গ্রামের গৌরব বাড়িয়েছে তেমনিই গৌরব বাড়িয়েছে এই গ্রামের মন্দিরগুলিও।

(১) (ক) মহাপ্রভুর মন্দির—

চাঁদের ঘাটের মহাপ্রভুর এই মন্দিরটি আগে ছিল চালা ঘর। কিন্তু গ্রামবাসীদেব সহযোগিতার এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে এখানে ইট নির্মিত বড় মন্দির হয়েছে। মন্দিরের বেদীতে রয়েছে দারু নির্মিত রাধামাধব এবং মহাপ্রভুর মূর্তি। রাধামাধবের ঐ মূর্তি সম্বন্ধে যে লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে তাহলো এই যে বহুকাল পূর্বে রাধামাধব ছিলেন কাটোয়ায়। কিন্তু কাটোয়া থেকে তিনি নদী পথে গঙ্গা থেকে জলঙ্গীর বুকে ভেসে চলে আসেন এই চাঁদের ঘাটে। এই ঘটনায় চারিদিকে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং রাধামাধবকে সাদরে নদীবক্ষ থেকে তুলে এনে স্থাপন করা হয় চালাঘরের বেদীতে।

শোনা যায় রাধামাধব নাকি এই গ্রামের এক ভক্ত বৈষ্ণবকে স্বপ্নাদেশ দেন যে 'ওরে আমি যে তোদের ঘাটে এসে শুয়ে আছি জলের নীচে। আমাকে তোরা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর। তোদের মঙ্গল হবে।' তার পরেই ঐ বিগ্রহ তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় নতুন চালাঘরের মন্দিরে।

এই কাহিনী কতদূর সত্য তা আজ নির্ণয় করা কঠিন। কতো বছর পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল তাও বলা শক্ত। তবে এটুকু বলা যায়যে গঙ্গা বেয়ে ঐ বিগ্রহ জলঙ্গীর বুকে ভেসে

যদি সত্যি এসে থাকে তবে স্বরূপ গঞ্জের গঙ্গা জলঙ্গীর মিলনস্থান দিয়েই জলঙ্গীতে ঢুকে উজান বেয়ে চাঁদের ঘাটে এসেছিল নিশ্চয়। বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। কিন্তু দৈব ঘটনার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা কি পাওয়া যায় সব সময় ?

অবশ্য রাধা মাধবের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যও এমন কাহিনী সুকৌশলে প্রচার করা হয়ে থাকতে পারে অথবা কাটোয়া থেকে ঐ বিগ্রহ অন্যভাবেও এখানে আনা হয়ে থাকতে পারে। সঠিক ঘটনা যে কি তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন আজ।

তবে এই রাধা মাধবকে খুবই জাগ্রত দেবতা বলে সকলে মানে। বর্তমান গোস্বামী হলেন দেবানন্দ দাস গোস্বামী। তিনি অন্ধহলেও পরম ভক্ত এবং সাধক মানুষ। গভীর তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান। পরম সাত্ত্বিক মানুষ তিনি। দেবানন্দের শিষ্য হলেন নারায়ণ বৈরাগ্য এবং নরোত্তম বৈরাগ্য।

মহাপ্রভুর মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ড আছে। ঐ বোর্ডের সম্পাদক হলেন—শ্রীযুক্ত পাঁচু গোপাল চক্রবর্তী মহাশয়।

রাধা মাধবের নিত্য পূজা ভোগ ও আরতি হয়। বহু ভক্তজন আসেন নিত্যই এই মন্দিরে। এই মন্দিরের সব চেয়ে বড় উৎসব হলো দোল উৎসব। চারদিন ধরে চলে ঐ উৎসব।

(১) প্রথম দিন—অধিবাস।
(২) দ্বিতীয় দিন—অখণ্ড নাম সংকীর্তন।
(৩) তৃতীয় দিন—লীলা কীর্তন।
(৪) চতুর্থ দিন—মহোৎসব ভোজন ও আরতি।

এছাড়াও এখানে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ঝুলন ও রাস পূর্ণিমাতেও নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। দিকে দিকে প্রচারিত হয় ভগবত মহিমা এই রাধামাধব ও মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে।

(খ) শ্রী চৈতন্য মন্দির—

মহাপ্রভু শ্রীহট্টে যাবার পথে যে অশথ গাছের নীচে নাম সংকীর্তন করেছিলেন সেখানেই বর্তমানে নির্মিত হয়েছে শ্রীচৈতন্য মন্দির। সেই গাছটা বর্তমানে নেই কিন্তু সেখানে ইটের মন্দির তৈরী হয়েছে। মন্দিরে রয়েছে গৌর এবং নিতাই এর বিগ্রহ। নিত্য পূজা-পাঠ হয়। পূজা কমিটি এবং ট্রাস্টি বোর্ড আছে। দোল, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ঝুলন ও রাস পূর্ণিমায় বিশেষ উৎসব হয়ে থাকে। সারাদিন ব্যাপী চলে নাম সংকীর্তন। মন্দিরটি বর্তমানে চৈতন্য পাড়াতেই অবস্থিত।

(গ) হরিদাস মন্দির—

চাঁদের ঘাটের বিখ্যাত সাধক এবং ধার্মিক পুরুষ হরিদাসের সমাধির ওপরই নির্মিত হয়েছে হরিদাস মন্দির।

এই হরিদাসকে নিয়েও প্রচলিত আছে নানা লোকশ্রুতির কাহিনী। শোনা যায় প্রথম জীবনে হরিদাস ছিলেন এক গৃহস্থের বাড়ীর রাখাল। গরু চরাতেন মাঠে। একদিন হরিদাসের মনিব তাদের গরুগুলোকে নদী থেকে জলপান করিয়ে আনতে বলেন। কিন্তু নদী দূরে থাকায় হরিদাস লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে জল। গরুর পাল তৃপ্ত হয় জল পান করে। বিস্মিত হলেন মনিব হরিদাসের এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখে। তারপর থেকেই মনিব সমীহ করতে লাগলেন হরিদাসকে। আর রাখালি থেকে অব্যাহতি দিলেন হরিদাসকে।

ধীরে ধীরে হরিদাসের বিচিত্র কর্মকাণ্ড এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথাও ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। মনিবের দেওয়া খাবারও জমিয়ে রাখতেন তিনি এবং তার ফলেই নাকি তাঁর মনিবের অবস্থারও উন্নতি হতে থাকে ধীরে ধীরে।

এরপরে একদিন মনিবের বাড়ী ছেড়ে হরিদাস কিছু দূরে গিয়ে কুটীর বেঁধে বাস করতে লাগলেন। ঐ কুটীর প্রাঙ্গনে উৎসব করতে লাগলেন। নাম সংকীর্তন চালাতে লাগলেন। মহোৎসবও চালাতে লাগলেন। ভক্ত বৃন্দ ভীড় করতে লাগলো তাঁর পাশে। উৎসব অনুষ্ঠান চলার সময় বৃষ্টি আসলে হরিদাস চারপাশে গণ্ডী কেটে দিতেন সেইখানে আর বর্ষণই হতো না যদিও বাইরে এবং চারপাশে মুষলধারে বৃষ্টি হতো।

দেহত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে হরিদাস বলে যান, 'বৃষ্টি নাহলে তাঁর নামে ধ্বনি দিলেই বৃষ্টি নামবে।' এখনো নাকি তাঁর ঐ শেষ বাণী সত্য হয়ে আছে। নামে ধ্বনি দিলেই বৃষ্টি নামে।

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে তাঁর মনিবের এবং চাঁদের ঘাটের সমৃদ্ধির পিছনে কাজ করে চলেছে তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্যই।

৬। জমিদার বাড়ী—

চাঁদের ঘাটের জমিদার বাড়ীটি আজো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রামে ঢুকলেই। যদিও সাবেক কালের তিন মহলা বাড়ীটি আজ বিবর্ণ মলিন তবু এককালে বাড়ীটির জাঁক ছিল খুবই। ছাদের ওপর থেকে গ্রামটির দৃশ্য অতি মনোরম দেখায় সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের কালে। এই জমিদার বাড়ীর আদি পুরুষ হলেন মাণিক চন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর দুই পুত্র রামচন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ। এঁদের বংশধরগণ বর্তমানে নানাস্থানে ছড়িয়ে আছেন। কয়েক জন অবশ্য এই বাড়ীতেই থাকেন। বেশ কয়েক শরিকে বিভক্ত আজ এই চক্রবর্তী বাড়ী। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সময়ই এঁদের অবস্থা পড়ে যায়। বর্তমানে শালগ্রাম শিলা এবং নারায়ণ পূজা নিত্য হলেও অবস্থা ভাল নয় প্রায় কোন শরিকেরই।

গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে তেমন ভূমিকা না নিলেও চিকিৎসার ব্যাপারে কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এঁরা। বহু গল্প, বহু কাহিনী ছড়িয়ে আছে এই জমিদার বাড়ীকে ঘিরে।

৭। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়—

গ্রামে লাইব্রেরী, পোষ্টাফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, পঞ্চায়েত অফিস আছে। পাড়ায় পাড়ায় আছে বারোয়ারী তলা। বিসর্জনের সময় বাইচও হতো জলঙ্গীতে আগে। তবে এখনো চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পূজার সময়ে। আবৃত্তি, নৃত্য, গান এবং ক্যুইজও হয়ে থাকে।

নানা ধরণের মেয়েলি ব্রতাদিও পালিত হয়ে থাকে গ্রামে। ইতু পূজো, ব্যাঙের বিয়ে, ষষ্ঠী পূজা ও পৌষ পার্বণ বেশ উৎসাহ সহকারেই পালিত হয় এই বিশাল গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়। তাছাড়া নবান্নের উৎসব এবং বনভোজনেও সাড়া পড়ে যায় গ্রামে। মেতে ওঠে আবাল বৃদ্ধ জনতা।

পার্শ্ববর্তী শিবপুরের মতোনই মাহিষ্য প্রধান গ্রাম এই চাঁদের ঘাট তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নরনারীও মিলে মিশে সুখে শান্তিতেই আছে সবাই।

৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে চাঁদের ঘাট—

চাঁদের ঘাটে জন্মেছেন বহু ত্যাগী এবং দেশপ্রেমী সন্তান। নীলচাষের বিরুদ্ধে সারা বাংলায় যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ে মেতে উঠেছিল এই চাঁদের ঘাটের বিপ্লবী কৃষকরাও।

বেতাই গ্রামের নীলকুঠী যাঁরা আক্রমণ করে ধ্বংস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চাঁদের ঘাটের কৃষকরাও ছিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল চাঁদের ঘাটে জালিয়ানওয়ালা বাগের স্মরণে যে বিশাল স্মরণ সভা হয় ঐ সভাতেই শপথ নেওয়া হয় ট্যাক্স বন্ধ করার। শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। ঐ সময়ে জাতীয় পতাকা তুলে স্বাধীনতাও ঘোষণা করা হয়। ৫২ ঘন্টা স্বাধীন ছিল চাঁদের ঘাট। গ্রামে গঠিত হয়েছিল 'সত্যব্রতী দল'। যোগাযোগ বিছিন্ন করে দিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

চাঁদের ঘাটের বহু কৃতি সন্তান ছড়িয়ে আছে জেলা ও রাজ্যের নানা অংশে। এই গ্রামেরই ছেলে গৌতম মণ্ডল মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছিল।

প্রখ্যাত হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাক্তার অবনী মণ্ডল, ও শ্রীদাম অধিকারীর মতো ডাক্তারও জন্মেছেন এই গ্রামেই। আবৃত্তি, নৃত্যে, গানে, শিক্ষকতায় ও নাটকে এবং খেলাধূলাতেও এ গ্রামের অধিবাসীরা সারা জেলাতে সাড়া ফেলেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চাঁদের ঘাটের উজ্জ্বল ভূমিকা নদীয়ার অন্যান্য গ্রামের কাছে প্রেরণা স্বরূপ হয়ে আছে আজো।

সাহেবনগর

১। পরিচিতি—

সাহেবনগর গ্রামটিও অতি প্রাচীন। পলাশীপাড়া থেকে পলাশীর দিকে যাওয়ার পথেই পড়ে এই সাহেবনগর গ্রামটি। উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই দীর্ঘ গ্রামটিতে প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। একাধিক পাড়ায় বিভক্ত এই গ্রামটি। নানারকম সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ চলে প্রায় সারা বছর ধরেই। গ্রামে রয়েছে চারটি প্রাথমিক স্কুল এবং একটি মাধ্যমিক স্কুল। বহু শিক্ষিত লোকেব বাস এই গ্রামে।

২। নামকরণ—

সাহেবনগরের নামকরণ সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহলো আগে এই অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের প্রভাব ছিল। ঘোড়ায় চড়ে তারা ঘুরে বেড়াতেন এই সব অঞ্চলে। ঐসব সাহেবদের স্মৃতি জড়িত হয়েই এই গ্রামের নাম হয়েছে সাহেবনগর।

আবার কেউ কেউ বলেন নীলকর সাহেবরাই নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাষীদের এখানে এনে নতুন গ্রামের পত্তন করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন সাহেগনগর।

সাম্প্রতিককালে তৃতীয় যে মতটি প্রচলিত হয়েছে তাহলো নীলকর সাহেবদের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে যে সব চাষীরা পালিয়ে যায় বিভিন্ন দিকে তারাই একে একে জঙ্গলাকীর্ণ এই অংশে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে জঙ্গল কেটে গ্রাম পত্তন করে ও গ্রামের নাম রাখে সাহেবনগর।

শেযোক্ত মতের বিরুদ্ধে বলা যায় যে নির্যাতিত বা বিদ্রোহী চাষীরা পালিয়ে এসে যদি গ্রাম পত্তন করেই থাকে তবে নিশ্চয়ই তারা সাহেব স্মৃতি জড়াতোনা ঐ গ্রামের নামে।

বর্তমান তেহট্ট মহকুমার এই অংশে বেশ কয়েকটা নীলকুঠী ছিল। বেতাই এর নীলকুঠী ছিল বেশ বড়। তাছাড়া সাহেবনগরের উত্তর দিকে বালিতেও ছিল একটা নীলকুঠী। দোর্দণ্ড প্রতাপও ছিল ঐ সব কুঠীয়াল সাহেবদের। এখানে চাষীদের এনে এই গ্রামের পত্তন তাঁরাই করেছিলেন বলেই মনে হয়। পরবর্তীকালে নীলবিদ্রোহ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে এই সাহেবনগর গ্রামের নীলচাষীরাও সেই বিদ্রোহে সামিল হয় বলেই মনে হয়। বালির নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ আছে এখনো।

প্রসঙ্গত বলা দরকার নদীয়ায় আরো তিনটে সাহেবনগর আছে সাহেবদের স্মৃতি জড়িত হয়ে।

৩। জমিদার—

যতদূর জানা যায় নাকাশীপাড়া থানার মতিলাল রায়ই সর্বপ্রথম নদীয়া রাজস্টেট থেকে এই গ্রামটির ইজারা নেন এবং জমিদার বলে খ্যাত হন। রায়বাড়ী এখনো আছে তবে আগের দিনের সেই জৌলুষ আর নেই।

৪। শিবমন্দির—

গ্রামে যে প্রাচীন শিব মন্দিরটি ছিল সেটি আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে এখনো 'শিববেড়' বলেই ঐ স্থানটির খ্যাতি।

৫। যাত্রাদল—

এই গ্রামের যাত্রাদলের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সারা জেলায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম যাত্রাদল গঠিত হয় এই গ্রামে। এখনো নিয়মিত যাত্রা হয় এই গ্রামে এবং গ্রামের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে এই গ্রামের বিভিন্ন যাত্রা পার্টি অভিনয় করে থাকে।

৬। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—

এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে তিনি গড়েতোলেন 'কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান'। হাতের কাজ, কৃষি ও পশুপালনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। প্রচুর লিচু গাছও আছে এখানে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটি।

চাষীদের ফসলের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার জন্য এখানে যে 'মার্কেটিং সোসাইটি' চালু হয়েছে তা বেশ ভাল ভাবেই চলছে।

৭। শিক্ষা ও বিদ্যালয়—

গ্রামের প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তারণ বাবুর উদ্যোগে। এই তারণ বাবুর প্রকৃত নামছিল রামতরণ বিশ্বাস। তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন এবং লোকে তাঁকে তারণ বাবু বলেই জানতো।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শিশির সেন ও অন্যান্য দেশ প্রেমী জনগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

গ্রামের বহু কৃতি সন্তান ছড়িয়ে আছেন জেলার নানা প্রান্তে। কলকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় শহরেও আছেন অনেকে। বিখ্যাত বায়ু সেনানী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় যিনি ১৯৬৫র ভারত-পাক যুদ্ধে মারা যান তিনি এই গ্রামেরই সন্তান।

৮। রমেশ গোস্বামী ও দাশু বাবু—

এই গ্রামেব বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী রমেশ গোস্বামী এবং অনুশীলন সমিতির দাশু বাবুর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৯। গ্রামের ব্রত ও বিভিন্ন উৎসব—

(ক) মাঠ পালনী ব্রত—

সাহেবনগরের বিভিন্ন ব্রত-উৎসবের মধ্যে নানা কারণেই মাঠপালনী ব্রতটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রতিবছর অগ্রহায়ন মাসের সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয় এই মাঠপালনী ব্রত। ফকির এসে বাড়ী বাড়ী ঘোষণা দিয়ে যাবার পরেই গ্রামের মেয়েরা স্নান করে জলঙ্গীর তীরবর্তী অশথ গাছের নীচে জমায়েত হয় ধামায় বাতাসা চিড়ে-মুড়ি-মুড়কি-জল-তেল-সিঁদুর-পুতুল-চাল-ধান-পয়সা ইত্যাদি নিয়ে।

গাছের নীচে বসে থাকেন বা ওড় গ্রামের ফকির। গাছের গোড়ায় সিঁদুর লাগাতে হয় মেয়েদের। দিতে হয় একটি করে পিটুলি বা ভাটাম পাতাও। ফকির বিড় বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সকলের মাথায় বুলিয়ে দেন চামর।

মেয়েরা বাড়ীতে যতগুলো মানুষ ও পশু আছে ততগুলো মাটির পুতুল ও সঙ্গে আনে। সেই মূর্তিগুলো উৎসর্গ করা হয় পূজার থানে। ফকিরকে দিতে হয় তিনমুঠো ধান ও তিনমুঠো চাল এবং এবং দশটি বা কুড়িটি পয়সা।

মূলতঃ কৃষির মঙ্গল কামনাতেই এই মাঠ-পালনী ব্রত। তবে বাড়ীর লোকজন এবং পশুর মঙ্গল কামনাও করা হয়ে থাকে এই ব্রতানুষ্ঠানে। পীরের দরগায় যেমন ছলনের

ঘোড়া উৎসর্গকরা হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠানেও তেমনি মাটির পুতুল উৎসর্গ করাটা বেশ তাৎপর্য্য পূর্ণ।

পূজা নয়, মন্ত্র নয়, বিশ্বাসই এই অনুষ্ঠানের মূলভিত্তি। বহু বছর ধরে এই গ্রামে চলে আসছে এই উৎসব। তবে চাঁদেব ঘাট, মাজদিয়া অঞ্চলেও এই ব্রতানুষ্ঠান হয়ে থাকে।

(খ) ইতু পূজা—

নদীয়ার অন্যান্য অংশের মতো এই অংশেও গ্রামের মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসে ইতু পূজা করে থাকে। ঘটপাতে। মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল দিয়ে ইতুর পূজাও করে থাকে। তবে নদীয়ার অন্যান্য গ্রামে যেমন সারা মাস ধরে মেয়েরা ইতুর পূজো করে এই গ্রামের মেয়েরা তেমনটি করে না। এই গ্রামে শুধু অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিনেই কিশোরীরা ঘটপেতে ইতুর পূজা করে থাকে।

(গ) ষষ্ঠী পূজা—

জৈষ্ঠ্য মাসে ষষ্ঠী পূজোর দিন গ্রামের মেয়েরা ধামায় করে মুড়ি মুড়কি, খৈ বাতাসা নিয়ে হাজির হয় ষষ্ঠীতলায়। সঙ্গে নিয়ে যায় তেল হলুদ, সিঁদুর এবং পাঁচ রকমের ফলও। একে অন্যাকে সধবা মেয়েরা সিদূঁর পরিয়ে দেয়। মুড়ি মুড়কি দেয় পূজো শেষ হলে। ষষ্ঠীর পূজো চলে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলে। গ্রামের ব্রাহ্মণই পূজো করে থাকেন সকলের মঙ্গলের জন্য ঐ দিন গ্রামের ষষ্ঠী তলায় শাস্ত্রাচার মেনে।

(ঘ) রক্ষাকালী ও শীতলা পূজা—

মহামারী—মড়ক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বাসনায় আগে খুবই ধুমধাম করে রক্ষাকালীর পূজো হতো তবে এখন রক্ষাকালীর পূজা আর বিশেষ হয় না। তবে বসন্তকালে শীতলাদেবীর পূজো হয়ে থাকে এই গ্রামে আজো।

(ঙ) অন্যান্য ব্রত উৎসব—

সাহেবনগরের মেয়েরা অন্যান্য ব্রতাদির মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ও বিপত্তারিণীর ব্রত পালন করে থাকে। সিংহবাহিনী দেবী চণ্ডীর মূর্তি তৈরী করেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া দুর্গা পূজা, কালী পূজা ও সরস্বতী পূজা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই হয়।

(ক) কীর্তন—

সাহেবনগরে বর্তমানে কীর্তনের রমরমা। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে যে বৈষ্ণব আশ্রম আছে সেখানে নিত্যই বসে কীর্তনের আসর। বাইরে থেকে ও দল এসে এখানে কীর্তন করে। জন্মাষ্টমী—রাধাষ্টমীরতেও এখানে উৎসব হয়। দোল উৎসব বেশ ঘটা করেই হয় এই আশ্রমে।

(খ) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা—

গ্রামে বিভিন্ন মহাপুরুষদের জন্মতিথি পালিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্র জয়ন্তী—নজরুল জয়ন্তী বেশ আড়ম্বর করেই হয়ে থাকে। ২৩শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্টও বেশ মর্য্যাদার সঙ্গেই পালিত হয়। ঐ সব উৎসব উপলক্ষ্যে আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হয়। রচনার প্রতিযোগিতাও হয়। নাটকও মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।

(গ) সাহিত্য চর্চা—

গ্রামের অনেকেই সাহিত্য চর্চা করে থাকেন। কবিতা, গল্প, ছড়া প্রবন্ধ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ 'কৃষ্টি' পত্রিকাটি চলছে আজ দু বছর ধরে। সম্পাদক হলেন সতীনাথ বৈরাগ্য।

১১। লোক সংস্কৃতি—

(ক) বোলান—

গ্রামে বোলানের দল আছে। চৈত্র মাসে বসে বোলানের আসর। যাত্রা এবং পাঁচালিগান বেশ ভালই হয় ঐ আসরে। যে দুটি বোলানের দল আছে এ গ্রামে ঐ দল দুটি বাইরেও যায় পালাগান করতে।

(খ) ঝাপান—

শ্রাবণী সংক্রান্তিতে এখনো ঝাপান হয় গ্রামে তবে বীরু ওঝার আমলে যেমন আড়ম্বর করে ঝাপান গান হতো এখন ততটা আড়ম্বর নেই। বীরু ওস্তাদ ছিলেন বিখ্যাত ওঝা। তিনি মারাগেছেন বছর কয়েক হলো। তাঁর সময়ে জেলার নানা প্রান্ত থেকে বিখ্যাত ওঝারা আসতেন। মনসার পালাগানও হতো তখন।

১২। গ্রামের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান—

সাহেবনগরের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে লাইব্রেরী, স্কুল, খেলার মাঠ ছাড়াও রয়েছে কস্তুর বা আশ্রম এবং শিল্প ও কৃষি ফার্ম। তাছাড়া রয়েছে জলঙ্গীর কিনারে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্মিত 'নিরুপমা স্মৃতি বিদ্যাপীঠ।'

নিরুপমা দেবী ছিলেন কোচবিহারের রাজপরিবারের মেয়ে। গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বদেশী আন্দোলনে। এখানে এসে প্রথমে কস্তুরবা সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে কাজে যোগ দেন পরে শিক্ষকতা শুরু করেন এখানেই। ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিরুপমা স্মৃতি বিদ্যাপীঠ।' বর্তমানে পাঁচ জনশিক্ষিকা বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত আছেন। নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত ক্লাস হয়। পড়ানোর মান বেশ উন্নত।

বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা এসেছেন এখানে। গ্রামের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতাতেই বিদ্যালয়টির উন্নতি ঘটছে। মহিলা আবাসিকরা নিরাপদেই আছেন এখানে।

বড় নলদহ

১। পরিচিতি—

সাহেবনগর ছড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই পড়বে ছোটনলদা। তার পরেই পড়বে বড় নলদা। ছোট নলদা যেমন হিন্দু প্রধান গ্রাম বড় নলদা তেমনই মুসলিম প্রধান গ্রাম। ছোটনলদায় হাইস্কুল রয়েছে সেখানেই পড়তে যায় বড় নলদার ছেলেমেয়েরা। তবে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে দুটি। লোক সংখ্যা চার হাজারের কিছু বেশী। উত্তর দক্ষিণে লম্বা গ্রামটি। বছর পনেরো আগে এই গ্রামটি একবার খবরের কাগজের শিরোনামে উঠে এসেছিল। তেলের সন্ধান মিলেছিল এখানে। দিল্লী থেকে এসেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। পুকুর খোঁড়া হয়েছিল এখানে। ঘরবাড়ীও তৈরী হয়েছিল। আনা হয়েছিল বহু যন্ত্রপাতিও। কিন্তু এত আয়োজন সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত তেল পাওয়া গিয়েছিল সামান্যই। তবে গ্রামের কিছু লোকের কাজ জুটেছিল। শেষ পর্য্যন্ত এখান থেকে তেল তোলার কাজ বন্ধ করে কোম্পানীর লোকজন চলে গেলে যন্ত্রপাতি ঘরবাড়ী যা পড়েছিল তা উধাও হয়ে যায় অচিরেই সুযোগ সন্ধানীদের তৎপরতায়। তবে কোম্পানী গ্রামের চারটে ছেলেকে চাকরী দিয়েছিল দিল্লী না বোম্বাই কোথায় যেন। তাদের এখন রীতিমতো অবস্থা ফিরে গেছে। গ্রামে ঢোকার মুখেই পড়বে তাদেরই একজনের বিশাল অট্টালিকা।

একদা গ্রামের রাস্তায় ইট খোয়া পড়েছিল বটে তবে এখন ভগ্ন অবস্থা। আম-কাঁঠাল আর বাঁশ বাগানের সবুজ শোভায় ঢাকা গ্রাম। মাঝে মাঝেই চোখে পড়বে পাকা বাড়ী। নারকেল আর কুল, পেয়ারার গাছও প্রচুর।

২। নামকরণ—

একদা নাকি বড় বড় নলখাগড়ার গাছ পাওয়া যেতো এই গ্রামে। ঐ বড় বড় নলগাছ থাকার জন্যই গ্রামের নাম হয়েছিল বড় নলদা। আর ছোট নলদায় জন্মাতো ছোট ছোট নলগাছ। তবে এখন চাষের জমি বেড়েছে আগাছা সরিয়ে। পতিত জমি বলে কিছুই নেই আর। ফলে নল গাছও উধাও হয়েছে ছোট বড় দুই নলদা থেকেই।

৩। উৎসব অনুষ্ঠান—

(ক) এই মুসলমান প্রধান গ্রামের মূল উৎসব হলো ইদলফিতর, ইদুজ্জোহা এবং মহরম। মাঝে মাঝে শীতকালে বড় ধরণের মেহফিলের আসরও বসে। সারা গ্রাম মেতে ওঠে তখন উৎসবের আনন্দে।

(খ) পৌষ মেলা—বড় নলদার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মেলা বা উৎসব হলো পৌষ মেলার উৎসব। নামে পৌষ মেলা হলেও উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু ১লা মাঘ। একদিনের এই পৌষ মেলার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে আশে পাশের গ্রামে। দোকান পসারি বসে, বসে নাগর দোলাও। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উল্লাসে—বাঁশী আর ভেঁপুর শব্দে মুখর হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন। তবে কৃষিজাত পণ্যই বিক্রী হয় বেশী এই মেলায়। চিড়ে মুড়ি, মুড়কি, ধান, ডাল, ফল ও শাক সব্জীর বিক্রীই বেশী হয়। তাছাড়া খুন্তি, হাড়ি, বটি, দা, ছুরি, ঘটি, বাটি, শাড়ী, জামা এবং খেলনাও বিক্রী হয় প্রচুর পরিমাণে। সারাবছর প্রতীক্ষায় থাকে গ্রামের মানুষ কবে পৌষ মেলা বসবে।

৪। নফরশা—

বড় নলদা গ্রামটি খুব প্রাচীন নয়। তবে ইদ্রিস আলীরা এগ্রামে বাস করছেন প্রায় পাঁচ পুরুষ ধরে। এ গ্রামের হিন্দুরা নাকি নিরাপত্তা বোধের অভাবেই এ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে পাশের ছোট নলদা এবং অন্যান্য গ্রামে। এখন কয়েক ঘর মুচি ও অন্যান্য নিম্ন বর্ণের হিন্দু মাত্র আছে এখানে।

যে পীর বা দরবেশকে কেন্দ্র করে বড় নলদায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে তাঁর নাম হলো পীর 'নফর শা।'

এই নফর শাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতির কাহিনী। শোনা যায় তিনি নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। (১) জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারতেন। (২) শূণ্যে উড়ে যেতে পারতেন। (৩) বোতলের মধ্যে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাতে পারতেন। (৪) মন্ত্র দ্বারা মৃত মানুষকে বাঁচাতে পারতেন। (৫) তেলপড়া বা জলপড়া দিয়ে সারিয়ে দিতেন দূরারোগ্য ব্যাধি। (৬) গাছের শিকড় বা পাতার রস দিয়েও নানারোগ সারাতে পারতেন। তবে মাদুলী বা তাবিজ ইত্যাদি বিশেষ কাউকে দিতেন না বললেই হয়।

তবে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর যে ঘটনাটা তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত সেটি হলো এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর বাক্ যুদ্ধের কাহিনী। শোনা যায় একবার নাকি এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এখানে আসেন তাঁর দর্প চূর্ণ করতে।

ন ফরশা ধ্যান যোগে ঐ সন্ন্যাসীর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে দেয়ালের ওপরে চড়ে (মতান্তরে ঢেকির ওপরে চড়ে) দ্রুত এগিয়ে যান ঐ সন্ন্যাসীর কাছে। হুংকার দিয়ে ওঠেন সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। প্রত্যুত্তরে হুংকার ছাড়েন নফরশাও। বেধে যায় দুই সাধকের মধ্যে ভীষণ তর্ক যুদ্ধ। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে চলে ঐ তর্কযুদ্ধ। চারি দিকে জমে যায় প্রচুর কৌতুহলী মানুষ। শেষ পর্য্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যান হিন্দু সন্ন্যাসী। নফরশার খ্যাতি রটে যায় চারিদিকে।

এই ঘটনা কতদূর সত্য-তা বলা যায় না। লোকশ্রুতি তো অনেক কথাই বলে। লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে কাহিনী পরিবর্তিত হয়ে চলে। নতুন কাহিনীও যুক্ত হয় বহুক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে কাহিনী কতোটা অপরিবর্তিত আছে তা নির্ণয় করা কঠিন আজ এত দিন পরে। মনে হয় নফরশার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই এই কাহিনী প্রচরিত হয়েছে। নফরশার জন্যই বড়নলদা এবং তার আশে পাশের গ্রামে যে মুসলিম জন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই বড় নলদাতেই নফরশার ইন্তেকাল হয় এবং যেখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় সেই সমাধির ওপরেই নির্মিত হয়েছে গ্রামের মসজিদটি। এখনো অনেকে নফরশার মাজারে ধূপ দেয়। মানতও করে। ফলও পায় অনেকে। সব ধর্মের মানুষের জন্যই ঐ মাজার মুক্ত আছে।

বড় নলদা ছাড়া পলাশী পাড়ার কাছে 'ছিলাতলা'তেও নফরশার একটি দরগা বা আখড়া ছিল। তবে বর্তমানে ঐ দর্গার জমি ঢুকে গেছে হাসপাতালের মধ্যে। আগে নাকি ওখানে মেলাও বসতো। তবে সেসব প্রাচীন দিনের ইতিহাস আজ। অবশ্য ছিলাতলা আজো আছে ঐ পলাশী পাড়ায়।

লালদীঘি

১। পরিচিতি ও নামকরণ—

লালদীঘিতে যদিও 'লালদীঘি' বলে কোন দীঘি নেই তবে শোনা যায় অতীতে ঐ গ্রামে নাকি একটা বিশাল দীঘি ছিল এবং সেই দীঘিটা নাকি সাহেবরা মেসিনের সাহায্যে জল তুলে বুজিয়ে দেয়। লাল মুখো সাহেবরা দীঘি বুজিয়ে দিয়েছিল বলেই কি ঐ দীঘিটির নাম হয়ে ছিল লালদীঘি ? নাকি যে দীঘিটি সাহেবরা বুজিয়ে দিয়েছিল সেই দীঘিটিরই আসলে নাম ছিল লাল দীঘি এবং ঐ দীঘির নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছিল লালদীঘি ?

আজ এতদিন পরে লালদীঘির প্রকৃত রহস্য উদ্ধার করা কঠিন।

তবে কেউ কেউ বলেন আগে লালদীঘির বিভিন্ন পুকুরে প্রচুর নালফুল (বা শাপলা ফুল) ফুটে থাকতো সেই নাল ফুলের প্রাচুর্য থেকেই গ্রামের নাম হয়েছিল নালদীঘি এবং 'নাল' থেকেই কালক্রমে লোকমুখে হয়ে যায় লাল দীঘি। নাল—লাল।

আবার কেউ কেউ মনে করেন এই গ্রামের যেসব দীঘি ছিল সেই সব দীঘির জল গ্রীষ্মকালে লাল হয়ে যেতো বলে ঐ সব দীঘিকে বলা হতো লাল দীঘি এবং ঐ সব লালদীঘি থেকেই গ্রামের নাম হয়ে যায় ক্রমে লাল দীঘি।

২। রাধাকৃষ্ণ মন্দির—

গ্রামের নামকরণের পিছনে যে কাহিনীই থাকুকনা কেন এই গ্রামের রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে যেসব উৎসবাদি হয়ে থাকে সেই সব উৎসবে কিন্তু শতশত নরনারীর ভীড় হয়ে থাকে। দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী এবং রাধাষ্টমীতে বিশেষ পূজা পাঠ হয়। নাম সংকীর্তনও হয়। রাস পূর্ণিমাতেও বিশেষ উৎসব হয়ে থাকে এখানে।

ঐ রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন মহানন্দ হালদার মহাশয়। অশথ ছায়ায় মন্দিরের পরিবেশটি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শান্তিদায়ীও বটে। নিত্য পূজা এবং ভোগ ও আরতি হয়ে থাকে।

৩। রথযাত্রা—

লালদীঘির 'রথযাত্রার' খুবই নাম ডাক ছিল আগে। তবে বর্তমানে মহানন্দ হালদারের মৃত্যুর পরে ঐ রথযাত্রার জৌলুষ কমেছে।

৪। শিক্ষা ও বিদ্যালয়—

এই গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলটি বর্তমানে হাইস্কুলে উন্নীত হয়েছে। প্রায় আটশো ছাত্র ছাত্রী পড়ে এখানে। ছাত্র ছাত্রীদের বেশীর ভাগই এই গ্রামেরই ছেলে মেয়ে।

৫। ব্রত পার্বণাদি—

গ্রামের মহিলারা যে সব ব্রতাদি পালন করে থাকেন তার মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী, চাপড়াষষ্ঠী বিপত্তারিণী ব্রত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠী পূজা, ইতুপূজা, ভাইফোঁটা প্রভৃতিও করে থাকেন গ্রামের মেয়েরা।

৬। পূজা—

গ্রামে দুর্গা পূজা, কালী পূজা এবং সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে বেশ ধুমধাম করেই।

৭। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—

লালদীঘিতে শিক্ষার হার দ্রুত বাড়ছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে এগ্রামে। আজকাল আবৃত্তি এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ক্যুইজেও বেশ প্রতিযোগিতা জমছে। গ্রামের ক্লাবের কর্মকর্তারাই এই সব প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

৮। বর্তমান অবস্থা—

লালদীঘির বেশ কয়েকজন কৃতি সন্তান ছড়িয়ে আছেন দেশের নানা প্রান্তে।

কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও ধীরে ধীরে উঠে আসছে লালদীঘি পাদ প্রদীপের আলোয়। গ্রামে শিক্ষার হারও বেড়েই চলেছে।

বড় চাঁদ ঘর

১। পরিচিতি—

বড় চাঁদ ঘর ও ছোট চাঁদ ঘরে প্রায় আট হাজার লোকের বাস। এই দুই গ্রাম সম্ভবত পূর্বে দুটি পাড়াতেই বিভক্ত ছিল পরে কোন এক সময়ে দুটি স্বতন্ত্র গ্রাম হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। তবে কতদিন পূর্বে যে এই ঘটনা ঘটেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

২। নামকরণ—

সম্ভবত, 'চাঁদ' নামের কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে চাঁদ ঘর। চাঁদের ঘর তাই চাঁদ ঘর।

আবার কেউ কেউ বলেন জলঙ্গীর তীরবর্তী এই গ্রামেই ছিল মনসামঙ্গলের বিখ্যাত চাঁদ সদাগরের বাড়ী। চাঁদ সদাগরের ঘর এখানে ছিল বলেই নাম হয়ে যায় এই গ্রামের চাঁদঘর।

৩। বর্তমান অবস্থা—

নামকরণের ইতিহাস যাইই হোকনা কেন বড় চাঁদ ঘর এই এলাকার যে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গ্রামে রয়েছে দুটি প্রাথমিক ও একটি হাইস্কুল। শিক্ষার হার বাড়ছে।

কৃষি প্রধান গ্রাম এটি। গ্রামের রাস্তা ঘাট তেমন ভাল না হলেও পাকা বাড়ীর সংখ্যা বাড়ছে ক্রমেই।

৪। উৎসব অনুষ্ঠান—

(১) (ক) মঙ্গল চণ্ডী—

বড় চাঁদ ঘরের বিখ্যাত উৎসব হলো মঙ্গলচণ্ডীর পূজা উৎসব। ঐ উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। বৈশাখ মাসে যতগুলো মঙ্গল বার থাকে মঙ্গলবার ধরেই চলে মেলা। তবে শেষ মঙ্গলবারেই ধুম ধাম হয় বেশী। কতোদিন ধরে যে এই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হয়ে আসছে তা বলতে পারে না কেউই। অশথ ছায়ায় মনোরম পরিবেশেই চলে পূজা-পাঠ এবং মেলাও বসে ছায়াঘন পল্লী প্রকৃতির বুকেই।

(২) (খ) পৌষ মেলা—

বড় চাঁদ ঘরের পৌষ মেলারও খ্যাতি আছে। মেলা কমিটিও আছে। ঐ কমিটিই মেলার ব্যবস্থা করে। ঐ মেলায় দোকানও বসে নানা ধরণের। নাগর দোলাও আসে। ম্যাজিকও হয়। বসে গানের আসরও। হৈ হৈ রৈ রৈ চলে মেলার দিন। কৃষিজ পণ্য নির্ভর মেলা হলেও এই পৌষ মেলায় গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র থেকে অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

৫। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—

এই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামের মতোই বর্তমানে এই চাঁদ ঘরেও বিভিন্ন সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তীও বেশ উৎসাহের সঙ্গেই পালন করে থাকে এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা।

৬। অন্যান্য ব্রত ও উৎসব অনুষ্ঠান—

(ক) এই গ্রামের মেয়েরাও ইতু পূজা করে থাকে অগ্রহায়ণ মাসে বেশ ভক্তিসহ্ কারে।

(খ) তাছাড়া ষষ্ঠী পূজা এবং মাঠ পালনী ব্রতও করে থাকে গ্রামের বৌ-ঝিরা।

(গ) বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে কীর্তিনাদিও হয়ে থাকে এই হিন্দু প্রধান গ্রামে।

৭। গাজন—

তবে চৈত্র মাসের গাজন উপলক্ষ্যে তেমন উৎসাহ্ দেখা যায় না বর্তমানে। বোলান বা ঝাপান গানেরো খ্যাতি নেই তেমন।

৮। পূজা পাঠ—

তবে দুর্গা পূজা-কালী পূজা ও সরস্বতী পূজা বেশ ধুমধাম করেই হয়ে থাকে এ গ্রামে।

কালী গঞ্জের কথা

১। প্রাক ইতিহাস—

নদীয়া জেলার কালীগঞ্জের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সুদীর্ঘকাল ধরে। একদা গঙ্গার তীরবর্তী কালীগঞ্জ ছিল বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। বড় বড় বাণিজ্য তরী ভীড়ে থাকতো কালীগঞ্জের ঘাটে। বহু ধনী ব্যবসায়ীর আগমন হতো কালীগঞ্জে। এখানকার বিশাল হাটে তখন ধান চাল-ডাল থেকে শুরু করে ফলমূল, মাছ ও শাক সব্জী বিক্রী হতো প্রচুর পরিমাণে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রীরও বেচা কেনা হতো এখানে। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বসতি। আর ঐ বাণিজ্য সূত্রেই একদা সমৃদ্ধ হয়েছিল কালীগঞ্জ। গম্ গম্ করতো কালী গঞ্জ দিনে, ঝলমল করতো সন্ধ্যায়' ও রাতে। চমকে যেতো বিদেশীরা।

আজ গঙ্গা সরে গেছে দূরে। গঙ্গার ঘাটও তাই কাছে নেই আজ। বড় বড় মহাজনী নৌকাও তাই দেখা যায় না আজ। নেই সেই ঝলমলে সন্ধ্যা রাতের আসরও। কেমন যেন ম্রিয়মান ভাব গ্রাস করেছে কালীগঞ্জকে।

পাশেই আছে ছাড়ি গঙ্গার খাত। বর্ষায় জল জমে সেখানে। স্রোতও বয়ে যায়। গঙ্গার জল এসে পবিত্র করে কালীগঞ্জের মাঠ ঘাট। তখন অতীত দিনের স্মৃতি জাগে। কিন্তু কোথায় মহাজনী নৌকা ? কোথায় ধনী ব্যবসায়ীর দল ? হায় স্মৃতি। হায় ইতিহাস।

একদা এই কালীগঞ্জে বহু ধনী ব্যক্তির আগমন ঘটতো। আসতেন জ্ঞানী গুণীরাও। ধনে মানে কালীগঞ্জ হয়ে উঠেছিল এক বিখ্যাত গঞ্জ। ছিল বিশাল বিশাল দীঘি ও ফলের বাগান। ঝলমলে প্রাসাদ। নিয়মিত বসতো নাচ-গান ও যাত্রা-পাঁচালীর আসর। ঝাড়লণ্ঠন ও হ্যাজাক-দেলা ইটের আলোয় চারিদিকে বয়ে যেতো খুশীর বন্যা। নাচে-গানে-হাসিতে জগৎ হয়ে উঠতো মধুময়।

চৈত্র মাস জুড়ে চলতো গাজনের সন্ন্যাসীদের 'হর-হর মহাদেব' ধ্বনি। চৈত্র শেষে হতো চড়কের মেলা। শ্রাবণের শেষে ব্রহ্মাণীতলায় বসতো মনসা গানের আসর। হতো বলিদান।

জমিদার বাড়ীতে দুর্গাপূজায় বসতো যাত্রার আসর। কালীপূজা এবং মঙ্গলচণ্ডী ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজাতেও হতো কতো না আড়ম্বর।

২। জমিদার বাড়ী—

প্রাচীন সেই জমিদার বাড়ী আজো আছে। কিন্তু বিবর্ণ মলিন সেই বাড়ী। শূণ্য ঠাকুর দালান এবং প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে বিদীর্ণ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে শুধুই অতীতের হাহাকার। ঘরে ঘরে-কার্ণিশে পায়রা আর চামচিকার উল্লাস।

যতদূর জানা যায় কালী গঞ্জের এই জমিদারদের আদি পুরুষ হলেন ব্যোমকেশ সান্যাল। বর্ধমানের কুলগাছি থেকে এখানে এসে জমিদারী কেনেন ও বিশাল প্রাসাদ তৈরী করে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। অবশ্য পররবর্তীকালে মেটেরিয়ার দাসুসেন এই জমিদারী নীলামে উঠলে কিনে নেন। আরও পরে কালী গঞ্জের ধনী ব্যবসায়ী সাহারা ধীরে ধীরে কিনে নেন ঐ জমিদারী। আমবাগান, পুকুর, জমিদার বাড়ী সবই কিনে নেন সাহারা।

সাহাবাবুদের মধ্যে প্রতাপ সাহা ছিলেন খুবই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। শোনা যায় ছোট লাটের সঙ্গেও বন্ধুত্ব ছিল তাঁর।

বর্তমানে সাহাদের আম বাগান এবং বিখ্যাত কলুপুকুর অবশ্য বাগচীদের দখলে। শোনা যায় রতি সাহার বিধবা বোন পুঁটি সাহাকে হাত করেই নগেন বাগচী ঐ সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছেন কৌশলে।

৩। লাখুরিয়া ও লক্ষহীরা—

কালীগঞ্জের পীচ রাস্তার দক্ষিণ দিকটাই হলো প্রকৃত কালীগঞ্জ আর উত্তর দিকটার পরিচিতি 'লাখুরিয়া' বলে।

ঐ অংশের 'লাখুরিয়া' নামকরণের পিছনে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে তাহলো একদা কালীগঞ্জের গঙ্গার তীরে প্রাসাদ বানিয়ে বাস করতেন এক সুন্দরী রমণী। ঐ সুন্দরীর গানের গলা ছিল যেমন মিষ্টি তেমনিই নৃত্যেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসতন রসিক সুজনের দল। দিনে দিনে ঐ সুন্দরীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশে বিদেশে। তাঁর বাজারদরও চড়ে গেল হু হু করে। শেষে এমন হলো যে একটি রাতে তাঁর গান ও নাচের জন্য দিতে হতো লক্ষ টাকা। ঐ সুন্দরী গায়িকা ও নৃত্য পটিয়সীর নাম ছিল হীরা। কিন্তু লক্ষ টাকা ছাড়া তাঁর নাচ বা গান দেখা ও শোনা সম্ভব হতো না বলে কালক্রমে তাঁর নামই হয়ে গেল লক্ষহীরা। আর লক্ষহীরার নাম থেকেই তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকার নাম হয়ে গেল লাখুরিয়া—লক্ষহীরা—লাখোহীরা—লাখোরিয়া—লাখুরিয়া।

৪। শিব মন্দির—

আজ সেই লক্ষহীরা নেই। তাঁর প্রাসাদও ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে এখনো রয়েছে লক্ষহীরার পূজিত শিব মহেশ্বর। সেই শিব নিত্য পূজিত হচ্ছেন। চার ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শিব লিঙ্গের পাশেই রয়েছে কষ্টি পাথরের নন্দী এবং দক্ষিণ দিকে দুই ফুট উচ্চতার একটি ছোট শিবলিঙ্গ। ছোট শিবলিঙ্গটি নাকি পার্বতীর প্রতীক।

উচ্চতায় ও আকারে মন্দিরটি ছোট হলেও বেশ মজবুত। মন্দিরটির ইট প্রাচীন। অন্তত পাঁচশো বছরের পুরনো মন্দির বলেই স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস। জাগ্রত বলে সবাই মানে ঐ শিব ঠাকুরকে। শিব চতুর্দশীর উৎসব হয় আজো বেশ ঘটা করেই এখানে।

ঐ মন্দির ও প্রাসাদের পাশেই ছিল বিশাল একটি ইঁদারা। তবে সম্প্রতি সেটা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৫। লোককথা—

শোনা যায় ফাল্গুনী জ্যোৎস্নায় এখনো নাকি ভগ্ন প্রাসাদের ধারে কার মিষ্টি গলার গান ভাসে। ধব্‌ধবে সাদা ওড়নায় কে মুখ ঢেকে সেখানে নাচে। আবার ভোর হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যায় সেই সুন্দরী।

লোকে বলে ঐ অশরীরী নাকি সেই সুন্দরী লক্ষহীরারই প্রেতাত্মা। মায়াকাটাতে পারেনি বলেই আজো ফিরে ফিরে আসে মধু জ্যোৎস্নায় আসর জমাতে ঐখানে।

তাছাড়া গভীর রাতে ঐ মন্দিরেও নাকি শোনা যায় ঘন্টা ধ্বনি। কে নাকি পূজাও করে কিন্তু ঐ পূজারী বা পূজারিণীকে আজ পর্য্যন্ত দেখতে পায়নি কেউই।

৬। শিক্ষা ও বিদ্যালয়—

কালীগঞ্জের হাইস্কুলটি রয়েছে লাখুরিয়ায়। ছাড়ি গঙ্গার গায়ে স্থাপিত ঐ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঐ হাইস্কুলটি। এখানে আছে তিনটি প্রাইমারী স্কুলও। এখানে শিক্ষার হার সত্তরের ওপরে।

৭। ব্রহ্মাণী তলা—

কালীগঞ্জের সবচেয়ে প্রাচীন এবং জাগ্রত ধর্মীয় স্থান হলো এই ব্রহ্মাণী তলা। প্রাচীন একটি শিলাখণ্ডই হলো ব্রহ্মাণীর প্রতীক। পূজো করতো নীচ হাঁড়িরাই। শূয়র বলি হতো। গভীর জঙ্গল ছিল চারপাশে আগে। বর্তমানে চারপাশে দোকান হয়েছে। উত্তর দিকে হয়েছে পঞ্চায়েত অফিস।

ঝুরি নামা বিশাল বটগাছের গোড়ায় ছোট ছোট মাটির মূর্তি রাখা আছে প্রস্তর খণ্ডের পাশে। শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মা ও মনসার মূর্তি। রয়েছে মনসার গাছও। শ্রাবণ মাসের শেষেই ধুম ধাম করে ব্রহ্মাণীর পূজো হয় এখানে। তবে ঐ পূজোয় বর্তমানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও অংশ নেন। হাঁড়িদের হাত থেকে প্রায় কেড়েই নেওয়া হয়েছে ঐ ব্রহ্মাণীর পূজার অধিকার।

'ব্রহ্মাণী তলা' নাম নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন এখানে দীর্ঘকাল ধরে ব্রহ্মাণীর পূজো হয়ে আসছে তাইই এই স্থানের নাম হয়েছে ব্রহ্মাণী তলা।

আবার কেউ বলেন আগে এখানে হতো ব্রহ্মার পূজা। ব্রহ্মতলা থেকেই হয়েছে ব্রহ্মাণীতলা। অবশ্য এঁদের মতে ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর পূজোও হতো। কিন্তু কালক্রমে ব্রহ্মাণীই প্রাধান্য পেয়ে যায় এবং নাম হয়ে যায় ঐ স্থানের ব্রহ্মাণী তলা।

তবে প্রকৃত ঘটনা হলো ব্রহ্মাণী আসলে হলেন বামনী বা মনসা। মনসার গাছ ঐ মনসা দেবীরই প্রতীক। কাজেই এটি ব্রহ্মাণী তলা বলে খ্যাত হয়েছে ঐ বামনী থেকেই।

তাছাড়া এখানে শ্রাবণ মাসের শেষেই পূজো হয়। মনসার গান হয়। ঝাপানও হয়। সবই মা মনসার সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমানে সাতটি সম্প্রদায়ের প্রতীক সাতটি ঘটে, মা মনসার পূজো হয় এখানে। তবে শূয়োর বলি হয় না আর। এখন এই স্থানটি এনায়েৎপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন।

৮। (ক) বুড়ীমা—

কালীগঞ্জের বুড়ীমা ভীষণ জাগ্রতা দেবী বলেই স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস। দেবী সবারই মনোবাসনা পূর্ণ করেন। সুসজ্জিত দালান মন্দিরে দেবীর অবস্থান। সম্মুখে নাটমন্দির এবং যূপকাষ্ঠ। নিত্য পূজো ও ভোগ হয় দেবীর। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় হয় বিশেষ পূজা। ঐ সময় ১০৮টি ছাগ বলি দেওয়া হয়। আগে নাকি মোষ বলি দেওয়া হতো। ঐ পূজার সময়ে ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করা হয় মন্দির ও তৎসংলগ্ন এলাকা। ১০৮টি ঢাকও বাজে। বলির পশুর সংখ্যা কোন কোন বার ১০৮ ছাড়িয়ে যায় আবার কোন কোন বার কমও হয়। অবশ্য সব পশুই মানতের পশু। বিসর্জনের সময় বুড়ীমাকে চাকা ওয়ালা গাড়ীর ওপরে বসিয়ে গোটা কালীগঞ্জ ঘোরানো হয় জয়ধ্বনি দিতে দিতে।

বুড়ীমা আসলে লৌকিক দেবী হলেও কালীমূর্তিতেই পূজা করা হয়।

এই বুড়ীমাকে কেন্দ্র করে কালীগঞ্জে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতির কাহিনী। একটি লোকশ্রুতির কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে স্বয়ং মাকালীই নাকি হরিনাথপুরের ভট্টাচার্য বাড়ীর বৌ হয়ে আসেন। কিন্তু বৌভাতের দিনই ঘটে যায় অঘটন। সদ্য বিবাহিতা নতুন বৌ নিমন্ত্রিত অতিথিদের পাতে ভাত দিচ্ছেন এমন সময় মাথা থেকে ঘোমটাটা খুলে যায়।

দুটি হাতই জোড়া কি আর করা ? তখনই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য ঘটনাটা। সকলেই সবিস্ময়ে দেখলো নববধূর কাঁধের দুপাশ থেকে বেরিয়ে এলো আরো দুটি হাত ঘোমটা ঠিক করার জন্য। অন্যরা দেখে ফেলেছে। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা। মুখ হয়ে উঠলো রাঙা নববধূর। জিভ কাটলেন তিনি লজ্জায়। আর দাঁড়াতে পারেন না সেখানে। ছুটে গিয়ে ঝাঁপদেন দীঘিতে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান সকলে 'কি হলো ? কি হলো ? করতে করতে কিন্তু দীঘির মাঝখানে শুধু ভেসে ওঠে একখানা শাঁখা পরা হাত। তার পরেই অদৃশ্য হয়ে যায় সেই হাত। দেখা যায় না আর কিছুই। হায় হায় করতে থাকেন সকলে সেই দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে।

সকলে বুঝতে পারে স্বয়ং মাকালীই এসেছিলেন ভট্টাচার্য বাড়ীর বৌ হয়ে।

সেই থেকেই বুড়ীমার মূর্তি তৈরী করে পূজা হয়ে আসছে। বুড়ীমা আসলে স্বয়ং মা কালীই কিন্তু এর পিছনে রয়েছে ভট্টাচার্য বাড়ীর সেই নববধূর স্মৃতি বিজড়িত। বুড়ীমাকে লৌকিক দেবী বলেও মান্য করেন অনেকে।

বুড়ীমার কল্যাণেই ভট্টাচার্য বাড়ীর অবস্থা ফিরে যায়। বর্তমানে ঐ পরিবার বিভিন্ন শরিকে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পালা করেই ঐ সব শরিকরা বুড়ীমার পূজো করে থাকেন।

বুড়ীমার পাশেই রয়েছে ভৈরব মন্দির। সেখানেও নিত্য পূজা হয় ভৈরবের। প্রতি শনি মঙ্গল বারেই এখানে বহু ভক্ত জন আসেন এবং বিশেষ পূজা হয় তবে প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় ধুম ধামসহ যে পূজো হয় তার তুলনা মেলা ভার। রীতিমতো মেলা বসে যায় তখন। হাজার হাজার লোকের ভীড়ে গম গম করে তখন বুড়ীমা তলা ও হরিনাথপুর সহ গোটা কালীগঞ্জ।

(খ) জুড়নপুরে বুড়ীমা—

বুড়ীমা সম্পর্কে দ্বিতীয় যে লোকশ্রুতির কাহিনীটি প্রচলিত তা হলো বুড়ীমা শুধু হরিনাথপুরের ভট্টাচার্য চাড়ীতেই দর্শন দেননি তিনি জুড়নপুরেও দেখা দিয়েছিলেন। তবে ছাড়ি গঙ্গার ওপারে জুড়নপুরে তিনি শুধু শাঁখা পরা ডান হাতটিই দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান একটি অশথ গাছের মধ্যে। সেই থেকেই সেখানেও নির্মিত হয়েছে একটি মন্দির। বুড়ীমার নিত্যপূজা এবং ভোগারতিও হয়ে থাকে ঐ জুড়নপুরের বুড়ীমার মন্দিরে। শনি মঙ্গলবারে ওখানে বিশেষ পূজো ছাড়াও কার্তিকের অমাবস্যায় খুবই ধুম ধাম করে বুড়ীমার পূজা হয়ে থাকে।

৯। বাগচী বাড়ী—

কালীগঞ্জের বাগচীরাও ধনে মানে একদা বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশের নগেন বাগচী মহাশয় ছিলেন বামাখ্যাপার শিষ্য। তারাপীঠের মহাশ্মশানেই তাঁর সমাধি আছে। নগেন বাগচী সম্বন্ধেও নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। বাগচীদের আমবাগানে নগেন বাবুর স্ত্রী অচলাদেবী ও বড়ছেলে বামাচরণের যে সুদৃশ্য সমাধি মন্দির দুটি রয়েছে সে দুটি সত্যিই দর্শনীয়। বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছে ঐ সমাধি মন্দির দুটি।

১০। আশ্চর্য্য অশথ গাছ—

কালীগঞ্জের কাছেই একটি অশথ গাছকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী। লোকে বলে ঐ গাছে নাকি বাস করতো এক ব্রহ্ম দৈত্য। কেউ কেউ নাকি জ্যোৎস্নারাতে দেখেওছে ঐ ব্রহ্মদৈত্যকে। দিনের বেলাতেও নাকি গা ছম্ ছম্ করতো ঐ গাছের তলা দিয়ে যেতে। সন্ধ্যা বেলায় তো অতি বড়সাহসী ব্যক্তিও ঐ গাছের তলায় যেতে সাহস করতো না।

তার পরেই এক বৈশাখী ঝড়ে উপড়ে যায় ঐ অভিশপ্ত অশথ গাছটি। গাছের ডাল পালা কাটা শুরু হয়। আর তখনই ঘটে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। গাছ থেকে রক্ত বের হতে

থাকে ফিন্‌কি দিয়ে। খবরটি রটে যায় চারিদিকে। আর যে 'কাহার' মজুরটি ঐ গাছ কাটছিল সে রাত্রে স্বপ্ন দেখে কে যেন তার শিয়রে দাঁড়িযে বলছে—"ওরে, আমাকে ওভাবে কাটাছিস্ কেন ? আমর যে ব্যথা লাগছে। আমার পূজো কর তোদের মঙ্গল হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় ঐ কাহারের। গ্রামের লোকজনদের বলে সে তার স্বপ্ন দর্শনের কাহিনী। এর পরেই আশ্চর্য্য জনক ভাবে উঠে দাঁড়ায় ঐ গাছটি। খবর রটতে দেরী হয় না। হাজার হাজার লোক ছুটে আসে এই অলৌকিক ঘটনা দেখতে। শুরু হয়ে য়ায অশথ পূজা। চলে নাম সংকীর্তনও।

বর্তমানে ঐ গাছের গোড়াটা ইট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। বসানো হয়েছে লোকনাথের পটও। ধূপ ধুনো দিয়ে পূজোও হচ্ছে নিয়মিত। তবে বৈশাখ মাসেই ধুম ধাম হয় বেশী। বৈশাখী পূজায় মেলাও বসে। বাউল গানের আসর বসে। খিচুড়ী ভোগ হয়। হাজার হাজার ভক্তজনের আগমনে জমে ওঠে উৎসব। বহু জন আবার মানত করে এবং গাছে ইটও বাঁধে অনেকে।

১১। কালীগঞ্জের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

প্রতিযোগিতা—

দীর্ঘকাল ধরেই কালীগঞ্জে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ চলে আসছে। গ্রামে রয়েছে যাত্রা ও নাটকের দল। বিভিন্ন উৎসবের সময় চলে নাটক ও যাত্রা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় আবৃত্তি-নাচ ও গানের। নৃত্য এবং গানের স্কুলও আছে। আছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আর্ট শেখানোর স্কুলও। বসে আঁকো, 'যেমন খুশী আঁকো' প্রভৃতি প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। বাউল এবং লোকগীতির আসরও বসে বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে।

১১। ভাসান গান—

আগে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার ভাসান ও ঝাপান হতো ব্রহ্মাণী তলায়। এখনো হয় তবে আগের মতো তেমন ধুম ধাম লক্ষ্য কবা যায় না।

১২। বোলান গান—

কালীগঞ্জের বোলান গানের দলের খ্যাতি ছড়িযে আছে সারা জেলাতেই। বন্দনা, যাত্রা ও পাঁচালী অংশে বিভক্ত বোলান গানের রমরমা চলে গোটা চৈত্র মাস জুড়েই। এই গ্রামেও আছে বেশ কয়েকজন গীতিকার ও পালাকার। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—নারায়ণ ঘোষ ও গোবিন্দ বাবু।

বিখ্যাত কয়েকটি বোলান গানের পালা এবং রং পাঁচালী হলো—সংসার, সোনাবন্ধু, জয়দেব পদ্মাবতী, দাদু নাতনী প্রভৃতি।

সুদীর্ঘকাল ধরেই বোলান গান এই অঞ্চলের লোকশিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আসছে।

১৩। কালীগঞ্জের সার্বিক পরিচিতি—

প্রাচীন বন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে কালীগঞ্জের পরিচিতি সুদীর্ঘকালের। বর্তমানে কালীগঞ্জ নদীয়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। ২৩টি পঞ্চায়েতে বিভক্ত এই থানা। এখানে রয়েছে হাসপাতাল, পঞ্চায়েত অফিস, বাজার, হাট, ইলেকট্রিক অফিস, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

মধ্যযুগের আঁধার পেরিয়ে কালীগঞ্জ দ্রুত আজ নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

বাগচী যমশেরপুরে

১। যতীন্দ্রমোহন—

নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম বাগচী যমশেরপুর নানা কারণেই বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম এই বাগচী যমশেরপুর। এই গ্রামেরই নিজ প্রাসাদে বসে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা সমূহ—

(১) 'ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা আইরি খেতের আড়ে
প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে ;

এবং হৃদয় কাঁদানো সেই বিখ্যাত গান (২)

বাঁশ বাগানের মাথার পরে চাঁদ উঠেছে ঐ
ওমা, আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কই ?

এছাড়া কতো অসংখ্য কবিতা।

কিন্তু পল্লী কবি যতীন্দ্রমোহনের জন্ম স্থান বা তাঁর সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান বলেই শুধু নয় সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপের জন্যও এ গ্রামের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে গোটা জেলা তথা বাংলায়।

২। হাইস্কুল—পরিবেশ—

এই গ্রামের হাই স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একশো বছরেরো আগে। বাগচী পরিবারের দানেই গড়ে উঠেছে এই বিদ্যালয়টি। দেবদারু মেহগনির স্নিগ্ধ ছায়ায় অপূর্ব পরিবেশে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে এই প্রাচীন ঐতিহ্য পূর্ণ বিদ্যানিকেতনটির। এই গ্রামের সবুজ গাছে গাছে—বাঁশ বাগানে—সবুজ ঘাসের ডগায়, নীল আকাশের মায়ায় সর্বত্রই যেন ছড়িয়ে আছে কবিতার মাধুর্য্য। মন হারিয়ে যায় দুর থেকে দূরে। এ গ্রামের স্নিগ্ধ মায়ায়—কোকিলের গানে—ঘুঘুর ডাকে—ফিরে আসে সুপ্রাচীন বাংলার স্মৃতি।

সত্যিই যমশেরপুর এক আশ্চর্য্য মায়াময় গ্রামই বটে।

৩। গ্রাম পরিচিতি—

এ গ্রামে রয়েছে শিব মন্দির, দুর্গা মণ্ডপ। রয়েছে পঞ্চায়েত অফিস, লাইব্রেরী, পোস্টাফিস, দোকান বাজার। এসেছে বিদ্যুৎ। ঘরে ঘরে চলছে টি. ভি. ফ্যান, জ্বলছে লাইট—আধুনিক জীবনের সব সুযোগ সুবিধাই পৌঁছে গেছে এই সীমান্তবর্তী গ্রামে। গ্রামীন পরিবেশে নাগরিক জীবনের ঔজ্বল্য সত্যিই হৃদয়ে পুলক আনে।

একদিকে অসংখ্য পানের বরজ, অন্যদিকে বিশাল বিশাল ঐতিহ্যময় তিনমহলার প্রাচীন প্রাসাদ, স্কুল-মাঠ—বাগান—প্রাচীন নদী সব মিলিয়ে যে বৈচিত্র্যের সমারোহ এই গ্রামে তা যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনই বিস্ময়কর।

৪। নামকরণ—

বাগচী যমশের পুরের নামকররের ব্যাপারে যেসব জনপ্রিয় কাহিনী বা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে এই গ্রামে তার একটি হলো বহু আগে এই গ্রামে যমশের নাম এক ডাকাত বাস করতো। ঐ যমশের এর নাম থেকেই এই গ্রামের নাম হয় যমশেরপুর। পরে বাগচীদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির জন্য যুক্ত হয় বাগচী শব্দটি ঐ নামের পিছনে এবং নাম হয় বাগচী যমশেরপুর।

দ্বিতীয় লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় একদা এই অঞ্চলে খুব জঙ্গল ছিল। ঐ জঙ্গলে বাস করতো বহু শের বা বাঘ। ঐ সময়ে আবার যারা এই সব জঙ্গলের আশে পাশে বাস করতো তারাও ছিল খুবই দুর্ধর্ষ। গোয়ালা জাতির বাস ছিল তখন এই অঞ্চলে। তারা ছিল শের বা বাঘের যম। সেই থেকেই শেরের যম পুর হয়ে যায় যমশেরেরপুর এবং লোক মুখে পরিবর্তিত হতে হতে গ্রামের নাম হয়ে যায় যমশেরপুর।

তৃতীয় যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে সেটি অনুসারে জানা যায় অতীতে জামসেদপুরের সঙ্গে প্রায়ই ডাক বিভাগ গুলিয়ে ফেলতো এই যমশেরপুরকে। চিঠি পত্র চলে যেতো জামসেদপুরে। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যই এই গ্রামের জমিদার বাগচীরা এই গ্রামকে পৃথক মর্য্যাদা দান করার জন্য নাম রাখেন বাগচী যমশেরপুর। সেই থেকেই এ গ্রাম পরিচিত হয়ে আসছে ঐ বাগচী যমশেরপুর নামে।

এই গ্রামে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের বাস। তিন জন পঞ্চায়েত সদস্য। শতকরা ৭০ ভাগ লোক সাক্ষর। কৃষিই জীবিকার প্রধান উৎস হলেও গ্রামে ব্যবসায়ী এবং চাকুরীকরা লোকও আছেন অনেক।

৫। ব্রত পার্বণাদি—

সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চড়কের সময় বোলান গান হয়। তাছাড়া এ গ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, কুলাই চণ্ডীর ব্রত যেমন পালিত হয় তেমনই মনসা পূজা, ষষ্ঠী পূজা, ইতু পূজা ইত্যাদিও হয়ে থাকে।

আগে বিভিন্ন পূজায় কবি গান তর্জা ইত্যাদি হতো কিন্তু নানাকারণে বর্তমানে উৎসাহ কমে গেছে ঐ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের।

৬। লোককাহিনী বা পুরনো দিনের গল্প—

ভাদ্রমাসে প্রবীণ ও প্রবীণরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা রকমের গল্প বা কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। এই সব কাহিনীর বিষয় হয়ে থাকে রাজা বাণী, রাক্ষস খোক্কস, পরী ও রূপ কথা ধর্মী গল্প। শঙ্খমালা—পদ্মমালার কথা। নীলকমল ও লালকমলের কথা ইত্যাদি। আষাড়ে গল্পও হয় আবার ছড়ার গানও থাকে।

৭। বাগচী পরিবার—

যমশেরপুরের বাগচীরা শুধু যে লক্ষ্মীর বরপ্রাপ্ত ছিলেন তাই নয় তাঁরা সরস্বতীর বরও পেয়েছিলেন। এঁরা গ্রামবাসীদের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার সামগ্রিক উন্নতির জন্যও সচেষ্ট ছিলেন।

এঁদেরই উদ্যোগ এবং আর্থিক সহযোগিতায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় যমশেরপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাগচী পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান ভূপেন্দ্র নারায়ণের অকাল মৃত্যু হলে তাঁর মা শশী সুন্দরী দেবী পুত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে ২১ বিঘা জমির ওপরে নতুন ঘর নির্মাণ করে দেন এবং বর্তমান বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করেন ও নাম দেন ভূপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের দ্বার উদঘাটন করেন নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট জে. আর. ইজিকল্ সাহেব ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর।

বাগচীদের জমিদারী ছিল বীরভূম মানভূম ও সিংভূম অঞ্চলে। এছাড়া ঐ সব অঞ্চলের কোলিয়ারীতেও অংশ ছিল। এছাড়া ব্যবসা এবং তেজারতি কারবারও ছিল।

এই বংশের সন্তানগণ সাহিত্যে, বিচার বিভাগে, চিকিৎসাতে ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। মূলতঃ এই বাগচীদের জন্যই যমশেরপুরের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। বাগচীদের অতীত ইতিহাস যতদূর জানা যায় তা থেকে বোঝা যায় যে নারায়ণ

ভট্টই এঁদের আদিপুরুষ। নারায়ণ ভট্টের বংশধরগণ তিরিশ পুরুষ ধরে 'ধামসর' বা ধামসাইতে বসবাস করেন। এই বংশের 'রামভদ্র' ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে বর্তমান যমশেরপুরের উত্তরপ্রান্তে সুন্দলপুরের হীরালাল মৈত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্বশুর বাড়ীতে অশান্তি দেখা দিলে রামভদ্র গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে এসে ওঠেন এবং মোড়লের গুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। রামভদ্রের পৌত্র সৃষ্টি ধর কাঁচা খড়ের বাড়ীর পরিবর্তে পাকা ইটের বাড়ী তৈরী করেন এবং পরে বিশাল অট্টালিকা তৈরী হয়।

তবে বর্তমান বাগচী বাড়ীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন রাম নৃসিংহ বাগচী। রাম নৃসিংহের পাঁচ পুত্র রামেশ্বর, রাম গঙ্গা, রামতনু, রামকেশব ও রামকৃষ্ণ। এই পাঁচ জন পরে পৃথক পৃথক ভাবে পাঁচটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাম নৃসিংহের দ্বিতীয় পুত্র রামগঙ্গা নসীপুরের মহারাজা কীর্তি চাঁদের দেওয়ান হন এবং যুগিন্দা, টেকা, মজলিশপুর, বিদাড়া, পরাশপুর কুপলা ও যমেশের পুরের জমিদারী পত্তনি নেন।

রামগঙ্গার তিনপুত্র কৃষ্ণ নারায়ণ, শ্রী নারায়ণ ও হরিমোহন। কৃষ্ণ নারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু নারায়ণ বাগচীর নয় পুত্র হয়। এঁদের কনিষ্ঠ হলেন ভূপেন্দ্র নারায়ণ যাঁর অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত আত্মীয় বর্গ যমশের পুর হাইস্কুলের নাম রাখেন 'ভূপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

রামগঙ্গার তৃতীয়পুত্র হরিমোহনের কনিষ্ঠ পুত্রই হলেন বিখ্যাত পল্লীকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গ্রামে স্কুল, চিকিৎসালয়, ডাকঘর, পাকা রাস্তা, খেলার মাঠ, কূপ, ইত্যাদি স্থাপন করে এবং নিত্য যাত্রা নাটক প্রভৃতির আয়োজন করে বাগচী যমশের গ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করেন বাগচী বাবুরা

৮। বাগচী প্রাসাদ ও ঠাকুরদালান—

বাগচীদের পুরনো প্রাসাদ ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী। এই সব প্রাসাদ তৎকালীন বৃটীশ স্থাপত্যের অনুকরণেই বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছিল। ঐ সব প্রাসাদের পিছনে রয়েছে বহু সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী ও কারিগরদের একনিষ্ঠ পরিশ্রম।

বাগচীদের সব থেকে পুরনো প্রাসাদ সংলগ্ন ঠাকুর দালানকে ঘিরে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত রয়েছে সেটি হলো এই যে ঐ ঠাকুরদালানের নীচেকার সুড়ঙ্গ পথটি নাকি চলে গেছে প্রাচীন দীঘি পর্য্যন্ত। দুর্গা পূজার দিন ঐ দীঘিতে কলা বৌকে স্নান করিয়ে আনার পরই নাকি বড় বড় মাছ এসে ধাক্কা দিত ঠাকুর ঘরের নীচে। ঐ দীঘির মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল। এখনো বড় বড় মাছ আছে।

বাগচী বাড়ীর দুর্গা পূজা দেখতে এখনো বহু দূরের গ্রাম থেকে লোকজন আসে দলে দলে। তবে আগে যেমন ধুমধাম হতো তেমনটা হয় না আর এখন। যাত্রা থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছে, কাঙালী ভোজন হয় না, বাজি পটকা বা আলোর রোশনাই ও তেমন চোখে পড়ে না আর। অতীতের সেই রম রমা ভাব আজ অর নেই। কোথায় সেই ১০৮ ঢাকের আওয়াজ ? কোথায় নহবত ? আজ সেসবই অতীত কাহিনী মাত্র।

বাগচী বাড়ীর হাতি ঘোড়া লোকজন, চাকর চাকরাণীদের নিয়েও ছড়িয়ে আছে নানা গল্প—নানা কাহিনী। বিগত দিনের সেই সব কথা আজ শুধুই স্বপ্ন—শুধুই অতীত স্মৃতির রোমন্থন মাত্র।

হাঁসপুকুরিয়া

নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার অন্তর্গত জলঙ্গীর তীরবর্তী যে গ্রামটি হাঁস পুকুরিয়া নামে খ্যাত তার উত্তরে রয়েছে ধরমপুর ও দক্ষিণে কুষ্ঠিয়া গ্রাম এবং পূর্ব দিকে জলঙ্গী নদী ও পশ্চিমে বাঘা সড়িয়া গ্রাম।

১। নামকরণ—

এই গ্রামটির নামকরণ সম্পর্কে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে, তা হলো এখানে আগে ছিল বড় বড় পুকুর এবং ঐ সব পুকুরে চরতো অসংখ্য হাঁস। সেই থেকেই নাম হয়ে যায় হাঁস পুকুরিয়া।

২। পরিচিতি—

গ্রামটি প্রায় চারশো বছরের পুরনো গ্রাম। সাড়ে ছহাজার লোকের বাস এই গ্রামে। হিন্দু মুসলিম প্রায় সমান সমান। গ্রামে রয়েছে চারটে হিন্দু মন্দির এবং তিনটি মসজিদ। দুর্গা পূজা কালী পূজা ও সরস্বতী পূজা চলে বেশ ধুম ধাম করেই। দোল উৎসব ও জন্মাষ্টমীর উৎসবও হয়। আবার মুসলিমদের ইদুজ্জোহা এবং মহরম উৎসবও পালিত হয় যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গেই। গ্রামটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ।

৩। শিক্ষা—

গ্রামে রয়েছে তিনটি প্রাথমিক ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই হাইস্কুলে প্রায় দু হাজারের মতো ছাত্র। আশে পাশের প্রায় দশ বারোটা গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়ে এখানে। পড়াশুনার মান মোটামুটি ভালই। গ্রামে শিক্ষার হার মন্দ নয়।

গ্রামের উত্তর দিক দিয়ে চলে গেছে বাস রাস্তা। বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, পলাশী পাড়া ও কাটোয়া ঘাট পর্য্যন্ত যোগাযোগ আছে বাসে। গ্রামের সব পাড়ার রাস্তাই ইট দিয়ে বাঁধানো। রিক্সা-ভ্যান-সাইকেল চলে সব রাস্তাতেই।

৪। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য—

গ্রামের সাংস্কৃতিক দিক তেমন উন্নতমানের না হলেও এখানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গান-নাচ ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময়। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যেও নাচ গান যেমন হয় তেমনি আবার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে।

নানা ধরণের খেলাধূলার প্রচলনও আছে। এখানে লাঠি খেলার যে প্রতিযোগিতা হয় শ্রাবণ মাসে তা দেখতে বহু লোক আসে। পুরস্কারও দেওয়া হয় বিজয়ীদের। ফুটবল, ভলি ও ক্রিকেট খেলায় গ্রামের ছেলেরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে বহু প্রতিযোগিতায়। এই ব্যাপারে গ্রামের ক্লাব 'স্পোর্টিং ইউনিয়ন' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

গ্রামে ছড়িয়ে আছে বহু প্রাচীন ঢিবি। ওগুলোর কাল নির্ণয় করা কঠিন। তবে যে প্রাচীন ইটের দেয়ালটি খাড়া আছে ওটিকে কেউ বলে নীল কুঠীর ধ্বংসাবশেষ কেউ বা বলে প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। কেউ বা বলেন বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন ওগুলো।

৫। এলাতলা—

এই গ্রামে যে পীরের দরগাটি আছে। ওটি খুবই জাগ্রত স্থান বলে মানে হিন্দু মুসলমান সবাই। মানত কবে, ছলনের ঘোড়া ও দুধ দেয় ভক্তরা এখানে। পীরের উরস উৎসবে এখানে বসে বড় একটি মেলা। ঐ মেলার নাম এলার মেলা। পীরের নাম পীরপাল। প্রতি বৃহস্পতি বারে বিশেষ উৎসব হয়। হিন্দু মুসলিম সবাই যোগ দেয়।

৬। ব্রত পূজাদি—

গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপূজো করে। এছাড়া ষষ্ঠী পূজা এবং মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতও পালন করে মেয়েরা।

৭। অর্থনীতি—

গ্রামে রয়েছে নদীয়া জেলা গ্রামীন ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এদের অবদান কম নয়।

গ্রামটি মূলত, কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও অনেকে ব্যবসা এবং চাকুরীও করে চলেছেন।

৮। প্রাচীন ইতিহাস ও স্থাপত্য—

হাঁসপুকুরের প্রাচীন ইতিহাস যেটুকু জানা যায় তাতে অনুমান করা যায় এটি ছিল একটি বৌদ্ধ গ্রাম। সেই সময়ে এর নামছিল 'হংসপুস্কর'। এখনো বৌদ্ধ বিহার বা উপাসনাগারের দেয়াল চোখে পড়ে মুসলমান পাড়ায় দীঘির বুকে ও ধর্মানুষ্ঠানের স্থানে। ইটগুলো এক ইঞ্চি চওড়া ও ছয় ইঞ্চি লম্বা প্রাচীন ইট। দেয়াল গাঁথা হয়েছে চুণ সুড়কি এবং কাদা দিয়ে।

দীঘির পাড়ে যে দেয়ালটি আজো খাড়া আছে সেটির প্রাচীনত্ব বিস্ময় জাগায়। ঐ দেয়ালের পূর্ব পাড়েও পড়ে আছে দেয়ালের ধ্বংসস্তুপ। দেয়ালের গাঁথনি চলে গেছে মাটির গভীরে। এত চওড়া দেয়াল চোখে পড়েনা সহজে। তবে অনেকে মনে করেন ঐ সব প্রাচীর বা স্থাপত্য নিদর্শন আসলে নীলকুঠীর নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। এই এলাকায় নীল কুঠীর অবস্থানকে অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হাতিশালা নামে গ্রাম

১। পরিচিতি—

কৃষ্ণনগর থেকে যে রাস্তাটা করিমপুরের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার ওপরেই বড় আন্দুলিয়া ছাড়িয়ে পড়বে শোণপুকুর। শোণপুকুরে নেমে ভাঙা চোরা ইটের পথে হোঁচট খেতে খেতে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে যাবার পরেই পড়বে হাতিশালা গ্রাম। বিগত বন্যায় রাস্তা বেহাল হলেও সারাবার লক্ষ্মণ নেই। অথচ একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই চলেছে।

তবে রাস্তার হাল যত করুণই হোক না কেন কষ্ট করে যদি একবার ঐ রাস্তা ধরে ঘাটে পৌঁছানো যায় তবে কিন্তু মন ভরে যাবে প্রশান্ত জলঙ্গীর তীরে দাঁড়িয়ে। সবুজ গাছের ডালে ডালে পল্লবে পল্লবে সবুজের মায়ায় হৃদয় যাবে হারিয়ে দূর দিগন্তের নীলে। চোখে লাগবে স্বপ্নের ছোঁয়া। দখিনা বাতাসে উতল হবে হৃদয়। ঝিলিমিলি জলঙ্গীর বুকে ভেসে মন চলে যাবে দূর থেকে দূরে—অজানা স্বপ্নের দেশে। জলঙ্গীকে মনে হবে বুঝি কোন স্বপ্নিল নদী।

(ক) নদীর ঘাট—হাতিশালার ঘাটে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যাবে। পুরনো দিনের কথা মনে পড়বে। চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে নাউ বেয়ে কোন মাঝি। কানে আসবে—

—"ও পরাণের মাঝিরে,
কুন্ বা দেশে বাড়ীরে
তোর—কুন্ দিকেতে যাও ?
সবুজ বুকে সবুজ সে নাউ
কুথায় বেয়ে যাও ?
এই ঘাটেতে নাউ ভিড়িয়ে
মনের কথা কও।"..........

মনে পড়বে প্রাচীন দিনের প্রাচীন কথা। ছায়া সুনিবিড় বাংলার গ্রামের স্মৃতি ব্যাকুল করবে হৃদয়। দখিনা বাতাসে মনের ভিতরটা কেমন যেন আকুলি ব্যাকুলি করবে। শ্যামলী বাংলার নরম কোমল ছবি হৃদয়ে দেবে দোলা। মনে হবে সেই প্রাচীন বাংলার ছবি যেন স্থির হয়ে আছে আজো এই হাতিশালার জলঙ্গীর তীরে—বহতা নদীর মায়ায়—সবুজে সবুজ হয়ে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায়।

নদীর ঘাট ছেড়ে গ্রামে ঢুকলেই অবশ্য মনটা বিকল হয়ে যাবে রাস্তা ঘাট দেখে। যদিও সুদৃশ্য পঞ্চায়েত অফিসটা বৈভবের সাক্ষ্য দেবে বাস্তবে তাদের কাজ কিন্তু প্রাসাদোপম সুদৃশ্য অট্টালিকার সঙ্গে সঙ্গতি বিহীনই মনে হবে। এই বৈসাদৃশ্যে মনে একটু ব্যথাও লাগবে '

(খ) নামকরণ—এই হাতিশালা গ্রামটা কিন্তু বেশ প্রাচীন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলেও এই গ্রামটি বেশ পরিচিত ছিল। এই গ্রামের নামকরণ নিয়ে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে

তাহলো—'এইখানে নাকি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের 'হাতিশালা' ছিল এবং সেই সূত্রেই এই গ্রামের নাম হয়ে যায় হাতিশালা।'

কিন্তু এই মতের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এই ধরনের লোকশ্রুতি শান্তিপুর-দিগনগরের কাছে অবস্থিত হাতিশালা সম্পর্কেও শোনা যায়।

কোন না কোন সময়ে রাজাদের হাতি হয়তো এই স্থানে বাঁধা থাকতেও পারে এবং সেই সূত্রেই হাতিশালা নামের উৎপত্তি হয়ে ও থাকতে পারে তবে স্থায়ী হাতিশালা এই জায়গায় ছিল না বলেই মনে হয় কেননা কৃষ্ণনগর থেকে এই হাতিশালার দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার।

(গ) জমিদার বাড়ী—তবে এই গ্রামের জমিদার চ্যাটার্জী বাবুদের এক সময়ে খুবই প্রতিপত্তি ছিল। শোনা যায় তাঁরা পরিখাও কাটিয়েছিলেন গ্রামের চারদিকে। সেই জমিদারদের হাতিঘোড়া সবই ছিল। তাদের হাতিও বাঁধা থাকতো হাতিশালে। সেই সূত্রেও গ্রামের নাম হাতিশালা হয়ে থাকতে পারে। তবে বর্তমানে গ্রামের জমিদারদের কেউই গ্রামে থাকেন না বললেই হয় বেশীর ভাগই কলকাতা, বোম্বাই ও দেশের অন্যান্য স্থানে থাকেন। বর্তমানে যাঁরা এখানে আছেন তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ।

(ঘ) শিক্ষা—এই গ্রামের হাইস্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ে আশে পাশের গ্রামে স্কুল ছিল না—এখানেই পড়তে আসতো সবাই। বর্তমানে শিক্ষার হার ভালই! হাতিশালা এবং মহেশনগর রাস্তার সঙ্গম স্থলে হাইস্কুলের পরিবেশটি কিন্তু দারুন। প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে দুটি। হাতিশালায় বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বাড়ীর ছেলে মেয়েরাই স্কুলে যায়। শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠছে এই নিভৃত পল্লীর অধিবাসীরা।

(ঙ) পূজা ও ব্রতাদি—

১। দুর্গা— একদা জমিদার বাড়ীতে খুবই ধুমধাম করে দুর্গা পূজা হতো। নবমীর দিন মোষ বলি হতো। বাজতো ১০৮টা ঢাক তুমুল কল রবে। তবে বর্তমানে ঐ জমিদার বাড়ীর সেই গৌরব নেই। পূজাও হয়না ঐ বাড়ীতে। যদিও বারোয়ারী পূজা হয় বেশ কয়েকটা।

২। কালীতলা— তবে হাতিশালার কালীতলার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে আশে পাশের বহু গ্রামে। কালীতলায় কিন্তু মাকালীর কোন মূর্তি নেই। সিঁদুর মাখানো পাথর খণ্ডকে দেবী জ্ঞানে পূজো করা হয়ে থাকে। কালীপূজোর দিন ঠিক মধ্যরাতে কালীপূজো হয় এখানে। এই পূজাকে বলে পাষাণ পূজো। ঐ সময়ে পাঁঠা বলিও দেওয়া হয়। রক্তে লাল হয়ে যায় সংলগ্ন কালীদহের জল। ছায়াময় শীতল পরিবেশ। বট-অশথ আর ডুমুর গাছের ছায়ায় ঘেরা পরিবেশ। অন্য সময়েও এই কালীতলায় এলে মনশান্ত হয়ে যায়।

৩। ব্রতাদি—এই গ্রামের মেয়েরা যে সব ব্রতাদি পালন করে থাকে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ইতুপূজা, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, কাঁচাঘট পূজা, শীতল ষষ্ঠী, অরন্ধন ব্রত ও ঘাট পূজা।

ইতুপূজা—(ক) ইতুপূজো চলে গোটা অগ্রহায়ণ মাস ধরে। ঘট বসিয়ে ছোট ছোট মেয়েরা পূজো করে। তারা মন্ত্র বলে—

১। 'বারো মাসে তের পার্বণ।
অঘ্রাণে হয় ইতু পূজো।
মাথার চুল বনের ফুল।
ইতু ঠাকুরুণ নমো নমো।"

ইতু পূজো করলে কি ফল হয় ?—

২। (ক) অপথে পথ হয়।
আঘাটে ঘাট হয়।
আই বুড়োর বিয়ে হয়।
বন্ধ্যার পুত্র হয়।

খ। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা—এই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করলে সংসারের মঙ্গল হয় তাই মেয়েরা এই ব্রত পালন করে থাকে। এই ব্রত পালনের সময় মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য সূচক কাহিনীও বলা হয়।

গ। কাঁচাঘট পূজা—সাধারণত শীতকালে এই কাঁচা ঘট পূজো হয়ে থাকে। কাঁচা ঘটে সর্ষে এবং মূলো সাজিয়ে পূজো করা হয়। ব্রতিনীরা সারা দিন উপোসী থেকে এই পূজা করে এবং পূজাশেষে আতপচাল সিদ্ধ করে হবিষান্ন খায়। —কৃষির উন্নতি কামনাই এই পূজার উদ্দেশ্য।

ঘ। ঘাট পূজা—নদীর প্রতি শ্রদ্ধা জানা নোই এই ঘাট পূজোর মূল উদ্দেশ্য। মেয়েরা কূলোয় ফুল সাজিয়ে নিয়ে দল বেঁধে সবাই যায় নদীর ঘাটে এবং নদীকে প্রণাম করে ও পূজো করে। সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এই ঘাট পূজা এই হাতিশালায়।

৪। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

(ক) আবৃত্তি ও গান—বিভিন্ন পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে আবৃত্তি ও গানের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী বেশ মর্য্যাদার সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যেগ ও ব্যবস্থাপনায়।

কখনো কখনো নাটকও মঞ্চস্থ হয়ে থাকে ক্লাবের উদ্যোগে।

(খ) বোলান—গ্রামের বোলান গানের দলও আছে। চৈত্রমাস ধরে চলে বোলান গান। তবে পার্শ্ববর্তী শিবপুর বা চাঁদের ঘাটের মতো তত নাম নেই হাতিশালার বোলান দলের।

(গ) বাউল গান—বছর কয়েক ধরে এখানে শুরু হয়েছে ‘বাউল মেলা’। তিনদিন ধরে চলে এই বাউল মেলা। দূর দূরান্ত থেকে বাউলরা আসে এখানে। দিন রাত ধরে চলে বাউল গান। স্থানীয় জনগণ ছাড়াও আশেপাশের গ্রাম থেকেও আসে হাজার হাজার শ্রোতা। বিভিন্ন মঞ্চে চলে বাউলদের গান। নতুন নতুন প্রতিভার সন্ধানও মেলে এই মেলায়। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও হয়। পুরস্কার বিতরণ করা হয় শেষ দিনে। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আসেন এই মেলায়।

রঘুনাথপুরে

১। পরিচিতি—

হোগলবেড়িয়া থানার সীমান্ত গ্রাম এই রঘুনাথপুর। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় এই গ্রামের ওপর চাপ পড়েছিল ভীষণ। ওপার থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু তখন ভীড় করেছিল এপারে। যুদ্ধের সময় ওপার থেকে প্রচুর গোলাগুলি এসে পড়েছিল এপারে। ক্ষয় ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। গ্রামবাসীরা পালিয়েছিল আশে পাশেব গ্রামে। সেই যুদ্ধের দিনগুলোর স্মৃতি গ্রামবাসীরা আজো স্মরণ করে আতঙ্কের সঙ্গে। এক বিবল ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই রঘুনাথপুর গ্রাম এবং তার অধিবাসীরা।

সীমান্তবর্তী গ্রাম হওযায় চুরি ডাকাতি লেগেই আছে। সংঘর্ষও হয়। মারাও পড়ে অনেকে। তবে বর্তমানে ডাকাতির সংখ্যা কমছে।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার মান যে খুব উন্নত তা বলা যায় না। তবে গ্রামে শিক্ষিতের হার বাড়ছে ক্রমেই।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা গ্রামের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। রাস্তা ঘাটের উন্নতির জন্য তারা সর্বদাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রামে তৈরী হয়েছে গ্রাম রক্ষী বাহিনী। এই বাহিনীর প্রচেষ্টায় শান্তি শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। চুরি ডাকাতির সংখ্যাও কমে আসছে।

২। ব্রত পূজাদি—

রঘুনাথপুরের মেয়েরা যেসব পূজা ও ব্রতাদি পালন করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইতুপূজা, জয় চণ্ডীর পূজা, ষষ্ঠী পূজো প্রভৃতি। এগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে নির্দিষ্ট মাস ও তিথি মেনে।

এই গ্রামে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা বেশ ধুম ধাম করেই হয় নদীয়ার অন্য প্রান্তের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

এছাড়া শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসার ভাসান বা ঝাপানও হয়ে থাকে। তবে এই মনসার পূজা ও ঝাপানে বর্তমানে ভাঁটা পড়েছে। এছাড়া নবান্ন ও পৌষ পার্বণও করা হয়ে থাকে।

৩। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—

এই গ্রামে যাত্রা নাটক এবং নানা ধরণের বিচিত্র অনুষ্ঠান চলে প্রায় সারা বছর ধরেই। তবে অনুষ্ঠানের সংখ্যা শীতকালেই বেশী হয়।

মনসা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা ও দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে গ্রামে যাত্রা ও নাটকের আসর বসে। ঐ সব আসরে শুধু যে এই গ্রামের দর্শক শ্রোতাই থাকে তা কিন্তু নয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম এমনকি ওপার থেকেও প্রচুর দর্শক শ্রোতা আসে।

কালী পূজার সময় বাউল গান এবং কবি গানের আসর চলে তিন চার দিন ধরে। প্রচুর লোকের ভীড় হয় ঐ সব অনুষ্ঠানে।

গ্রামে যাত্রাদল আছে। পাঁচ ছজন খুবই ভাল অভিনয় করেন। কলকাতার বড় বড় যাত্রাদলে ডাকও পেয়েছেন এদের কেউ কেউ।

গ্রামে নাটকের দলও আছে। তবে এঁরা সামাজিক নাটকই করে থাকেন বেশী। মাঝে মাঝে কেষ্ট যাত্রা এবং গুণাই যাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এছাড়া আবৃত্তি , নাচ ও গানের প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় বছরের বিভিন্ন সময়। ছেলে মেয়েদের পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয় নিয়মিত।

সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়ায় এই গ্রামের বিভিন্ন লোকাচার এবং ব্রত পার্বণে ওপার বাংলার সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছে লক্ষ্য করা যায়।

লোক সঙ্গীতের মধ্যে বোলান গানের তেমন প্রচলন না থাকলেও ভাটিয়ালী গানের প্রচলন আছে। আছে বাঁশের বাঁশীর মন কাড়ানো সুরের প্রতিযোগিতাও।

সত্যি কথা বলতে কি ছায়া সুনিবিড় রঘুনাথপুর গ্রামটি আবহমান কালের বাংলার গ্রামেরই প্রতিচ্ছবি।

হৃদয়পুরে হৃদয় দিয়ে

(ক) পরিচিতি—

সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম এই হৃদয়পুর বহু ঘটনা বহুল ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। হৃদয়পুরের প্রাচীন বট বৃক্ষ কিংবা আম গাছগুলো যদি কথা বলতে পারতো তাহলে কতো সব কাহিনীই না শোনা যেতো। জানা যেতো কতোসব বিস্মৃত দিনের কতো না ইতিহাস। কিন্তু হায় ওরা যে কথা বলে না। মনের ভাব ব্যক্ত করার ভাষা যে নেই ওদের। ওরা শুধুই নীরব দর্শক মাত্র।

এই গ্রামের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্বদিক বাংলা দেশ দিয়ে ঘেরা। পশ্চিম দিকেই শুধু ভারতের বেতবেড়িয়া গ্রাম। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে গ্রামে। আছে ডাকঘর, গীর্জা ও বি. এস. এফ ক্যাম্প। শিক্ষার হার শতকরা ৫৪।

বর্তমানে এই গ্রামটি চাপড়া থানার অধীন। স্বাধীনতার পূর্বে এই গ্রামটি ছিল চাপড়া ও মেহেরপুর থানার সংযোগ রক্ষাকারী গ্রাম। স্বাধীনতার পূর্বে কৃষ্ণনগর থেকে মেহেরপুর পর্য্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা ছিল। এই গ্রামেরই উত্তরে বিখ্যাত মুজিব নগর গ্রাম (বৈদ্যনাথতলা)।

(খ) নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে তাহলো—বহু দিন পূর্বে এই গ্রামটি ছিল 'জলা যায়গা। আগাছায় পূর্ণ ছিল চারিদিক। একদিন ঐ বনজঙ্গলের পথ দিয়ে হৃদয় মণ্ডল বলে এক ব্যক্তি বলদের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে উত্তরদিক থেকে সপরিবারে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করেন যতদূর পর্য্যন্ত তাঁর পশুগুলো চলতে পারবে ততদূর পর্য্যন্ত যাবেন তিনি এবং যেখানে থামবে পশুরা সেখানেই বসতি স্থাপন করবেন তিনি। শোনা যায় তার বলদগুলো নাকি ক্লান্ত হয়ে এই গ্রামেই থামে বেত বাগানের পাশে। প্রতিজ্ঞানুযায়ী হৃদয় মণ্ডল ওখানেই বসবাস করতে শুরু করেন এবং গ্রামের নাম রাখেন নিজের নামে হৃদয়পুর। তবে এই ঘটনা কতো দিন আগে ঘটেছিল তা অবশ্য বলা যায় না। বর্তমানে এ গ্রামের বাসিন্দারা প্রায় সবাই বহিরাগত। এখানে যে সব ব্রাহ্মণরা বাস করতেন তাদের কেউ আজ এ গ্রামে নেই। তবে হৃদয় মণ্ডলের বংশধরদের কেউ কেউ অবশ্য এখনো এই গ্রামে বসবাস করছেন।

(গ) প্রাক ইতিহাস—

বর্তমানের হৃদয়পুর গ্রামটি স্বাধীনতার পূর্বে ছিল 'সোনাপুর' এ বং ভবের পাড়া গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত এবং নাম ছিল মাঝের পাড়া। স্বাধীনতার পরে হিন্দু প্রধান হৃদয়পুর অংশটি ভারতে পড়ে এবং হৃদয়পুর পৃথক গ্রাম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

(ঘ) বিদ্যালয় ও গীর্জা—

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টির শতবর্ষ পালিত হয়েছে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে। ঐ বিদ্যালয়টি প্রথমে ছিল গীর্জায়। সেখানে প্রতি রবিবার বিশেষ প্রার্থনা হতো এবং অন্যান্য দিনগুলোতে পড়াশুনা হতো। কোন এক ক্যাথলিক ফাদার নাকি প্রথমে ঐ স্থানে চালাঘর তৈরী করে খৃষ্টীয় প্রার্থনা শুরু করেন। পরে স্থানীয় জনগণের সাহায্যে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বর্তমান বাংলাদেশের ভবের পাড়ায় খৃষ্টীয় গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই গ্রামে ক্যাথলিক গীর্জার গোড়াপত্তন হয়। বর্তমান গীর্জাটি সেই অতীত স্মৃতি বুকে নিয়েই আজ এতবড় উপাসনাগার হয়ে উঠেছে।

(ঙ) ১৯৭১ এর হৃদয়পুর—

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের পাক-ভারত যুদ্ধের স্মৃতি আজো জ্বল্‌জ্বল্ করে হৃদয়পুরের মানুষের মনে। সেই সময়ে সীমান্তের বাধা ভেঙে হাজার হাজার উদ্বাস্তুর ভীড়ে জনজীবন হয়ে উঠেছিল দুঃসহ। তার পরে বৈদ্যনাথ তলা তথা মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। সেই সময় হৃদয়পুরে সেনা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতিতে যে উত্তেজক্ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, দেখা দিয়েছিল যে উন্মাদনা তা আজ এত দিন পরে ঠিক অনুমান করাও কঠিন।

(চ) লোকসংস্কৃতি—

হৃদয়পুর গ্রামটিতে একদা বহু সংস্কৃতিবান লোকের বাসছিল। কিন্তু দেশ ভাগের পরে তাদের অনেকেই অন্যত্র চলে যায় সীমান্তের নানা অসুবিধার জন্য।

(১) যাত্রা—

এক সময় যাত্রার খুব প্রচলন ছিল এই গ্রামে। অবিভক্ত বাংলায় একবার নাটোরের রাজবাড়ীতে যাত্রার প্রতিযোগিতায় হৃদয়পুরের যাত্রাদল হাতি জিতেছিল। কিন্তু হাতির খোরাক যোগানের ভয়ে সেই হাতি আর যাত্রাদল গ্রামে নিয়ে আসেনি।

(২) বৈদ্যনাথতলা ও বৈদ্যনাথের পূজা—

হৃদয়পুরের পুরনো বটগাছ তলাতেই বর্তমানে বাবা বৈদ্যনাথের পূজো হয়ে থাকে বৈশাখী সংক্রান্তিতে। ঐ উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে। সারাদিন ধরে চলে পালা কীর্তনও।

বাবা বৈদ্যনাথ আসলে শিবের প্রতিভূ। বৈশাখ মাসের প্রথম থেকে শুরু হয় এই বৈদ্যনাথের পূজা। বটবৃক্ষে স্নানের পরে প্রতিদিন জলদানের মাধ্যমে শুরু হয় বাবা বৈদ্যনাথের পূজা।

বৈদ্যনাথ সম্বন্ধে এই অঞ্চলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহলো বৈদ্যনাথ ছিলেন এক অতি উচ্চস্তরের সাধক। অবিভক্ত বাংলার বর্তমান মুজিব নগরেই ছিল বাবা বৈদ্যনাথের সাধনার স্থান। ঐখানে বাবা বৈদ্যনাথ ধাম নামে এক বিরাট হাট বসতো আগে। বৈশাখ সংক্রান্তিতে বসতো বিরাট মেলা। ঐ মেলা ছিল এই অঞ্চলের বৃহত্তম মেলা। দেশ ভাগ হবার পরে ঐ হাটের একাংশ চলে আসে হৃদয়পুরে। অন্য অংশ থেকে যায় ওপারে ভবের পাড়ায়। দুঃখের বিষয় হৃদয়পুরের হাটটি বন্ধ হয়ে যায় কিছু দিন চলার পরেই। তবে ওপারে ভবের পাড়ার হাটটি চলছে আজো। তবে মূল বৈদ্যনাথ তলায় বর্তমানে বাংলাদেশ রাইফেলসের ক্যাম্প হয়েছে।

তবে বর্তমানে হাট না বসলেও বৈদ্যনাথের পূজো ও মেলা কিন্তু চলছে আজে সারাটা বৈশাখ মাস বটবৃক্ষে জলদান করে সংক্রান্তির দিন ঐ গাছে বাঁধা হয় লাল সূতো আকন্দ ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয় বটগাছটা। নাপিত আসে। আসেন পুরোহিত। শুরু হয় গাছ পূজা। ঐ দিন সারাগ্রামে শুরু হয় নামসংকীর্তন। বাড়ী বাড়ী চলে বাতাসা বিতরণ। বিকালে নামকীর্তন করতে করতে সাতবার ঐ বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করা হয়। ঐ সময়ে যে গান করা হয় তার কথাগুলো হলো—

১। —"গোপাল এলো, গোপাল এলো, গোপাল এলরে।
চাঁদ মুখে ননী দিয়ে ঘরে তুলে নে।

শঙ্খ ঘন্টা বাজিয়ে ওরে ঘরে তুলে নে।
ওরে সবাই মিলে ঘরে তুলে নে।''

বাবা বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে ভবের পাড়া ও হৃদয়পুর অঞ্চলে। বহু কঠিন কঠিন রোগও সেরে যায় বাবার দয়ায়।

প্রচলিত একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে 'কেষ্ট' নামে এক ব্যক্তির একবার কুষ্ঠ রোগ হয়। গ্রামবাসীরা তাকে পরিত্যাগ করে। মনের দুঃখে কেষ্ট তখন লোকালয় ছেড়ে বর্তমান বটগাছটার (বৈদ্যনাথ) পাশে যে গভীর জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। ঐ জঙ্গলে ছিল বহু হিংস্র বাঘ। কেষ্ট ভয়ে ভয়ে চোখ বন্ধ করে এই বুঝি কোন বাঘ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়ে নেয় তাকে। ভয়ে ভয়েই সময় কাটে তার। আর মনে মনে ভাবতে থাকে 'আমার এই দেহতো মানুষের কোন কাজেই লাগবেনা বাঘের ভোগে যদি লাগে বরং তাইই লাগুক।' ভাবতে ভাবতে কখন যেন সে ঘুমিয়েও পড়ে এক সময়।

তার পরে হঠাৎই এক সময় কার যেন জলদ গম্ভীর স্বরে ঘুম ভেঙে যায় তার। চেয়ে দেখে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। দেহটা যেন শীতল হয়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গেই। দূর হয়ে গেল সব জ্বালা যন্ত্রণা।

—কে আপনি প্রভু ? জোড় হাতে জানতে চায় কেষ্ট।

—শোন্ তবে, আমি বাবা বৈদ্যনাথ। আজ বৈশাখ সংক্রান্তি। চেয়ে দ্যাখ তোর ব্যধি সেরে গেছে পুরোপুরি।

—একি ? হ্যাঁ, তাইতো। তাইতো প্রভু। আপনার অসীম দয়া ঠাকুর। অসীম দয়া—কাঁদতে থাকে কেষ্ট। দুচোখে নামে শ্রাবণের ঢল।

—শোন্, এই কাহিনী তুই প্রচার করবি গ্রামে। বাবা বৈদ্যনাথের পূজা করে যেন গ্রামবাসী সারাটা বৈশাখমাস ধরে। তাহলে মঙ্গল হবে সবার। পূজা শেষে ফলমূল সহযোগে চিড়ে ফলার খাবে সারাদিন উপোষ থাকার পরে।''—কথা শেষ হতেই বটের গায়ে অদৃশ্য হয়ে যান সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ তথা বৈদ্যনাথ ঠাকুর।

চমক ভাঙে কেষ্টর। ছুটতে ছুটতে সে চলে আসে লোকালয়ে। প্রচার করে সেই অলৌকিক ঘটনা। তার পর থেকেই শুরু হয়ে যায় বৈদ্যনাথের পূজার্চনা। সে পজো চলে আসছে আজো।

বৈদ্যনাথের পূজা হয় শিব মন্ত্রেই। শিবেরই প্রতিভূ উনি।

বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে হৃদয়পুরের চারচারা পাড়াতে চলছে 'যোগাদ্যার পূজা। একটি বট গাছকেই যোগাদ্যার প্রতীক ধরে নিয়ে পূজা করা হয়ে থাকে ঐ বৈশাখী সংক্রান্তিতেই। এই 'যোগাদ্যা' আসলে মা দুর্গাই।

হৃদয়পুরের বৈদ্যনাথ আসলে লৌকিক দেবতা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তাঁর পূজার মন্ত্র শিব মন্ত্র হলেও কৃষ্ণনামের প্রচারই হয় বেশী নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে।

প্রধানত দুটি দলে গান গায় ঐ পূজার দিন বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করতে করতে। একটি দলের গানে বলরামের আর্তি শোনা যায়। সে অনুরোধ করে—

১। ত্বরাই দেমা গোপাল সাজায়ে
বিনে নীলরতন গোষ্ঠে যায় না গোধন।
ঐ দ্যাখো মাগো যতেক রাখাল দল
আছে পথ চাহিয়ে।
প্রাণের কানাই বিনে
কতো কষ্ট পাইগো মা মনে

দিবসে আঁধার দেখিগো নয়নে।
কি আর দুখের কথা বলি মা তোর সনে—
গোষ্টেতে গাভীগণ খায় না তো তৃণ জল।
ঝরে নেত্রে বরষার ধারা অবিরল।
তাই বলি মাগো ত্বরায় দে সাজায়ে
গোঠে যাই গোপালকে নিয়ে।

(ইন্দুভূষণ সমাদ্দার)

দ্বিতীয় দল তখন মা যশোদার জবানীতে গায়—

২। যা যা তোরা কানাইকে নিয়ে যারে—
তোরা রাখিস্ তাকে যতন করে।
কংসের চর ঘোরে চাবিধারে
তাই ভেবে মন সদাই কাঁদে যেরে।
কানু দিয়ে মন কাঁপে থর থরো।
শোনরে ও হলধর
সদাই রাখবি তাকে যতন করে
কংসের চর নাজানি কখন ধরে।

(নিষ্কলঙ্ক চ্যাটার্জী)

৩। ধর্মচেতনা—

হৃদয়পুরে বর্তমানে হিন্দু মুসলিম এবং খৃষ্টান তিন সম্প্রদায়ের লোকই বসবাস কবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন এই গ্রামের অধিবাসীরা।

গ্রামের গীর্জায় বড় দিনের উৎসব বেশ ধুমধাম করেই হয়ে থাকে। বাইরের থেকে সাহেবরাও আসেন ঐ সময়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু লোকজনও এখানে আসে বড় দিনের উৎসব দেখতে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার এই গ্রামের খৃষ্টধর্মীদের বেশীর ভাগই ধর্মান্তরিত হয়েছে মুসলমান ধর্ম থেকে। অবশ্য সীমান্ত এলাকায় এই ঘটনার পিছনে কেউ কেউ রাজনীতিরও গন্ধ পেয়ে থাকেন। তবে সেই রাজনীতি প্রাদেশিক না আন্তর্জাতিক তা অবশ্য বলা যায় না।

৪। নীলচাষ ও নীলকুঠী—

হৃদয়পুরের আশে পাশে নীলকুঠী থাকলেও এগ্রামে নীলকুঠী বা নীল চাষের তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নীলকর সাহেবদের ভূসম্পত্তি এই সব অঞ্চলে কিনে ছিলেন পালচৌধুরীরা। তবে এই গ্রামের জমিদাররা হলেন ব্রহ্ম রায় উপাধি ধারী। এই গ্রামে নীল বিরোধী আন্দোলন বা স্বাধীনতা আন্দোলনও হয়নি। এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন যে ইংরেজদের সঙ্গে এই জমিদারদের বেশ ভাল সম্পর্কই ছিল।

৫। আর্থিক ও সামাজিক দিক—

কৃষি নির্ভর গ্রাম। তবে সীমান্ত লাগোয়া বলে চোরাচালান কারীদের রমরমা এই গ্রামে। সীমান্তরক্ষীদের জাগ্রত চোখ—কাঁটা তারের বেড়া কিছুতেই থামাতে পারছেনা স্মাগলারদের অগ্রগতি।

অবস্থাপন্ন এবং গুণী মানীরা সুযোগ পেলেই চলে যাচ্ছেন শহরে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়ে। ফলে সংস্কৃতিবান ও শিক্ষিত লোকের বড়ই অভাব আজ হৃদয়পুরে। চিকিৎসা ব্যবস্থাও অবহেলিত। হাতুড়ে ডাক্তারদের ব্যবসা চলছে বেশ ভালই।

দুর্গা পূজা, কালীপূজা হলেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি এ গ্রামে প্রায় হয় না বললেই চলে।

কুষ্ঠিয়া

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের দক্ষিণেই পড়বে কুষ্ঠিয়া গ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব দিকে চাঁদের ঘাট এবং পশ্চিমে বার্ণিয়া। গ্রামের লোক সংখ্যা তিন হাজারের মতো। গ্রামে রয়েছে দুদুটো প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের শিক্ষার হার প্রায় চল্লিশ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালই। চাঁদের ঘাট—বার্ণিয়া—কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরের সঙ্গে বাসে যোগাযোগ রয়েছে। গ্রামের ভিতরেও রয়েছে ইট বাঁধানো রাস্তা।

২। নামকরণ—

এই গ্রামের নাম ছিল আগে গোপীনাথ বাস। অর্থাৎ গোপীদের নাথের বাসস্থান। শোনা যায় সেই সময়ে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল এই গ্রামে। কিন্তু বিগত সেটেলমেন্টের সময় এই গ্রামের নাম রাখা হয় কুষ্ঠিয়া। এই নামকরণের পিছনে রয়েছে তখনকার দিনের ভয়াবহ কাদা এবং জলজমা রাস্তাঘাটের ইতিহাস। এখনো কুষ্ঠিয়া গ্রামে প্রচলিত আছে সেই অতীতের স্মৃতি বিজড়িত এই প্রবাদ বাক্যটি—

১। —"কাদা-খোঁচা বৃষ্টি।
তিন নিয়ে কুষ্ঠি।"

৩। ধর্মাচরণ ও মন্দির—

(ক) ধর্মাচার—

কুষ্ঠিয়া বাসীরা খুবই ধর্মপরায়ণ। হিন্দু ধর্মের লোকেরাই বসবাস করেন এই গ্রামে। দুর্গা, কালী ও সরস্বতী পূজা যেমন ধুম ধাম করে হয় তেমনিই গৃহে গৃহে চলে লক্ষ্মী পূজা। দোল উৎসবও হয় বেশ সমারোহ করেই। জন্মাষ্টমীর উৎসবও পালিত হয় এ গ্রামে।

(খ) গাজন—

চৈত্র মাসে গাজনের উৎসবও হয় যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে। সন্ন্যাসীও হয় অনেকে। বোলান গানও হয়ে থাকে। হয় পাঁচালী গানও। মেলা বসে ঐ উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য।

(গ) ধর্মরাজের মন্দির—

এই প্রাচীন গ্রামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি হলো ধর্মরাজের মন্দির। প্রাচীন ইটের মন্দির। ধর্মরাজ নিত্য পূজিত হন এই মন্দিরে। কোন বিগ্রহ নেই মন্দিরে। একটি প্রস্তর খণ্ডেই পূজিত হন তিনি। বুদ্ধ পূর্ণিমাতে হয় বিশেষ পূজা। ঐ সময়ে সন্ন্যাসীরা ঠাকুর মাথায় নিয়ে গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ করে। মুখে ধ্বনি দেয়—

২। "জয় ধর্মরাজের জয়।
জয় নিরঞ্জন জয়।

নদিন ধরে সন্ন্যাসীরা নিয়ম মেনে ফলমূল ও হবিষান্ন খেয়ে শুদ্ধ চিত্তে ধর্মের ব্রত পালন করে ও পূজা করে।

ধর্মরাজের পুরোহিত বা পূজারী কিন্তু ব্রাহ্মণ নন। তিনি মাহিষ্য সম্প্রদায়েরই কোন ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

তবে ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজার সময় যারা সন্ন্যাসী হয় তাদের মূল বা প্রধান সন্ন্যাসী কিন্তু হয় ঘোষ সম্প্রদায়ের কোন এক জন বিশেষ ধার্মিক ব্যক্তি। ঐ মূল সন্ন্যাসীই মাথায় করে ঠাকুর নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করেন। অন্য সন্ন্যাসীরা তাঁকে অনুসরণ করে।

বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজার সময় যে মেলা বসে সেই মেলায় হাজার হাজার লোকের ভীড় হয়। ঢাক বাজে। আগে নাকি পশু বলিও হতো তবে এখন আব পশু বলি হয় না। কিন্তু মেলায় প্রচুর দেকোন বসে। নাগর দোলাও থাকে।

এই অঞ্চলে ধর্মরাজের মান্যতা আছে খুবই। ধর্মরাজের কৃপায় বহু জটিল রোগ সেরে যায় অনেকের। এখান থেকে হাত পা ভেঙে গেলে তা জোড়া লাগার ওষুধ যেমন দেওয়া হয় তেমনি বাত ও অন্যান্য রোগের অব্যর্থ ওষুধও দেওয়া হয়। দূর প্রান্ত থেকেও বহু লোক আসে এখানে ওষুধ নিতে।

অশত্থেব ছায়া ঘেরা পরিবেশে ধর্মরাজের এই মন্দিরটি এই কুষ্ঠিয়ার গর্ব।

প্রকৃতপক্ষে এই ধর্ম রাজ হলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। জলঙ্গীর তীরে তীরে নদীয়ার এই অংশে একদা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাস। পার্শ্ববর্তী হাঁস পুকুরেও বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন আছে দীঘির বুকে এবং মুসলিম পাড়ার ধর্মীয় স্থানে। ঐ গ্রামের নাম ছিল তখন 'হংস পুষ্কর'। কে জানে 'গোপীনাথ বাসের' পূর্ব নাম বুদ্ধবাস বা ঐ জাতীয় কোন বাস ছিল কিনা।

(ঘ) পঞ্চানন তলা—

কুষ্ঠিয়ার আরেকটি বিখ্যাত ধর্মীয় স্থান হলো পঞ্চাননতলা। এখানে নিয়ম মেনে পাঁচু ঠাকুরের পূজো হয়। শ্যাওড়া গাছের গোড়ায় পাঁচুঠাকুরের অধিষ্ঠান। তবে বাৎসরিক পূজোয় যেমন ধুমধাম হয় অন্য সময় তেমনটা হয় না। জৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমাতে বাঁধানো বেদীর ওপরে পাঁচু ঠাকুরের বিশেষ পূজো হয়। মূর্তি নেই। মাত্র এক খণ্ড পাথর আছে। ঐ পাথরখণ্ডে সিঁদুর লেপা আছে। পাশে আবার ত্রিশূলও পোঁতা আছে। সম্ভবত শিব এবং পাঁচু ঠাকুরকে অভিন্ন দেখানোর জন্যই এই ব্যবস্থা।

(ঙ) মনসা পূজা—

শ্রাবণ মাসে মনসার মূর্তি তৈরী করে পূজা করা হয়ে থাকে। ঝাপানও হয়। আগে মনসার ভাসান বা লখীন্দরের পালা গান হতো তবে এখন তেমন পালাগান আর হয় না বললেই চলে।

(চ) সৎসঙ্গ মন্দির—

কুষ্ঠিয়ার অন্যতম আকর্ষণ হলো সুদৃশ্য 'সৎসঙ্গের' মন্দিরটি। মন্দিরে নিত্য পূজার্চনা হয়ে থাকে। তবে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই। এই অঞ্চলে বর্তমানে বহু সৎসঙ্গী আছেন। শীতকালে যে বিশেষ পূজো হয় সেই পূজোয় হাজার হাজার ভক্তের সমাবেশ হয়। আনন্দবাজারে প্রসাদ পায় সকলেই। ঐ সময়ে দেওঘর থেকে অনুকূল ঠাকুরের বংশধরগণও আসেন এখানে।

(ছ) অন্যান্য ব্রত ও পূজাদি—

১। বিপত্তারিণী—

এই গ্রামে বিপত্তারিণী পূজা করে থাকে মেয়েরা। সাধারণত দুর্গামণ্ডপে মূর্তি তৈরী করেই বিপত্তারিণীর পূজো করা হয়ে থাকে।

২। ইতুপূজা—

অগ্রহায়ণ মাস জুড়ে ছোট ছোট মেয়েরা ঘট পেতে ইতুর পূজো করে থাকে।

৩। ষষ্ঠীপূজা—

এছাড়া গ্রামের ষষ্ঠীতলায় জৈষ্ঠমাসে মায়েদের ষষ্ঠীপূজায় উৎসাহও দেখার মতো।

৪। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চা—

(ক) ফুটবল ও ক্রিকেট—

গ্রামে খেলাধূলা বলতে ফুটবলের চর্চা খুবই ছিল এক সময়। বর্তমানে ফুটবলের স্থান নিয়েছে ক্রিকেট। তবে প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েরা খেলাধূলায় জেলায় নাম করেছে অনেকেই।

(খ) নৌকা বাইচ—

এই গ্রামের লক্ষ্মী পূজার সময় জলঙ্গীতে যে 'নৌকা বাইচ' হয় তা দেখার মতো। ঐ সময় জলঙ্গীর তীরে উৎসাহী দর্শকদের ভীড় দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। পুরস্কারও দেওয়া হয় বিজয়ীদের।

এই অনুষ্ঠানটি এ গ্রামের গর্বের অনুষ্ঠান।

(গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—

বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে গ্রামের ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। নাচ-গান ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতাও হয়।

গ্রামের ক্লাবের ছেলেরা কখনো কখনো নাটকও মঞ্চস্থ করে থাকে। তবে নিজস্ব যাত্রাদল নেই।

৫। আর্থিক চিত্র--

মূলতঃ কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও অনেকেই ব্যবসা ও চাকুরীর সঙ্গেও যুক্ত। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। টি . ভি. চলছে। আধুনিক সভ্যতার সমস্ত সুযোগ সুবিধাই পৌঁছে গেছে এই গ্রামে। এই অঞ্চলের অন্যতম উন্নত গ্রাম এই কুষ্ঠিয়া।

কুঠী পাড়া

১। নামকরণ—

নদীয়া জেলার অনেকগুলো কুঠী পাড়া আছে। এই সব পাড়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন দিনের নীল চাযের স্মৃতি। অতীত দিনের বহু অত্যাচার জুলুম ও হাহাকারের কাহিনী ঘুমিয়ে আছে এই কুঠী পাড়ার মাটিতে। ধ্বংস স্তুপে সুপ্ত আছে বহু বেদনার বহু রক্তাক্ত অধ্যায়।

এক জায়গায় প্রচুর ছাই ও কাঠ কয়লা পাওয়া গেছে। এখানে কোন বড় উনুন বা ভাঁটা ছিল বলে মনে করেন অনেকে। কুঠীপাড়ায় ছড়িয়ে আছে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের নানা কাহিনী। ছড়িয়ে আছে নানা সব ভৌতক কাহিনী। আজো নাকি জ্যোৎস্নারাতে ঘোড়ায় চড়ে খটা খট্ শব্দ তুলে চা বুক ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যায় কোন এক সাহেব কুঠী পাড়ার ধ্বংস স্তুপের ওপর দিয়ে। লোকে বলে ঐ সাহেব নাকি ঐ কুঠীর পাড়ারই এক কুঠিয়াল সাহেবের আত্মা। ঐ খানেই সমাধি ছিল তার। সম্ভবত তাঁর আত্মার তৃপ্তি হয়নি বলেই ঐ সাহেব আজো জ্যোৎস্নারাতে ঘোরে এই কুঠী পাড়ার ধ্বংসস্তুপে। কি যে খুঁজে বেড়ান ঐ সাহেব কে জানে?

২। পরিচিতি—

কুঠীর পাড়ার এক দিকে রয়েছে ভাগীরথী অন্য পাশে উজ্জ্বলনগর। কৃষি প্রধান গ্রাম। কৃষিই জীবিকার প্রধান উৎস। তবে গ্রামে ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত আছেন কয়েকজন। আবার চাকুরী করছেন কেউ কেউ।

৩। শিক্ষা—

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বেশ পুরনো। শিক্ষিতের হার অবশ্য বেশী নয়। মুসলিম প্রধান গ্রাম। গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা তেমন ভাল নয়।

তবে বিগত বন্যায় গ্রামের সব কাঁচা বাড়ী ভেঙে পড়ায় বর্তমানে সবই পাকা বাড়ী হয়েছে প্রায়। আসলে বিগত বন্যার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাই গ্রামবাসীদের বাধ্য করেছে পাকা বাড়ী তৈরী করতে।

৩। পরব—

ইদুজ্জোহা, মহরম ইত্যাদি যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে গ্রামে।

বগুলা

১। পরিচিতি—

এককালের অনাদৃত বগুলা গ্রাম আজ দ্রুত গঞ্জ ছেড়ে শহরের রূপ নিতে চলেছে। হু হু করে লোক সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রকৃতপক্ষে দেশ ভাগের পরই বগুলার লোক-সংখ্যা বাড়তে শুরু করে এবং দোকান পসার বাড়তে থাকে। আজ প্রায় শহরে পরিণত হতে চলেছে ছোট্ট বগুলা গ্রাম।

এখন বগুলায় কলেজ হয়েছে। তিনটি হাইস্কুল এবং একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষার হারও বেড়ে চলেছে দ্রুত। এখানে রয়েছে পোষ্ট অফিস, বিদ্যুতের অফিস, ভূমি সংরক্ষণ অফিস, রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক ও গ্রামীন ব্যাঙ্ক। রয়েছে দুটি পঞ্চায়েত অফিসও।

বগুলার গর্ব যেমন তার কলেজটি তেমনিই তার খ্যাতি হলো রেলস্টশনকে নিয়ে। রাণাঘাট হয়ে শিয়ালদহের সঙ্গে যুক্ত এই বগুলা স্টেশনটি।

বগুলার বাজারটিও বেড়েই চলেছে দিন দিন। সপ্তাহে দুদিন এখনো হাট বসে। দূর দূরান্ত থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতারা আসে এই বগুলার হাটে। কাঁচা শাক সব্জীর বিপুল আমদানি হয় এই হাটে। হাজার হাজার ক্রেতা বিক্রেতার ভীড়ে গম্ গম্ করে বগুলার হাট।

এখানে ব্যবসা ও চাকুরীর সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। বগুলার আশে পাশে রয়েছে প্রচুর কৃষি জমি। এখানে আছে বহু কৃষিজীবী মানুষও। তবে গঞ্জ থেকে দ্রুত লয়ে শহরের দিকে ধেয়ে চলার ফলে কৃষি জমিগুলো মানুষের বাসস্থানে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

২। ধর্মাচরণ—

বগুলায় রয়েছে বেশ কয়েকটা মন্দির। আছে কয়েকটা মসজিদও। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে বস বাস করেন। নিজ নিজ পথে ধর্মাচরণ করেন। যেমন এখানে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা, কালীপূজা হয়। জন্মাষ্টমীর উৎসব হয়, তেমনই যথাযথ মর্য্যাদায় ইদুজ্জোহা এবং মহরম ইত্যাদি উৎসবও পালিত হয়ে থাকে। কীর্তনে আর আজানের ধ্বনিতে বগুলার আকাশ বাতাস কম্পিত হয় প্রতি নিয়তই।

৩। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—

দ্রুত নগরায়নের দিকে ধাবিত হবার ফলে বগুলার সাংস্কৃতিক জীবন চর্যাতেও আসছে পরিবর্তন। এককালে যেসব পল্লীগীতি বা ভাটিয়ালী গানে আকাশ বাতাস নিত্য মুখরিত হতো আজ সেসব গান ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে। বাঁশীর সেই মন কাড়া সুরও আজ হারিয়ে যাচ্ছে কোথায় যেন।

নেই সেই আগের দিনের যাত্রা এবং পাঁচালী গানও। মনসার ভাসান যদিও শ্রাবণ মাসে হয় এখানে তবু সেই কৃষ্ণ যাত্রা বা রামায়ণ গান জমে না আর তেমন এখানে।

কবি গান বা তর্জার আসরও আর বসে না বড় একটা।

আসলে তীব্র জীবন সংগ্রাম কেড়ে নিয়েছে মানুষের উদ্বৃত্ত সময়। এখন অন্নচিন্তা চমৎকার। তাই আজ মাঝে মাঝেই বসে জলসা। আসে নামী দামী শিল্পীরা। আলো, বাজনা, নৃত্য ইত্যাদিতে জমজমাট হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

তবে এমন আসর বিশেষ কোন পূজা বা বাৎসরিক উৎসবের সময়ই বসে। তাছাড়া নাটক, আবৃত্তি, ক্যুইজ, নৃত্য ইত্যাদির বাৎসরিক প্রতিযোগিতা ও হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগও পরিচালনায়।

শীতকালে কলকাতার নামীদামী যাত্রা দলের যাত্রাও হয়ে থাকে বগুলার মেলার মাঠে বা মুক্তাঞ্চলে।

৪। ব্রতাদি—

মেয়েলি ব্রত উৎসবাদি কিছুকাল আগেও বেশ চালুছিল কিন্তু বগুলার মহিলা সমাজও দ্রুত আধুনিকতার ধাক্কায় আজ দিশে হারা। ফলে ইতুপূজা, জয়চণ্ডীর পূজা, ষষ্ঠী পূজা, শীতল ষষ্ঠীর পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান আজকাল আর বিশেষ দেখাই যায় না।

৫। মেলা—

বগুলার বিখ্যাত মেলা হলো এর শ্মশানকালীর মেলা। এই শ্মশান মেলাটি শুরু করেছিলেন শ্রীযুক্ত অঘোর গোঁসাই মহাশয়। এখনো ঐ শ্মশানের পশ্চিম পাড়ে ঐ সাধুর আশ্রমটি বর্তমান। শ্মশানের পূর্বের মাঠেই বসে মেলাটি।

মেলাটি চলে প্রায় এক মাস ধরে। নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, দোকান পাটে জমে ওঠে এই মেলাটি।

এই মেলার প্রধান আকর্ষণ হলো ৫১টি কালী পূজা।

মেলা কমিটির পরিচালনায় বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলছে মেলাটি বেশ কিছুকাল ধবে।

৬। পুতুল নাচ—

বগুলার পুতুল নাচেরও সুনাম আছে তবে দ্রুত এই অপূর্ব শিল্পকর্মটি উপযুক্ত অর্থ ও সহযোগিতার অভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৬। মৃৎশিল্প—

একদা মৃৎশিল্পের রমরমা ছিল এই অঞ্চলে। কিন্তু হাঁড়ি কলসী বর্তমানে আর কেউ কিনতেই চায় না। 'স্টেনলেস স্টিল' এর বাসনের চাহিদা যেমন বাড়ছে দ্রুত মাটির পাত্রাদির চাহিদাও তেমনি কমছে পাল্লা দিয়ে।

নন্দনপুরের পাশে

১। পরিচিতি—

নদীয়ার নন্দনপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী সীমান্ত সংলগ্ন কাগজীপাড়া, কানাই খালি, গড়াইমারী, জয়নাবাদ প্রভৃতি গ্রামগুলো তাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সহজেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

এই অংশের পূর্ব দিকের ভৈরব নদীটি বাংলাদেশের সীমান্ত নির্দেশ করছে। মোট বাইশটি গ্রাম নিয়ে নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে এবং প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস এই সব গ্রামে। জীবিকার মূল উৎস কৃষি হলেও ব্যবসা এবং চাকুরীতেও নিযুক্ত আছে অনেকে। এই অংশের শিক্ষার হারও যথেষ্ট ভালই বলতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার জন্য চুরি ডাকাতির ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকলেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কিন্তু অটুট আছে এই অংশে।

এই অঞ্চলের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের পৃথক পৃথক অংশে অবস্থান। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কাস্টবা সাবকাস্টের আলাদা আলাদা জায়গায় বসতি গড়ে ওঠার ফলে তাদের নিজস্ব লোকাচার ও লোক সংস্কৃতির স্বকীয়তা যেমন হারায়নি তেমনি তাদের সার্বিক সংমিশ্রনে গড়ে উঠেছে এক মিশ্র সংস্কৃতি। এই অংশের লোকাচার, লোকগীতি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি ঐতিহ্যপূর্ণ।

(ক) কাগজী পাড়া—

নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শেষ গ্রামটির নাম হলো কাগজী পাড়া। এই গ্রামেরই এক প্রান্তে ছিল নীলকুঠী। লোকে এখন ঐ এলাকাকে বলে টিবির মাঠ। নীলকুঠীর চারদিকে যেসব সুপুরি গাছ লাগানো হয়েছিল সেসব গাছ এখনো আছে। নীলকুঠীর সামনে যে পুকুরটি ছিল সেটি এখনো রয়েছে। ভৈরব নদীটি বয়ে গেছে নীলকুঠীর গা ঘেঁসে। নদীর ওপারেই বাংলাদেশ। দেশ ভাগের আগে এই অঞ্চল ছিল মেহেরপুরের অন্তর্গত।

কাগজী পাড়ার প্রাচীন নীলকুঠী আজ ধ্বংসস্তুপ মাত্র। কুঠী বাড়ীর জমিতে এখন হচ্ছে ধান পাটের চাষ। অতীত দিনের স্মৃতি নিয়ে নীলকুঠী আজ শুধু নানা কাহিনীর বুকেই জেগে আছে। এই অংশে হাজার হাজার উদ্বস্তুর ভীড় এবং গুলি গোলায় সন্ত্রস্ত সেই ১৯৭১ এর বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতি এখনো জ্বল্ জ্বল্ করে এই এলাকার মানুষের মনে। বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করতে ভৈরব নদীর এ পারেই আম বাগানে ঘাঁটি গেঁড়ে ছিল ভারতীয় সেনাদল। প্রচুর ট্রেঞ্চ খোঁড়া হয়েছিল এই অংশে। ভারতীয় সেনারা যেখানে ঘাঁটি গেঁড়েছিল সেই অঞ্চলকে এখন লোকে বলে 'মর ঘাঁটি' বা মরণ ঘাঁটি। তবে ঐ সব ট্রেঞ্চ বা ঘাঁটি বুজিয়ে বর্তমানে চাষ করা হচ্ছে।

(খ) মোকামতলা—

একেবারে ভৈরব নদীর গায়েই রয়েছে বিখ্যাত 'মোকামতলা'। সাধক নিগমানন্দের স্মৃতি বিজড়িত স্থান এই মোকামতলা। যদিও নিগমানন্দের প্রকৃত জন্মস্থান হলো বর্তমান বাংলাদেশের মেহেরপুরে কিন্তু সীমান্তের বিধি নিষেধের ফলে এপারেই গড়ে উঠেছে নিগমানন্দ আশ্রম। রাখী পূর্ণিমায় ঐ আশ্রমে যে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে শুধু

এপার বাংলা থেকেই নয় ওপার বাংলা এমনকি বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা থেকেও হাজার হাজার ভক্ত জনেব সমাবেশ ঘটে। ঐ দিন অবশ্য সীমান্ত খুলে দেওয়া হয় নিগমান্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য।

নিগমানন্দের দর্শনের মূল কথা হলো কর্মেই মুক্তি। কাজ করতে হবে। সেই কাজ যেমন ব্যক্তির জন্য তেমনিই সমাজ ও দেশের জন্যও বটে। কর্মযোগেই সাধনা। কর্মযোগের সাধনাই মুক্তির সাধনা।

২। লোকাচার ও বিভিন্ন ব্রত পার্বণ ও অনুষ্ঠান—

নন্দনপুর ও তার চারপাশের গ্রামাঞ্চলে নানা বিধ ব্রত ও পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে। মেয়েদের ইতু পূজা, ষষ্ঠী এবং জয়মঙ্গলার ব্রতাদির পাশাপাশি যে বিচিত্র ব্রতাচারটি লোকসংস্কৃতি প্রেমীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হলো গাস্যি ব্রত।

(ক) গাস্যি ব্রত—

সাধারণত গাস্যির আয়োজন শুরু হয় আশ্বিনের সংক্রান্তির দিন অথবা কার্তিকের প্রথম ভোরে। এই ব্রতানুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় উঠানে পরিষ্কার জায়গায় প্রথমে আলপনা দেওয়া হয় তারপরে ঐ জায়গায় কিছু ভেষজ উদ্ভিদের মূল ও পাতা সাজিয়ে রাখা হয়। ঐ সব ভেষজের মধ্যে থাকে হলুদ, নিম, পিপল, তেলাকুচো, তেঁতুল, সরষে, আদা, প্রভৃতি। এসব ছাড়াও থাকে ছোলা, নারকেল, কুমড়ো এবং কিছু শুকনো খড় এবং শামুকের মালা।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে ব্রতিনীরা শুদ্ধ বসনে প্রথমে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালায় পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে। তারপরে গৃহ দেবতার সম্মুখে জ্বালায় বংশ প্রদীপ। ঐ বংশ প্রদীপের তেল গৃহকর্ত্রী মাখিয়ে দেন সবার গায়ে। এর ফলে সবার দেহ নীরোগ হবে এইই বিশ্বাস। ঐ সময় কিছু মন্ত্রও উচ্চারণ করা হয় তবে তা একান্তই সাধারণ মন্ত্র।

ভোরের আলো ফুটলে এবার বাড়ীতে যেসব গাছ আছে সেগুলি ফলহীন এবং অপ্রয়োজনীয় বলে ব্রতিনীদের কেউ একজন কাটতে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই অন্যব্রতিনী সেই সব গাছের গায়ে খড়ও শামুখের মালা পরিয়ে দিয়ে আশ্বাস দেয় এবছর প্রচুর ফল হবে ঐ সব গাছে আর যেন তাদের কাটা না হয়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে এই অনুষ্ঠান।

এরপরে ঐ সব ভেষজ দ্রব্যাদিগুলো একজায়গায় জড় করে মণ্ড করা হয় এবং ব্রতিনীরা ঐ মণ্ড গায়ে হাতে পায়ে মুখে মেখে স্নান করে এর ফলে সারাবছর দেহ নীরোগ ও সতেজ থাকবে বলেই সকলের আশা।

স্নান শেষে ব্রতিনীরা ভেজানো ছোলা ও মটর ডালের সঙ্গে আদা ও কাঁচা হলুদ এবং তালের ফোঁপরা খেয়ে ব্রত শেষ করে।

'গাস্যি' ব্রতটি একান্তই পারিবারিক ব্রত। পরিবারের সকলের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই এই ব্রতটি পালন করা হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো বিভিন্ন পরিবারের মেয়েরাও একসঙ্গে এই ব্রত উদযাপন করে থাকে।

বাড়ীর গাছ গাছালির ফুল ও ফল বৃদ্ধিও এই ব্রতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কার্তিক মাস থেকেই ঋতু পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। তাই শীত নামার আগেই মেয়েরা সবার দেহ নীরোগ ও সতেজ রাখার বাসনাতেই এই ব্রত পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে গাছ গাছালির ফুল-ফলের সমৃদ্ধিও কামনা করে থাকে।

এই ব্রতের উপাচার অতি সামান্য। বিশেষ কোন মন্ত্রাদিও নেই। আছে হৃদয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং শুদ্ধাচার ও গভীর বিশ্বাস।

কত যুগ থেকে যে এই অঞ্চলে চলে আসছে এই ব্রতের অনুষ্ঠান তা বলতে পারেনা কেউই। অনেকে মনে করেন গাছ কাটতে যাওয়া ও তাতে বাধা দেওয়ার মধ্যে বন্ধ্যা নারীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার ও তাকে বাঁচানোর চেষ্টারই প্রতীক ঐ অনুষ্ঠানটি।

নদীয়ার নন্দন পুরের আশে পাশে 'গাস্যি' ব্রতের মতোই ইতু পূজা, ব্যাঙের বিয়ে, ষষ্ঠী পূজা প্রভৃতি যেসব ব্রতাদি পালিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে সেসব ব্রতাদি পালনে আজকাল মেয়েদের আবার তেমন আগ্রহ চোখে পড়ে না। এই সব ব্রতাচারগুলো হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে অচিরেই যেমন নদীয়া তথা বাংলার অন্যান্য বহু অঞ্চলে লুপ্ত হয়ে গেছে এমন বহু ব্রতাদি ও স্ত্রীআচার সমূহ। এই সব ব্রতাচার ও অনুষ্ঠান গুলোকে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

৩। লোকগীতি—

(ক) হরবোলা—

নন্দনপুর, কাগজী পাড়ার ও মোকামতলার জনপ্রিয় লোকগীতি হলো 'হরবোলা'। মূলত রাখাল বালকরাই গেয়ে থাকে এই গান। সাধারণত পৌষ সংক্রান্তির আগের রাত্রে চাষীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে রাখাল বালকরা এই বিশেষ গান গেয়ে থাকে। এই গানের মধ্য দিয়ে গৃহস্থের সুখ ও সমৃদ্ধিই কামনা করা হয়ে থাকে প্রথমে। প্রথমে রাখাল বালকরা গায়—

১। বর্ বর্ বাস্তির বর।
ভর্ ভর্ গেরস্তের গোলা ভর্।

এই প্রস্তাবনার পরেই শুরু হয় আসল হরবোলা গান। একেকটি গানের বিষয় বস্তু একেক রকম। পৌরাণিক কাহিনী থেকে শুরু করে বাস্তবের বিষয় ও ঘটনাবলীও এই গানের বিষয়বস্তুতে স্থান পায়। যেমন তামাক পাতাকে কেন্দ্র করে একটি গানে বলা হচ্ছে—

১। ও, ওরে ও, বলি ভাই শোনরে,
মণিপুরের তামাকরে ভাই লম্বা লম্বা পাতা।
ঐ তামাকের ধোঁয়া লেগে মরলো কালীর ব্যাটা।
ব্যাটা মরলো ভালই হলো
আবার ব্যাটা পাব।।
সাধের এই তামাকটি ফুরিয়ে গেলে
কার দুয়ারে যাব ?
ওরে, ও বলি ভাই শোনরে—
ঐ তামাকের তুলনা নাইরে।

অন্য একটি গানে গুলতি ও বাটুলকে নিয়ে বেশ মজার গান করা হয়ে থাকে—

২। কামারকে বলে এলাম বাটুল বানাতে।
ছুতোরকে বলে এলাম গুলতি বানাতে।
এক বাটুল মারলামরে ভাই আনা ডালে গেল।
আরেক বাটুল মারলামরে ভাই সোনা পাখী মলো।
তেল আনো, জল আনো, পাখী তাজা করি।

মরা পাখী তাজা করে বেহুলা সুন্দরী।
ও ভাই বেহুলা সুন্দরী।

হঠাৎ পাখী তাজা করতে কি করে যে বেহুলা সুন্দরীর আবির্ভাব ঘটলো তা বোঝা দায়। তবে এসব লোকগানে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। এসব গানের স্রষ্টাও হলো গ্রামের নিরক্ষর রাখাল বালক রাই।

অন্য একটি গানে কৃষ্ণকে আনা হয়ে থাকে কেন্দ্রস্থলে।

৩। ওরে, ও, ওরে ভাইরে ভাই, বলি শোনরে।
ওপারেতে কদম গাছটির
পাতা ঝিল মিল করেরে।
তারি ছায়ায় বসে কৃষ্ণ
সদাই নৃত্য করেবে।
বামহাতে তার তেলেব বাটি
ডান হাতে তাব বাঁশীরে।
ও কৃষ্ণ তোলে কদমের ফুল।
আমাব কৃষ্ণ স্নান করিবে কালিদহের কুল।
কালীদহের কূলে কষ্ণ তার সে কাল কেশ।
সেই কেশ গুনিতে গুনিতে
আমার হববোল শেয।

গান শেয হলে রাখাল বালকরা ভিক্ষা চায়। বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে যে ভিক্ষা পায তাবা সেই সব দিয়ে পবেব দিন বনভোজন করে মাঠের মধ্যে। শস্যে ও ফুলে ফলে যেন সারা মাঠ ভরে ওঠে এই তাদের কামনা।

প্রসঙ্গত বলি উত্তরবঙ্গের মালদা জেলাতেও এই ধরণের রাখালী গান প্রচলিত আছে। মাগনের শেযে তারাও বনভোজন করে মাঠে। তবে তারা ঐ সময়ে সোনা রায়ের পূজা করে থাকে।

বিভিন্ন ব্রতাদির মতো এই হরবোলা গানও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে নদীয়ার এই প্রান্ত থেকে। এর মূল কারণ হলো কৃষিভিক্তিক সমাজ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তিত রূপ। আজ দেশে গোচারণের ভূমি আর থাকছে না এবং থাকছেনা রাখালের দলও। আর যদি দেশে রাখালই না থাকে তবে রাখালিয়া গান আর গাইবে কারা ?

(খ) সঙের গান—

এই অঞ্চলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য লোকগীতি হলো সঙের গান।

চৈত্র মাসের শেষ দিকে খোলা আকাশের নীচে বসে এই সঙের গানের আসর। চারপাশে ঘিরে বসে থাকে উৎসুক শ্রোতারা। এই গানের বিশেষত্ব হলো হাস্যরসের মাধ্যমে সামাজিক জীবনের নানা রঙকে তুলে ধরা।

স্ত্রী-পুরুষ সব চরিত্রেরই অভিনয় করে থাকে পুরুষরা। নৃত্য গীত ও সংলাপ এবং বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে জমে ওঠে সঙের গান।

এ গানের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য হলো উদ্ভট সাজ সজ্জা। সহজ সরল অথচ মজাদার সব উপকরণ ব্যবহার করে থাকে কুশীলবরা।

বিশেষ সামাজিক ঘটনা যেমন স্থান পায় এই সঙের গানে তেমনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাও স্থান পেয়ে থাকে এই গানে।

কৃষ্ণলীলার পালায় অষ্টনাচ, কালী নাচ, অসুর দমন প্রভৃতি যেসব অংশ থাকে সেই সব অংশ অভিনয়ে অল্প বয়স্কা মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করে থাকে।

নৌকাবিলাস পর্বের গানের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

১। মূলগায়েন গায়—(নৌকা বিলাস—)

"ব্রজের যতো সখীগণ
ওরে, মথুরারি হাটে যাবে' বলে
করিল গমন।
দধি দুগ্ধ মাথায় লয়েগো
তারা ঘাটেতে দিল দরশন।

২। ব্রজনারীগণ—

"হাটে যাবো মোরা সহেনা দেরী।
পার করো মাঝি ত্বরা করি।
ছানা-মাখন নষ্ট হলো বুঝি
ত্বরায় পার করো গো কাণ্ডারী।

৩। শ্রীকৃষ্ণ—

শুন শুন সখীগণ যতো ব্রজনারী
ওপার থেকে এই পারে সদ্য এলাম যেগো।
সময় থাকতে না আসিলে
কেমনে পার করি বল ?

৪। বড়াই বুড়ী—

শুন শুন ওগো কাণ্ডারী
তুমিতো সুন্দর মাঝি।
তোমার কেন ভাঙলো তরী
পার হবো কি ভয়েই মরি।

৫। শ্রীকৃষ্ণ—

শুন শুন সখীগণ,
কুল ছাড়িয়ে কূলে এসো
পার করিব তখন।
কুলের গর্ব থাকলে পরে
এ তরী ডুবিবে যখন তখন।

৬। সখীগণ—

**কুল ছাড়িয়ে এসেছি মোরা
শুন শুন ও কাণ্ডারী।
এবার পারে ভিড়াও তরী।
পার করগো ত্বরা করি।**

৭। শ্রীকৃষ্ণ—

**এই তাহলে আনছি তরী কূলে।
সারি সারি বসো তোমরা
কাঁচলি খুলে।
হাসি মুখে কওগো কথা।
তরী বেয়ে যাই যথা তথা।**

৮। সখীগণ—

হায়, হায়, হায়, তরঙ্গ যে ভারী।
সাবধানে বাও ওহে ও কাণ্ডারী।

৯। শ্রীকৃষ্ণ—

সাবধানেতে বসো সবাই।
নাইতো হেলা দোলা।
নইলে তরী যেতেও পারে ডুবে।
ভয় পেয়োনা তোমরা সবে।

১০। শ্রীরাধা—

পার করো পার করো কৃষ্ণ
তোমার রাধা ডাকছে ব্যাকুলস্বরে।
তুমি যে হলে ভবের কাণ্ডারী গো।

১১। মূল গায়েন—

তখন দয়াল কাণ্ডারী
হাল ছেড়ে হাতে নেয় মোহন বাঁশরী।
শ্রীরাধারে বামে লয়ে
হলেন ত্রিভঙ্গ মুরারী।

১২। ফণী (গীতিকার)—

আজ ফণী ডেকে কয়
পার করহে ভবপারী কৃষ্ণদয়াময়।
আমার তরী যায় ডুবে যায়
হাল ধরো গো আমার ভাঙা নায়।

দ্বিতীয় পর্য্যায় কৃষ্ণ কেন্দ্রিক যে সঙের গানটি গাওয়া হয় এই অঞ্চলে সেটি বিরহের গান। তবে এ বিরহ রাধার বা গোপীগণের নয় এ বিরহ গোপীদের তথা রাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরহ। তিনি তখন মথুরায়।

কৃষ্ণ বিরহ

১। শ্রীকৃষ্ণ—

১। ওরে ও প্রাণের উদ্ধবরে
তুই ব্রজে গিয়ে দেখে আয়রে
আমার রাই কেমন আছেরে।
দেখে আয়রে ব্রজের নরনারী
কেমন আছে প্রাণের উদ্ধবরে।

২। প্রাণের উদ্ধবরে আমি কেমনে ভুলি তারে ?
থেকে থেকে রাধার কথা মনে পড়েরে।
আমি মরমে মরে যাইরে।
আমার পরাণ কাঁদেযেরে।
সদাই হেরি রাধার মূর্তি ওরে।

৩। প্রাণের উদ্ধব তুই বলে দেরে
আর কি তার দেখা পাবরে ?
তার দেখা না পেলে আমি ওরে
মরমে যে মরে যাবরে।

এই গানের রচয়িতা ও সুরকার এই অঞ্চলেরই সাধারণ মানুষ। এ সবগানের সুরে সর্বদাই ভেসে ওঠে মেঠো সুর যা বাংলার একান্ত আপনার প্রকৃতির সহজ সরল প্রাণ কাঁদানো সুর।

সঙের গানের বাদ্যযন্ত্র হলো ঢোল, করতাল, খোল, বাঁশী ও জুরি। তবে ইদানীং কিছু কিছু আধুনিক বাদ্যযন্ত্রও স্থান করে নিচ্ছে এই গানের আসরে।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাল্টে যাচ্ছে অনেক কিছুই। শিল্পীরা আজ সঙ সাজতে লজ্জা পায়। যে গানের জন্য গ্রামের শ্রোতারা অধীর আগ্রহে প্রহর গুণতো সেই গান আজ টিভির দৌলতে গুরুত্ব হারিয়ে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে। সঙের গানের ঐতিহ্য আজ বিপন্ন।

কৃষ্ণপুরে

১। পরিচিতি—

শিব নিবাসের দক্ষিণের প্রাচীন গ্রামটিই হলো কৃষ্ণপুর বা কেষ্টপুর। এই গ্রামটির প্রতিষ্ঠা করেন নদীয়া জেলার বিখ্যাত রাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

যে সময় বর্গীদের হামলায় নদীয়া বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিধ্বস্ত হচ্ছিল সেই সময় কৃষ্ণনগর থেকে পূর্বদিকে চূণীর তীরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজধানী সরিয়ে আনেন এই শিবনিবাসে। (এই লেখকের লোকশ্রুতির নদীয়া দ্রষ্টব্য।)

সেই সঙ্গেই উত্তর ভারত থেকে আনান লাঠিয়াল হিসাবে যাদব সম্প্রদায়কে। এই রাজধানীকে রক্ষা করার ভার দেন ঐ সব দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালদের ওপরেই। বাস করার জন্য জমি দেন লাঠিয়ালদের। যাদব সম্প্রদায়ের হাতে গড়ে ওঠে নতুন বসতি। এই যাদববা কৃষ্ণের পূজারী। কৃষ্ণ ভক্ত বা কৃষ্ণ পূজারীদের গ্রাম তাই ঐ গ্রামের নাম হলো কৃষ্ণপুর। লোকমুখে আজ যার পরিচিতি কেষ্টপুর বলে। প্রায় আড়াইশো বছর বয়স হলো এই গ্রামের।

সময় বয়ে চলেছে দ্রুত বেগে। পরিবর্তনের ঢেউ লাগছে আজ সর্বত্রই। ব্যতিক্রম ঘটেনি এই কৃষ্ণপুরের ক্ষেত্রেও। লাঠির যুগ শেষ হয়েছে। এখন রাইফেল, গ্রেনেড্‌ রকেটের যুগ। আড়াইশো বছরে চূর্ণী দিয়ে বয়ে গেছে বহু জল। শিবনিবাস হারিয়েছে তার পূর্ব গৌরব। রাজ বাড়ী ধ্বংস হয়েছে। রাজার রাজত্ব চলে গেছে। আত্মীয় স্বজন—কর্মচারীরা একে একে চলে গেছে শিবনিবাস ছেড়ে। ম্রিয়মান—ছন্নছাড়া আজ শিবনিবাসের অবস্থা। দুই শিব মন্দির আর রাম সীতার মন্দিরটিই শুধু দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের গৌরবের সাক্ষ্য দিতে।

রাজধানী শিবনিবাস ম্লান হয়ে গেলেও তাকে রক্ষার জন্য যে যাদবরা এসেছিলেন তাদের বংশধররা কিন্তু আজো বাস করছেন পাশের কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁদের অতীত দিনের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেই।

বর্তমানে কৃষ্ণপুরের লোকসংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মতো। গ্রামবাসীদের মধ্যে দুধের ব্যবসাতেও নিযুক্ত আছে অনেকেই। গ্রামে শিক্ষার হার খুব বেশী না হলেও বেশ কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বাস এই গ্রামে। আবার কয়েকজন কৃতি সন্তান দেশের নানা অংশে ছড়িয়েও আছেন।

২। উৎসব অনুষ্ঠান—

এই কৃষ্ণপুরে আজো যে সব উৎসব অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উদযাপিত হয় তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলো (১) জন্মাষ্টমী, দোল, ঝুলন এবং গাজন ও রাসযাত্রা।

১। জন্মাষ্টমী—

প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর দিন কৃষ্ণপুরের ঘরে ঘরে কৃষ্ণের জন্ম উৎসব পালিত হয়। বারোয়ারী তলায় বিশেষ পূজা পাঠও হয়ে থাকে। ঘরে ঘরে এই দিন তালের বড়া ভাজা হয়। সেই বড়া খেতে খেতে ছেলে মেয়েরা আনন্দে নাচে আর গায়—

(ক) 'তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচেরে।'

সন্ধ্যায় বারোয়ারী তলায় হয় ভাগবৎ পাঠ। চলে কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যাও। আগে এই উপলক্ষ্যে গ্রামে কৃষ্ণ যাত্রাও হতো। তবে এখন উৎসবের সমারোহ কমে এসেছে।

২। ঝুলন—

ঝুলনের উৎসব একদাখুব হৈ হৈ করে হলেও বর্তমানে কমে এসেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আগে রাধাকৃষ্ণ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সেজে আনন্দদিত সবাইকে। বর্তমানে বিভিন্ন পুতুল দিয়ে সাজানো হয় ঘরের কোন বিশেষ স্থান কিছুটা প্রদর্শনীর আকারে। ছোটরা নতুন নতুন জামা কাপড় পরে হৈ হৈ আনন্দে মাতে।

৩। রাসযাত্রা—

রাসযাত্রা আগে খুব জাঁক জমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে তেমনটা চোখে পড়ে না। নবদ্বীপ এবং শান্তি পুরের রাস যাত্রার দিকেই বর্তমানে নদীয়া তথা বঙ্গ বাসীর দৃষ্টি।

৪। দোল যাত্রা—

বাংলা তথা ভারতের নানা অংশের মতো এই কৃষ্ণপুরেও যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় দোল যাত্রার উৎসব। আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে গোটা গ্রাম।

ঐদিন ভোর থেকেই শুরু হয়ে যায় রং খেলা। সারা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ নরনারী মেতে ওঠে রংখেলায়। কোন বাধা নেই। নিষেধও নেই এই রঙ মেখে রঙীন হওয়ায়।

সন্ধ্যায় বসে গানের আসর। আগে যাত্রাও হতো মহা সমারোহে। তবে এখন কমে এসেছে উৎসবের সমারোহ।

৫। গাজন—

চৈত্রমাসের গাজনের উৎসব এই গ্রামের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উৎসব। গাজনের সন্ন্যাসীরা 'হর-হর-মহাদেব' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মথিত করে দেয় আজো। আগে হৈ হৈ করে চড়কেও চাপতো সন্ন্যাসীরা তবে বর্তমানে চড়ক হয় না আর। তবে গাজনের অন্যতম আকর্ষণ বোলান গান হয়ে থাকে আজও।

৩। লোকগীতি—

এই এলাকার অন্যান্য গ্রামেও বোলানের প্রচলন আছে। এই অঞ্চলের বিখ্যাত 'বোলান' রচয়িতা হলেন প্রহ্লাদ পাটনী। সুরকারও তিনিই।

কৃষ্ণপুরও তার আশে পাশের গ্রামে যেসব বোলান গান গাওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে শুধু যে শিবেরই গান গাওয়া হয় তাইই নয় রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা বা কাহিনীও থাকে। আবার কৃষ্ণলীলা, নিমাই বা গৌরাঙ্গ লীলা প্রভৃতিও থাকে। শুরু হয় 'মাতৃ বন্দনা' দিয়ে—

(ক) এসো মাগো সরস্বতী কি বলিতে জানি ?
প্রথমে বন্দিলাম মায়ের চরণ দুখানি।
এসোগোমা সরস্বতী বসোগোমা রথে,
বোলান গাহিতে হবে বালকের সাথে।
যে বোলান বলিবা মাগো বলিব তাই আমি।
দশের মাঝে ভাঙলে বোলান লজ্জা পাবে তুমি।

(খ) দ্বিতীয়াংশে থাকে গুরু বন্দনা—

"এই পর্য্যন্ত মায়ের পদে প্রণাম করা হলো।
অবোধ মনরে এবার গুরুর পদে চলো।

গুরুর নামটি প্রহ্লাদ পাটনী কৃষ্ণপুরে বাড়ী
তাঁর চরণ স্মরণ করে দেশ বিদেশে ঘুরি।
নদীয়া জেলায় বসত বাড়ী—কৃষ্ণগঞ্জ থানা।
ডাকঘর হয় শিবনিবাস—এই তাঁর ঠিকানা।
এই পর্য্যন্ত গুরু বন্দনা সাঙ্গ হয়ে গেল।
চাঁদ বদনে প্রেমানন্দে হরি হরি বলো।

(গ) তৃতীয়াংশে থাকে মূল গান। যেমন রামায়ণের কাহিনী থেকে নেওয়া 'দশরথের সিন্ধু বধ, রামের হরধনুভঙ্গ, তাড়কা রাক্ষসী বধ' ইত্যাদি পালা অথবা, রাধাকৃষ্ণের লীলা গান, কালীয় দমন, কংসবধ, ইত্যাদি পালা।

কিংবা মহাদেবের বিবাহ যাত্রা, হরগৌরীর বিবাহ ইত্যাদি পালা।

অথবা গৌরাঙ্গের লীলা কাহিনী গীত হয় আসরে।

(ঘ) প্রহ্লাদ পাটনী—

বিখ্যাত বোলান কার প্রহ্লাদ পাটনী পেশায় ছিলেন খেয়াপারাপারের মাঝি। এই অঞ্চলের লোক কবি হিসাবে তাঁকে মান্য করে অনেকেই।

৪। অন্যান্য লোকাচার ও ব্রতাদি—

নদীয়ার অন্যান্য বহু গ্রামের মতনই এই কৃষ্ণপুরের মেয়েরাও ইতুপূজা করে থাকে। এছাড়া ষষ্ঠী পূজা, পৌষ পার্বণ, নবান্ন প্রভৃতি উৎসবেরও প্রচলন আছে এই গ্রামে।

গ্রামে দুর্গা পূজা, কালী পূজা এবং সরস্বতী পূজাও হয়ে থাকে খুবই ধুমধাম করে।

তেহট্টের পাশে

১। পরিচিতি—

তিন হাটের সংযোগেই একদা হয়েছিল ত্রিহট্ট বর্তমানে তেহট্ট। দেশবিভাগের আগে এই তেহট্ট ছিল মেহেরপুরের অধীন। আজ সে নিজেই মহকুমা হয়ে নতুন রূপে সাজছে। স্কুল কলেজ দোকান বাজার নিয়ে প্রাচীন তেহট্ট গ্রাম আজ দ্রুত আধুনিক শহরে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এখনো এই তেহট্টের আশে পাশে জেগে আছে প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য নিয়ে বেশ কয়েকটা গ্রাম।

তেহট্টের কৃষ্ণ রায়ের মন্দিরটির খ্যাতি আজ ছড়িয়ে গেছে নদীয়ার সীমানা ছাড়িয়ে গোটা দেশেই। এই মন্দিরের প্রাচীন টেরাকোটার কাজ আজো রসিকজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। মন্দিরের রাধারাণী এবং মন্দিরটির সৃষ্টি কাহিনী নিয়ে শোনা যায় নানা লোকশ্রুতি।

২। চাতরপাড়া—

তেহট্টের চাতর পাড়া প্রাচীন স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজো। শোনা যায় এখানে আগে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নিত্য চলতো পূজা-পাঠ এবং বসতো সঙ্কীর্তনের আসর। ঐ অংশে হোম যজ্ঞাদিও হতো বিশেষ বিশেষ পূজা ও উৎসবে। বৈষ্ণবদের আখড়া ছিল এই চাতর পাড়ায়। ছিল দোল মন্দিরও। বর্তমানে মন্দির ধ্বংস প্রায়। অতীত দিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে নীরবে কাঁদে আজ চাতর পাড়া।

৩। লোক সংস্কৃতি—

তেহট্টের আশে পাশের গ্রাম গুলোর মূল জীবিকার উৎস হলো কৃষি। এই সব গ্রামে বসবাস করে হিন্দু-মুসলিম ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ। বিচিত্র রীতি নীতি এবং নানাবিধ আচার ও সংস্কৃতি নিয়েই এই অঞ্চলের মানুষরা যুগ যুগ ধরে বসবাস করছে এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে।

(ক) কীর্তন—

এই অংশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মূলত বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামে গ্রামে বসে নাম সংকীর্তনের আসর। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণ নামে।

(খ) কৃষ্ণযাত্রা—

মাঝে মাঝে বসে কৃষ্ণযাত্রারও আসর। সাধারণত যে কোন গৃহস্থবাড়ীর উঠোনেই বসে এই আসর।

(গ) পদ্মপুরাণ—

তবে এই অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ হলো পদ্মপুরাণ বা মনসার গান। চাঁদসদাগর এবং বেহুলা- লখীন্দরের কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বেশ কয়েকদিন ধরেই পরিবেশিত হয় এই মনসার গানে।

তবে পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গলের শেষাংশটিই সবচেয়ে করুণ এবং চিত্তাকর্ষকও বটে। এই অংশটিই ভাসান গান বলে পরিচিত। সর্প দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু এবং মৃত পতিকে নিয়ে বেহুলার জলে ভাসা এবং নানা দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে স্বর্গে গমন ও মৃত

পতিকে পুনর্জীবিত করে দেশে ফেরা ও শেষ পর্য্যন্ত চাঁদ সদাগরকে মনসা পূজায় রাজী করানোই এই মনসা ভাসানের মূল বিষয়।

কতোশত বছর ধরে এই মনসার ভাসান গীত হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু আজও তার আকর্ষণ কমেনি এক তিলও। এ গানে সংলাপ থাকে, কথকতা থাকে আবার গানও থাকে।

তেহট্টের আশে পাশে এই গানে যারা অংশ নেয় তারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর চাষীবাড়ীর নিরক্ষর সন্তান। সারা দিন মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনির পরে বারোয়ারী তলায় সমবেত হয়ে এরা রিহার্সেল দেয়। পাঠ মুখুস্ত করে। তারপরে নির্দিষ্ট দিনে পালা শুরু হয়।

শুধু যে নিজের গ্রামেই এরা অভিনয় করে তাইই নয়। অন্য গ্রামে গিয়েও অভিনয় করে থাকে এক গ্রামের অভিনেতারা।

(ঘ) সাজনের গান—

এই অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় আরেকটি লোকসঙ্গীত হলো সাজনের গান। শিবের গাজন উপলক্ষ্যেই গীত হয়ে থাকে এই গান।

চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে গাজনের সন্ন্যাসীরা গ্রামের বাড়ী বাড়ী যায় শিবঠাকুর নিয়ে এবং এই গান গায়—

১। সাজনে আম খেলাম জাম খেলাম
পগারে ফেললাম আঁটি।
সকল সাজন ঘুরি এসি
আমার সামনে উঠি।

(ঙ) লালনগীতি—

নদীয়ার এই অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে লোকগীতিটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সেটি হলো 'লালনগীতি'। এছাড়া জারিগানের প্রচলনও আছে এই অঞ্চলে।

(চ) উৎসব ও মেলা—

এই অংশের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব হলো দোলযাত্রা এবং রথ যাত্রা ও জন্মাষ্টমীর উৎসব। এই সব উৎসব উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। কীর্তনের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন।

(ছ) পূজা—

এই অঞ্চলে দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে বেশ জাঁকজমক সহকারেই। অধীর প্রতীক্ষায় থাকে গ্রামের মানুষরা এই সব পূজার জন্য।

(জ) ব্রত—

ইতু পূজা, ষষ্ঠী পূজা এবং জয় মঙ্গলার ব্রত যথাযথ ভক্তি এবং শ্রদ্ধাসহকারে পালিত হয়ে থাকে এই অংশে।

(ঝ) ইদমহরম—

মুসলিম প্রধান অঞ্চলে যথাযথ মর্য্যাদায় পালিত হয় ইদ ও মহরম উৎসব।

(ঞ) বড়দিন—

খৃষ্টান প্রধান অঞ্চলে হৈ হৈ করে পালিত হয় বড়দিনের উৎসব। সাজানো হয় গীর্জা। উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে খৃষ্টান সমাজ।

তবে দিন বদলের পালা চলছে আজ সর্বত্র। সেই পরিবর্তনের প্রবল ধাক্কায় আবহমানকালের লোক সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্যে আজ লেগেছে ভাঁটার টান। সিনেমা-টিভির প্রবল প্রতাপে আজ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে বাংলার অন্যান্য অংশের মতো এই অংশের লোক সংস্কৃতিও।

বেতাই

১। পরিচিতি—

কৃষ্ণনগর করিমপুর সড়কের ওপরে তেহট্টের পরেই 'বেতাই' গ্রাম। যদিও বর্তমানে আজ আর তাকে গ্রাম বলা যায়না। স্কুল কলেজ ব্যাঙ্ক অফিস, দোকান বাজার নিয়ে বর্তমানে বেতাই দ্রুত গ্রাম থেকে গঞ্জ এবং গঞ্জ থেকে শহর হতে চলেছে।

সত্যি কথা বলতে কি মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নির্জন বনজঙ্গলে ঘেরা বেতাই গ্রামের এই শহরে উত্তরণ যেমন বিস্ময় কর তেমনিই কৌতুহল উদ্দীপকও বটে।

চল্লিশ বছর আগেও এই বেতাই এর চারপাশে ছিল গভীর বনজঙ্গল। পূর্ব দিকের বিখ্যাত চাঁদবিল অবশ্য আজো আছে সীমান্তের পরিখা হয়ে। এর কিছু দূরেই বাংলাদেশ সীমান্ত। ঐ সীমান্ত দিয়েই দুটি পর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তুরা এসে ভীড় করেছিল এই অনাদৃত এবং অবহেলিত ভূখণ্ডে। তারপরে ঐসব ছিন্নমূল মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বেতাই সমৃদ্ধ জনপদরূপে। ওপার থেকে সর্বস্ব হারিয়ে আসা মানুষের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা আর অক্লান্ত পরিশ্রমেরই ফসল আজকের এই সমৃদ্ধ ও উন্নত বেতাই।

২। প্রাক্ ইতিহাস—

এই বেতাই গ্রামের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আরো পিছনে প্রায় চারশোবছর আগে। তখন মোগলযুগ। বর্তমান বেতাই উপশহরের পশ্চিম দিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থান বা ডাঙ্গা পাড়ায় ছিল পীরের আস্তানা। ছিল বিশাল এক মসজিদও। এখন সেসব ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে ধ্বংসস্তুপের পাশে এখনো আছে প্রাচীন সেই বটগাছটা যার বয়স কেউ বলে হাজার কেউ বলে দু হাজার বছর। ঐ বিশাল মহীরুহ যে ইতিহাসের কতো উত্থান পতনের সাক্ষী তার কি হিসাব আছে ? হায় ঐ বটবৃক্ষ যদি কথা বলতে পারতো ?

(ক) পাঠান পাড়া—

বর্তমানে ডাঙ্গা পাড়ায় কোন মুসলমানদের বসতি নেই কিন্তু আজো আছে পাঠান পাড়া সেদিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে।

(খ) নীলকুঠী—

বেতাই এর বুকে এর পরে এসেছে নীলকর সাহেবরা। চাঁদ বিলের টলটলে জলের কিনারায় গড়ে উঠেছে সাহেবদের সুদৃশ্য নীলকুঠী। চাঁদবিল এবং জলঙ্গীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার উর্বর জমিতে শুরু হয়েছে নীল চাষ। নীলের দৌলতে লালমুখো সাহেবরা হয়েছে আরো লাল। অবর্ণনীয় অত্যাচার চলেছে চাষীদের ওপরে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে সেই অত্যাচার। দিকে দিকে উঠেছে প্রতিবাদ। নদীয়ার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল সেদিন তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। সেই দাবানলের লেলিহান শিখায় ঝলসে গিয়েছিল এই বেতাই এর নীলকুঠীও। শিবপুর, চাঁদের ঘাট, মালিয়াপোতা এবং আশে পাশের গ্রামের

নির্যাতিত কৃষকরা সঙঘবদ্ধ হয়ে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বেতাই এর নীলকুঠীর ওপরে। বেতাইএর এই কুঠী বাড়ীই তখন ছিল নদীয়া জেলার এই অংশের সবচেয়ে বড় কুঠীবাড়ী। বিদ্রোহের রোষানলে ধ্বংস হয়েছিল কুঠীবাড়ী। নির্মূল হয়েছিল শ্যামচাঁদের বিভীষিকা। স্তব্ধ হয়েছিল নীলকর সাহেবদের রক্তচক্ষুর শাসানি।

(গ) পাল চৌধুরী—

নদীয়ার প্রায় সমস্ত কুঠী বাড়ীগুলিই এর পরে নীলাম হয়ে য়ায তাদের সম্পত্তিসহ। ঐ সময় প্রধান প্রধান সব কুঠীবাড়ীর সঙ্গে বেতাই কুঠী বাড়ীও কিনে নেন স্বরূপ গঞ্জের পালচৌধুরীরা। পরে ঐ বিখ্যাত কুঠীবাড়ীতে স্থাপিত হয় আম্বেদকর কলেজ। তবে ঐ কুঠী বাড়ীতে খুব সহজে কিন্তু কলেজ স্থাপিত হয়নি। মামলা গড়িয়েছিল হাইকোর্ট পর্য্যন্ত। 'শেষ পর্য্যন্ত আপোষ হয় একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায়। ঐ সময়ে পাল চৌধুরী বংশের সন্দীপ সিনহা ও প্রদীপ সিনহাদের দখলে ছিল এই কুঠী বাড়ী সহ দীঘি ও অন্যান্য সম্পত্তি। প্রকৃত পক্ষে ঐ সম্পত্তি সামান্য মাত্র মূল্যে সিনহারা কলেজ কর্তৃপক্ষকে দানই করে দেন।

(ঘ) আম্বেদকর কলেজ—

দেশ বিভাগের সময়ে বেতাই গ্রামে উদ্বাস্তুরা আসেন মূলত ফরিদপুর এবং কুষ্ঠীয়া ও গোপাল গঞ্জ থেকে। দ্বিতীয় দফায় ১৯৭১ এর যুদ্ধের সময় ও অসংখ্য লোক প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসেন এপারে এবং স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এই অংশে। এই জনসংখ্যার প্রায় নব্বুই শতাংশ নরনারীই হলেন তপশীলীজাতির। এঁদেরই সমবেত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে বেতাই গ্রামের। গ্রামে স্থাপিত হয় প্রাথমিক স্কুল ও হাইস্কুল। পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে। বেতাই বাসীরা এরপরে উদ্যোগ নেন একটি কলেজ স্থাপনের।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তপশীলীজাতি ও উপজাতি সমাজ কল্যাণ পরিষদের সম্মেলনে বেতাই এ কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ডক্টর আম্বেদকর কলেজের ক্লাস শুরু হয় ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী। কুঠীবাড়ীতে কলেজ শুরু হয় ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে এই কলেজের অধ্যক্ষ হলেন শ্রী মঙ্গল চন্দ্র মৌলিক মহাশয়। এই কলেজের প্রথম থেকেই তিনি অধ্যক্ষ রূপে কাজ করে আসছেন এবং শুধু এই কলেজের উন্নয়নের সঙ্গেই নয় এলাকার অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত আছেন।

বর্তমানে বেতাই কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রায় পনেরোশো। ইতিহাস বাংলা এবং এ্যাকাউন্টটেন্সীতে অনার্স পড়ানো হয়। এই কলেজ থেকে বহু কৃতী ছাত্র বেরিয়েছেন। আই. এ. এস এবং ডব্লিউ. বি. সি. এস. অফিসার ছাড়াও শিক্ষক অধ্যাপক এবং অন্যান্য উচ্চপদেও কর্মরত অনেকেই।

কলেজের লাইব্রেরীতে প্রায় আট হাজারের মতো বই রয়েছে। বহু বিদ্যোৎসাহী ও সহৃদয় মানুষের দান এবং সহযোগিতাতেই গড়ে উঠেছে কলেজটি।

(ঙ) শিক্ষারহার ও নারী শিক্ষা—

বর্তমানে বেতাই এ শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা সত্তর ভাগের কাছে। স্থানীয় জনগণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সজাগ। তবে মেয়েদের হাইস্কুল এখনো স্বীকৃতি পায়নি। যদিও স্থানীয় মানুষরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনো। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই বেতাই এর গার্লস স্কুলটি স্বীকৃতি পাবে।

স্থানীয় জনগণের আরেকটি খেদ হলো এখানে কোন হাসপাতাল বা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। দেশ ভাগের আগে ঐখানে যে দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল সেটি বন্ধ হয়ে গেছে আজ বেশ কয়েকবছর আগে।

৩। বেতাইএর পূজা ও উৎসব—

(ক) পূজা—দুর্গা-কালী ও লক্ষ্মী—

বেতাই এর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। পূজা পার্বণ লেগেই আছে সারা বছর। দুর্গা পূজার সংখ্যা দাঁড়িছে বর্তমানে সত্তরটির মতো। এছাড়া কালীপূজা এবং লক্ষ্মী পূজাও হয় প্রায় একশোর কাছাকাছি।

(খ) সরস্বতী পূজা—

আর সরস্বতী পূজার সংখ্যা তো অগণন। বাড়ীতে বাড়ীতে চলে এই পূজা। তবে বিসর্জনের আগে কলেজ মাঠে যে আড়ং হয় তা দেখার মতো। কয়েকশো প্রতিমা আসে ঐ অনুষ্ঠানে। মূর্তি ও সাজসজ্জা এবং আলোক সজ্জা ও আবহসঙ্গীতের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় প্রতি বছর। ঐ আড়ং উপলক্ষ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায় চারি ধারে।

(গ) শিব পূজা—

শিব চতুর্দশীতে শিব পূজাও হয় এখানে বেশ কিছু মূর্তিও তৈরী হয় ঐ সময়। সারারাত ব্যাপী চলে নানা অনুষ্ঠানও।

(ঘ) মনসা পূজা—

শ্রাবণী সংক্রান্তিতে হয় ধুম ধাম করে মনসা পূজা। চলে নানা আনন্দনুষ্ঠানও। মনসার ভাসানও হয়।

৪। ব্রত পার্বণাদি—

১। ইতু পূজা—

বেতাই অঞ্চলে মেয়েদের সবাই এসেছে মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে। তবে এপার বাংলার কিছু কিছু ব্রতাদিও পালিত হয় এখানে। এমনই একটি ব্রত হলো ইতুপূজা। অগ্রহায়ণ মাস জুড়ে চলে এই ব্রত পালন। ঘট স্থাপন করে চলে ইতু পূজা। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে বিশেষ পূজোর শেষে নদী বা পুকুরে ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়।

২। হেঁচলা পূজা—

মেয়েরা ফাল্গুন মাসে যে 'হেঁচলা' পূজা করে এখানে তাও বেশ মজার। একটা পিঁড়ি পরিষ্কার করে আলপনা দেওয়া হয় প্রথমে। তারপরে ঐ পিঁড়িতে ভাঁটফুল, কাঠ মল্লিকা ফুল ও অন্যান্য ফুল দিয়ে সাজানো হয় ঐ পিঁড়িকে। এরপরে শুদ্ধ বস্ত্রের ব্রতিনীরা ঐ পিঁড়ির চারপাশে বসে গান করে। তিন দিন বা সাতদিন ধরে চলে এই পূজা ও গান তারপরে পূজা শেষে নদীতে বা পুকুর ঘাটে পিঁড়ি সমেত ফুলগুলো সব ভাসিয়ে দেয়। খুব সম্ভব বসন্তকে অভিনন্দন জানানো হয় এই পূজার মাধ্যমে। অবশ্য বিসর্জনের আগে রীতি মতো বাতাসা, সন্দেশ, কলা ও শাক আলুর প্রসাদ দেওয়া হয় সবাইকেই।

৩। কুমীর পূজা—

এই অঞ্চলের ছোট ছোট ছেলেরা পৌষ সংক্রান্তির দশবারো দিন আগে থেকে কোন পুকুর বা বিলের ধারে মাটির কুমীর তৈরী করে পূজো করে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাল-ডাল-আলু-সব্জী ভিক্ষা করে। তারপরে পৌষ সংক্রান্তির দিন সবাই মিলে ঐ কুমীর বিসর্জন দিয়ে বনভোজন করে।

পূর্ববঙ্গ থেকেই এই কুমীর পূজা এসেছে এ অঞ্চলে। নদী নালার দেশ পূর্ববঙ্গ। কুমীরের হাতে প্রাণ যায় বহুলোকের। তাইই কুমীরকে পূজা করে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এই কুমীর পূজায়। সঙ্গে বনভোজনের ব্যাপারটা ভয় থেকে মুক্তির আনন্দেই।

৪। গাস্যি—

এই ব্রতটিও এসেছে ওপার থেকেই। নন্দনপুরের আশে পাশেও এই গাস্যি ব্রতটি প্রচলিত আছে তবে আচার অনুষ্ঠানে দু যায়গার মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এখানে আশ্বিন সংক্রান্তির আগের দিন ইলিশ মাছ, কলমী শাক ও ভাত রান্না করে রাখা হয় এবং পরের দিন পূজা শেষে বা ব্রত শেষে ঐ পান্তা ভাত ইলিশ মাছ ও কলমী শাক দিয়ে খাওয়া হয়। উঠোনে নিমপাতা হলুদ, তেঁতুল প্রভৃতি আলপনা ঘেরা জায়গায় রাখা হয়। একটা ঘটে ডুবিয়ে রাখা হয় তালের ফোঁপরা। পূজার বিশেষ কোন মন্ত্র নেই তবে কোথাও কোথাও গান করা হয়ে থাকে যেমন—

১। 'আশ্বিন যায় কার্তিক আসে
মা লক্ষ্মী ঘরে বসে।
রোগ বালাই যা
দূরে ভেসে।'

ব্রতের শেষে নিম হলুদ মেখে স্নান করে ব্রতিনীরা। তেঁতুল পুড়িয়ে ঠোঁটে মাখে। চোখে কাজল পরে। এতে গায়ে ছুলি হয় না বা ঠোঁট ফাটে না এবং চোখ ভাল থাকে। তাছাড়া ঐ দিন পুঁটি মাছ খাওয়ানো হয় গরুকে এতে নাকি গরুর পায়ের রোগ হয় না আর। তালের ফোঁপরাও খায় সবাই মিলে।

গাস্যি ব্রত মূলত স্বাস্থ্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

৫। **মেঘ ব্রত**—

এই ব্রতটিও মূলত ছোট ছোট মেয়েরাই করে থাকে। তবে যে বাড়ীতে একটি মেয়ে আছে সেই মেয়েই অংশ নিতে পারে এই ব্রতানুষ্ঠানে।

ছোট ছোট মেয়েরা কূলো মাথায় করে বাড়ী বাড়ী যায়। চালের কোণা থেকে জলঢালা হয় ঐ কূলোর ওপরে। মেয়েরা কূলো মাথায় করে যখন বাড়ী বাড়ী যায় তখন একসঙ্গে গান ধরে—

মেঘ রাণী ও মেঘের রাণী,
হাত পা ধুয়ে ফেলা পাণি।
মেঘ রাণীর ভাঙা ঘর,
ঝপ ঝপিয়ে বৃষ্টি পড়।

প্রতিটি বাড়ী থেকেই চাল ডাল দেওয়া হয়। সকল ব্রতিনীরা এরপরে কোন একটা গাছের তলায় বসে মেঘ রাণীর পূজো করে গান গায় এবং বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে।

মূলতঃ মেঘ ব্রতটি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনারই ব্রত।

৬। **গাজন**—

চৈত্র মাস ধরে চলে এই গাজনের আয়োজন। সন্ন্যাসীরা বাড়ী বাড়ী যায় শিব নিয়ে ধ্বনি দিতে দিতে। চৈত্রের শেষ দিনে হয় চড়ক পূজা। পাঠবাণ হয় মূল সন্ন্যাসী সুরেণ পাণ্ডের বাড়ীতে। ঐ উপলক্ষ্যে সঙওবের হয় এবং বোলান গানও হয়ে থাকে।

৭। **সিদ্ধেশ্বরীর পূজাও মেলা**—

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে মা সিদ্ধেশ্বরীর ব্যাৎসরিক পূজো উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলা বসে। ঐ মেলায় হাজার হাজার লোকের ভীড় হয়ে থাকে। আগে মা সিদ্ধেশ্বরীর পূজায় পাঁঠা বলি হতো তবে বর্তমানে আর পাঁঠা বলি হয় না।

৮। রাধাষ্টমী—

বেতাইএ জন্মাষ্টমীর উৎসবকে ছাপিয়ে যায় রাধাষ্টমীর উৎসব। বাইরে থেকেও বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের ভীড় হয় ঐ উপলক্ষ্যে এই বেতাইএ। বিশ্ব বন্ধুসেবা সংঘেই মূলতঃ এই উৎসবটি হয়ে থাকে।

৯। মনসার ভাসান ও ঝাপান—

শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে যে ঝাপান হয় তাতে আগে বহু নাম করা ওঝা যোগ দিতেন। এই এলাকার বিখ্যাত ওঝা হলেন নীলরতন সমাজপতি। তিনি সাপে কামড়ালে বিশেষ একটি গাছের পাতা খাইয়ে বিষ নামিয়ে দিয়ে থাকেন।

বর্তমানে ঝাপানের আর রমরমা নেই। তবে মনসার ভাসান বা যাত্রাপালা হয় কোথাও কোথাও।

১০। সূর্য্যব্রত—

সরস্বতী পূজার পরের দিন হয়ে থাকে সূর্য্য পূজা। সাধারণত উত্তর ফরিদ পুর অঞ্চল থেকে যারা এসেছেন এপারে তারাই এই ব্রতটি উদযাপন করে থাকেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কা মহিলারা সরা পেতে সূর্য্যের দিকে চেয়ে গান করে এবং সূর্য্যের বন্দনা করে থাকেন।

গান— 'আয় সূয্যি নেমে আয়
সরার বুকে গান গায়।'

মাঘ মাসে এত ব্রতানুষ্ঠানটি হয় বলে একে মাঘী ব্রতও বলা হয়ে থাকে।

৫। লোকগীতি ও অন্যান্য সঙ্গীত—

(ক) বাউল গান—

বেতাই এ লোকগীতির মধ্যে বাউল গানের প্রচলনই বেশী। এখানে বাউলের আখড়াও আছে একটি। নিত্যই সেখানে গান হয়। একতারা সহযোগে চলে গান সন্ধ্যার আসরে। গৌরাঙ্গ করই এই এলাকার বিখ্যাত বাউল গীতিকার।

(খ) কবি গান—

বিশে বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এখানে বসে কবি গানের আসরও। এই অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল হলেন রসিক সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, নিশিকান্ত এবং অসীম সরকার।

(গ) কীর্তন—

এছাড়াও এই অংশে কীর্তনের ব্যাপক প্রচলনও আছে। মাঝে মাঝে অখণ্ড নাম যজ্ঞও হয়ে থাকে ৭২ ঘণ্টা ধরে। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে থাকে। প্রতিদিন দশ হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়ে থাকেন।

(ঘ) নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায় যে আগে এখানে প্রচুর বেত জন্মাতো। বেতের জঙ্গলে বাঘ শূয়োর এবং অন্যান্য বন্য পশুও ঘুরে বেড়াতো। ঐ বেতের জঙ্গল থেকেই এই গ্রামের নাম হয়েছিল 'বেতাই' বলেই সকলের বিশ্বাস।

ডাঙ্গা পাড়া ও চন্দ্রনাথ বসু আশ্রম

১। (ক) ডাঙ্গা পাড়া ও দরগা তলা—

বেতাই এর ডাঙ্গা পাড়া বেশ প্রাচীন এলাকা। এককালে এদিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকাতেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি। এখনো এখানে ছড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। রয়েছে একটা সুপ্রাচীন বটবৃক্ষও যার মূল যে কোথায় বলতে পারেনা কেউই। রয়েছে সেই প্রাচীন দরগাতলাও। কিন্তু আজ আর সেখানে উৎসব হয় না। সিন্নিও দেয় না কেউ। দেয় না ছলনের ঘোড়াও। নির্জন বটের ছায়ায় দরগাতলা আজ উপেক্ষার বেদনায় নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

(খ) পাঠান পাড়া—

কবে কোন সময়ে যে ডাঙ্গাপাড়ায় পাঠানরা এসে বসবাস শুরু করেছিল তার সঠিক সময় নির্ধারণ করা আজ হয়তো সম্ভব নয় তবে এই নদীয়ার বুকে বখ্‌তিয়ার খিলজির আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। অবশ্য ঐ সময়েই সমগ্র নদীয়া মুসলিমদের হাতে যায়নি। আরো পঞ্চাশ বছর লেগেছিল সমগ্র নদীয়া অধিকার করতে। মনে রাখতে হবে ঐ সময় সমগ্র কুষ্টীয়া ও মেহেরপুরও ছিল নদীয়ার অন্তর্গত। বেতাই থেকে মেহেরপুরে যাবার সহজ রাস্তাও ছিল। আর এই জায়গাটাও ছিল বিস্তীর্ণ চাঁদ বিল ও বিশাল মাঠের মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু জায়গা। তাই এখানেই সম্ভবত কোন পাঠান সুবেদার এসে ঘাঁটি গেঁড়েছিলেন। তার পরে এসেছিলেন পীর সাহেব। বটগাছের ছায়ায় গড়ে উঠেছিল দরগা। ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিতও হয়েছিল অনেকে। জমে উঠেছিল পাঠান পাড়া—লোকজনে—উৎসবে—কোলাহলে।

তার পরে বন্যা অথবা মহামারীতেই সম্ভবত ডাঙাপাড়া জনশূণ্য হয়ে পড়েছিল ধীরে ধীরে। বাকী যারা ছিল বহু কষ্টে দেশ ভাগের সময়েই তারা চলে যায় ওপার বাংলায়।

আজ সেই পাঠানরা নেই কিংবা তাদের বংশধররাও নেই। কিন্তু অতীত স্মৃতি বুকে নিয়ে 'পাঠান পাড়া' আজো টিঁকে আছে বেতাই এর ডাঙা পাড়ায়।

(গ) দাতব্য চিকিৎসালয়—

পাঠান পাড়ার পাশেই একদা ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়। বর্তমানে ঐ চিকিৎসা কেন্দ্রের ঘরবাড়ী সব জীর্ণ দশায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ে আছে ধ্বংসের প্রতীক্ষায়। অথচ বেতাই বাসীদের ভীষণ ভাবেই দরকার একটি চিকিৎসা কেন্দ্রের।

২। চন্দ্রনাথ বসু সেবাসঙ্গ—

বেতাই বাজার ও পাঠান পাড়ার পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে যে সরু পীচ রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়েই পাওয়া যাবে ছায়া সুনিবিড় পরিবেশে একটা আশ্রম। হ্যাঁ এই আশ্রমটিই হলো বেতাই তথা নদীয়ার বিখ্যাত চন্দ্রনাথ বসু সেবাসংঘের আশ্রম।

জনকল্যাণমুখী এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে যদিও এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল আরো আগে।

এখানে রয়েছে ছায়াময় মায়াবী পরিবেশে একাধিক প্রতিষ্ঠান। গ্রহন করা হয়েছে নানা প্রকল্পও।

(ক) চন্দ্রনাথ বসু বিদ্যামন্দির—

মূলতঃ তপশীলিজাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বিদ্যামন্দিরটি। নার্সরী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে এখানে। তবে স্থানীয় জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য আরো পরবর্তী শ্রেণীর পঠন পাঠনের কাজও শুরু করার কথা ভাবা হচ্ছে।

এখানে বিনামূল্যে দুপুরের আহার ছাড়াও স্কুলের ইউনিফর্ম, বই, খাতা, পেন্সিল কলমও দেওয়া হয়ে থাকে।

এই বিদ্যা মন্দিরে তাত্বিক এবং ব্যবহারিক বিষয়ের শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থীদের ব্রতচারী, যোগাসন, সঙ্গীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপও শেখানো হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

(খ) চন্দ্রনাথ বসু সেবা নিকুঞ্জ—বৃদ্ধাশ্রম—

এই সেবা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে ১৯৯২ খৃষ্ঠাব্দে এখানে সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের থাকা খাওয়া ও সেবাদির ব্যবস্থা আছে। দুঃস্থ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের খাওয়া পরা এবং সেবাদি খুবই যত্নের সঙ্গে করা হয় এখানে।

(গ) চন্দ্রনাথ বসু আই. টি. আই—

এই শিল্প কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে। এখানে তপশীলি জাতি ও উপজাতি যুবক যুবতীদের চারটি বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এখানে শেখানো হয় রেডিও ও টি.ভি. সারানোর কাজ টাইপ ও শর্ট হ্যান্ড, টেলারিং ও চর্মশিল্প। বর্তমানে ২২৫ জন তপশীলি ছাত্রছাত্রী এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এক বছরের কোর্স। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকেই নিজ নিজ কেন্দ্র খুলে জীবিকা অর্জন করছে এবং প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে।

(ঘ) চন্দ্রনাথ বসু আর্সেনিক প্রজেক্ট—

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানে চালু হয়েছে আর্সেনিক প্রজেক্ট। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ও জাপান সরকারের অর্থ সাহায্যে এই প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। নদীয়া জেলায় বহু স্থানে পানীয় জল আর্সেনিক মুক্ত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই সংস্থা।

সম্প্রতি এই সেবাসঙ্গ ভারত কানাডা যুক্ত প্রচেষ্ঠার অন্তর্গত (আই.সি.ই.এর সামুদায়কি আর্সেনিক প্রজেক্ট গ্রহন করেছে।)

উপসংহার—

সত্যি কথা বলতে কি নির্জন পল্লীর বুকে যে কর্মযজ্ঞ চলছে এখানে তার ফলে এই এলাকার চেহারাই পাল্টে যেতে বসেছে। ডাঙ্গাপাড়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে শিক্ষার আলো। কর্মব্যস্ত সকলেই। ঘরের মেয়েরাও বিড়ি বাঁধা থেকে সেলাই এর কাজে এমনকি মাঠের কাজেও ব্যস্ত সদাই। যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে এই নিভৃত পল্লীর বুকে তাকে সাবাস্ না জানিয়ে পারা যায় না।

ধুবুলিয়া আজ

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার সদব শহর কৃষ্ণনগর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই ধুবুলিয়া। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারেই পড়ে ধুবুলিয়া। তবে ধুবুলিয়াকে আজ আর গ্রাম বলা যায় না। শহরের সমস্ত সুযোগ সুবিধাই পাওয়া যায় এখানে। রীতিমতো উন্নত গঞ্জেব রূপ ধারণ করেছে এই ধুবুলিযা।

অথচ দেশ বিভাগের আগে এই অঞ্চলটি ছিল একান্তই অজ্ঞাত। বনে জঙ্গলে ঘেরাছিল এর অধিকাংশ স্থান। দেশ বিভাগের সময় যেসব ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা এখানে পালিয়ে আসেন সর্বস্ব খুইয়ে মূলতঃ তাদেরই সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতে ধুবুলিযা আজ গ্রাম ছেড়ে গঞ্জ তথা শহরের রূপ নিতে চলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এখানে বিমান বাহিনীর জন্য যে রানওয়ে তৈরী করা হয়েছিল তা আজও বিদ্যমান।

২। শিক্ষা—

বেলপুকুর সহ ধুবুলিয়ার লোক সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজারের মতো। অধিকাংশ লোকই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তবে ব্যবসা বাণিজ্য এবং অফিস আদালতের সঙ্গেও যুক্ত আছেন বহু ব্যক্তি।

এতদিন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও বর্তমানে শিক্ষার হার বাড়ছে। ধুবুলিয়া দ্রুত উঠে আসছে নদীয়ার সাক্ষরতার মানচিত্রে। শতকরা নব্বুই ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় আজ।

এখানে রয়েছে মোট নটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঁচটি অঙ্গনারী, তিনটি মাধ্যমিক ও তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

চালু রয়েছে তিনটি বেসরকারী নার্সারী স্কুলও। পড়াশুনার মানও যথেষ্ট উন্নত এইসব বিদ্যালয়ে।

ধুবুলিয়ার বেশ কিছু কৃতী সন্তান বর্তমানে ছড়িয়ে আছেন দেশের নানা অংশে। প্রখ্যাত আকাশবাণী সাংবাদিক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর কাঞ্জিলাল এই ধুবুলিয়ারই বেলপুকুরের সন্তান।

৩। সংস্কৃতি চর্চা—

(ক) সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ধুবুলিয়া যথেষ্ট উন্নত। বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এখানে চলে নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গান, বাজনা, আবৃত্তি, নাটক ও ক্যুইজের আসর বসে। চলে নানা প্রতিযোগিতাও। বেশ কয়েকটি ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সংস্থাও গড়ে উঠেছে এই ধুবুলিয়ার বুকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থা হলো 'ঐকতান' এবং 'হৃদয়'।

৪। ব্রত পার্বণ—

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখানে নানাধরণের ব্রত পার্বণাদি প্রচলিত আছে। ঐ সব ব্রত পার্বণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—

১। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত।
২। বিপত্তারিণীর ব্রত।
৩। মেঘ ব্রত।
৪। ইতু পূজা।
৫। অষ্টলোক ঠাকুরের ব্রত।

এর মধ্যে অষ্টলোক ঠাকুরের ব্রতটিই নদীয়ার এই অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে কেননা এই ব্রতটি অন্য অঞ্চলে পালিত হয় না।

(ক) অষ্টলোক ঠাকুরের ব্রত—

অষ্টলোক ঠাকুরের ব্রতটি শুরু হয় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ রবিবারে। বাড়ীর উঠানে বা ঠাকুর ঘরে আলপনা দিয়ে প্রথমে ঘটস্থাপন করা হয়। ঐ ঘটে বিভিন্ন ফুল পাতা রাখা হয়। ঐ ঘটের চারপাশে রাখা হয় আটটি কাঁঠাল পাতা। ঐ সব কাঁঠাল পাতায় আবার রাখা হয় আটটি করে আমন ধানের চাল, আটটি তুলসী পাতা, আটটি দুর্বা, আটটি ফুল ও অন্যান্য পূজার উপকরণ। ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে শুরু হয় পূজা। ব্রতিনীরা স্নান করে শুদ্ধ পোষাকে শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত পালন করে ও পূজা করে। এই উপলক্ষ্যে অষ্টঠাকুরের যে কাহিনী শোনানো হয় তা সংক্ষেপে এই—

কাহিনী—

'বহুদিন আগে এক ব্রাহ্মণ অষ্টঠাকুরের দয়ায় বেশ অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে অষ্ট ঠাকুরের পূজা পাঠ বন্ধ হতেই অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। ঐ ব্রাহ্মণের ছিল যমুনা, রমুনা দুই কন্যা। তাঁরা বড় হয়ে পূজা শুরু করতেই আবার অবস্থা ফেরে। এর পরে ঐ কন্যারা বাবার জন্য চিন্তা করে শেষ পর্য্যন্ত বিমাতা ঘরে আনে। ঘটনাচক্রে ঐ বিমাতা আবার ছিলেন এক রাজ কন্যা। ঐ বিমাতার চক্রান্তে যমুনা, রমুনাকে বনবাসে ফেলে রেখে চলে যায় ঐ ব্রাহ্মণ। অষ্টলোক ঠাকুরের কৃপায় বনের ফল মূল খেয়ে দুই বোন সেখানে অষ্টলোক ঠাকুরের পূজো করতে থাকে। সেই বনে একদিন এক রাজা আসেন মৃগয়ায়। সঙ্গে তাঁর সৈন্যদল এবং মন্ত্রী। ঐ সুন্দরী দুই কন্যার সেবায় তুষ্ট হয়ে রাজা বড় বোন যমুনাকে এবং মন্ত্রী ছোট বোন রমুনাকে বিয়ে করেন। কিন্তু রাজ প্রাসাদে গিয়ে বড় বোন যমুনা অষ্টঠাকুরের পূজা করা বন্ধ করে ফলে রাজার অবস্থা খারাপ হতে থাকায় রাজা যমুনাকে বনবাসে পাঠায় অন্তসত্তাবস্থায়। রমুনা কিন্তু যথারীতি অষ্টলোক ঠাকুরের পূজা করতে থাকে এবং মন্ত্রীর অবস্থাও দিন দিন আরো ভাল হতে থাকে। অবশেষে যমুনার এক পুত্র সন্তান হলে সে ফিরে আসে ঐ পুত্রকে কোলে নিয়ে রমুনার বাড়ীতে। সেখানে দুই বোনে আবার পূজো করতে থাকে ঠাকুরের। ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে রাজা রাণীর মিলন ঘটিয়ে দেন এবং সুখে বসবাস করতে থাকেন সবাই। ধীরে ধীরে ঠাকুরের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে।

এই ব্রত বা পূজার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো অগ্রহায়ণ মাসে কাঁঠাল পাতায় রাখা ফল বীজ মূলগুলো বেঁধে তুলে রাখা হয় এবং আষাঢ় মাসের শেষ রবিবারে উপোস করে আবার ঘটস্থাপন করে পূজো করে মেয়েরা। ঐ কাঁঠাল পাতায় রাখা দ্রব্যগুলি কুলোয় সাজিয়ে তারপরে সকলে মিলে পুকুরে যায়। একদল ঐ কুলো মাথায় করে ডুব দিয়ে সব উপকরণ ভাসিয়ে দিয়ে ফাঁকা কুলো নিয়ে ফিরে আসে ঘরে।

(গ) পৌষ পার্বণ—

এখানে পৌষ পার্বণেও ঘরে ঘরে পড়ে যায় উৎসবের সাড়া। পিঠে পুলি তৈরী হয় ঘরে ঘরে। উঠোনে আলপনা দেওযা হয। নানা শস্য ও সব্জী রাখা হয় সেখানে। উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে সবাই।

৪। মন্দির ও পূজা—

(ক) রাধা মাধবের মন্দির—

ধুবুলিয়ায় রয়েছে দুটি রাধা মাধবের মন্দির। এই দুই মন্দিরের একটিতে পৌষ পূর্ণিমায় এবং অন্যটিতে দোল পূর্ণিমার পাঁচ দিন পরে অর্থাৎ পঞ্চম দোলে পাঁচ দিন ধরে নাম সংকীর্তন হয় এবং লীলা কীর্তনও হয়ে থাকে। ঐ দুই উৎসবের সময় অর্থাৎ পৌষ পূর্ণিমা ও পঞ্চম দোলে বাউল সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়ে থাকে। এছাড়া জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যেও নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

(খ) লোক নাথের মন্দির—

ধুবুলিয়ার অন্যতম আকর্ষণীয় ধর্মস্থান হলো এই লোকনাথের মন্দির। জাতীয় সড়কের পাশেই বলা যায় ধুবুলিয়ার প্রাণকেন্দ্রেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। এখানে লোকনাথ বাবার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী বিশাল আকারের উৎসব হয়ে থাকে। হাজার হাজার লোকের ভীড়ে গম্ গম্ করে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন। বহু দূর দূর থেকে ভক্তরা আসে ঐ সময়। ঐ তিন দিন ধরে চলে পূজা পাঠ এবং শাস্ত্রালোচনা। গান বাজনাও চলে। ধর্মীয় সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস।

(গ) রথ—

ধুবুলিয়ার রথও বিখ্যাত। রথ উপলক্ষ্যে এক দিনের একটি মেলাও বসে। বাঁশীর শব্দে, হৈ হৈ রৈ রৈ আনন্দে উচ্ছ্বাসে মধুর হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন।

৫। লোকগীতি—

(ক) বাউল—

ধুবুলিয়ায় ভাটিয়ালী বা সারি গানের প্রচলন না থাকলেও বাউল গানের প্রচলন আছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়ই শোনা যায় একতারার ঝংকার আর ঘুঙুরের শব্দ। হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায় বাউলগান। তবে তেমন কোন নামী শিল্পী এখান থেকে ওঠেনি আজো।

(খ) কীর্তন—

কীর্তনের ব্যাপক প্রচলন আছে এখানে। উৎসবে অনুষ্ঠানে পূজা পার্বণে প্রায় শোনা যায় নাম সংকীর্ত্তন। পালা কীর্তনও হয়ে থাকে মাঝে মাঝে।

৬। মুসলিমপর্ব—

(ক) ইদ ও মহরম—

মুসলিমদের বেশ কয়েকটি মসজিদ এবং ইদ্‌গাহ আছে এখানে। ইদ্ এবং মহরম উৎসব যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গেই পালিত হয় এখানে। মহরমের সময়ে যে লাঠিখেলা হয়ে থাকে তা বিপুল সাড়া জাগায় মানুষদের মনে। লাঠি খেলায় বিভিন্ন এলাকার নানাদল অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং পুরস্কারে ব্যবস্থাও থাকে ঐ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে।

(খ) মেহফিল—

এছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের আনন্দমূলক গান বাজনার অনুষ্ঠানও হয়ে থাকে। 'মেহফিলের' অনুষ্ঠানে রকমারী গজলের সঙ্গে নানা ধরনের সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেওয়া হয়।

৭। চিকিৎসা ব্যবস্থা—

এখানে রয়েছে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র। তাছাড়াও রয়েছে একটি টি.বি. হাসপাতাল যেখানে দেশের নানা প্রান্তের বহু রোগীই আসে আরোগ্য লাভের আশায়।

৮। রেশম চাষ—

বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে এখানে শুরু হয়েছে রেশম চাষ। রেশম কীটের প্রতিপালন করা হয় এখানে। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে চলছে তুঁত গাছের চাষ।

৯। বাজার হাট—

এখানে রয়েছে দুটি বড় বাজার। এছাড়া সপ্তাহে একদিন হাটও বসে।

১০। ফুল চাষ—

বর্তমানে সারা দেশে ধুবুলিয়ার নাম ছড়িয়ে পড়েছে মূলত বর্ষাকালীন বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুলের জন্য। মাঠের পর মাঠ এই সময়ে আলো হয়ে থাকে গাঁদা ফুলের সৌন্দর্য্যে। খুশীর বন্যা বয়ে যায় গাঁদার ক্ষেতে। এই গাঁদা ফুলের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু লোক। পশ্চিমবঙ্গে এত ব্যাপক গাঁদার চাষ বিশেষত বর্ষাকালে আর দেখা যায় না কোন অঞ্চলেই।

গোপালপুরে

১। পরিচিতি—

কৃষ্ণনগর থেকে কয়েক কিলোমিটার পূর্ব দক্ষিণে গেলেই পাওয়া যাবে এই গোপাল পুর গ্রামটি। নদীয়ার আর পাঁচটি গ্রামের মতোই ছায়া সুনিবিড় ছোট্ট এক অবজ্ঞাত গ্রাম এই গোপালপুর। কিন্তু এই অবহেলিত গ্রামটিতে একবার প্রবেশ করলে এ গ্রামের মানুষদের আন্তরিকতা এবং সহৃদয়তায় মুগ্ধ হতেই হবে। অসম্ভব অতিথি বৎসল এ গ্রামের জনগণ। অজানা অচেনা লোক বলে দূরে সরিয়ে রাখবেনা এরা। পরিচিতি আপনজনের মতো বলে যাবেন গ্রামবাসী এ গ্রামের ইতিহাস। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ কিংবা ব্রত পার্বণের তথ্যও দেবেন গড় গড় করে। মুগ্ধ হতেই হবে আপনাকে। দীপিকার মতো মেয়েরা অনায়াসে বলে যাবে বিভিন্ন ব্রত পার্বণের মন্ত্র এবং দিয়ে যাবে লোক সংস্কৃতির নানা তথ্যও।

গোপালপুর গ্রামটি হাঁসখালি থানার অন্তর্গত দক্ষিনপাড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। মজার কথা হলো গ্রামটি সদর মহকুমা কৃষ্ণনগর মহকুমার কাছে অবস্থিত হলেও এটি রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। গ্রামের পাশেই রয়েছে বিশাল বিল এবং মাঠ। গ্রামের বাড়ীগুলি রাস্তার দুপাশে অবস্থিত। তিনশো ঘর লোকের বাস এই গ্রামে। জনসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। পাকাবাড়ীর সংখ্যা প্রায় একশো। গ্রামের এক পাশ দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে বাসও চলে।

২। জীবিকা ও সাক্ষরতা—

গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষি নির্ভর। চাকুরী জীবির সংখ্যা মাত্র ২৫ জন। কয়েকজন ছোটখাটো ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত। তবে গ্রামের সাক্ষরতার হার খুবই ভাল। প্রায় ৭৫% লোক সাক্ষর।

ধান এবং পাটই মূল কৃষিজ ফসল। তবে বর্তমানে শাকসব্জী এবং লঙ্কার চাষও করছে অনেকে। গাঁদা এবং রজনী গন্ধা ফুলের চাষও করছে কেউ কেউ। বর্ষাকালে এখানকার বিলে শালুক ফুল ফুটে আলো করে রাখে চারিদিক।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—

গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্র সংখ্যা ৩০০ প্রায়। এখানে পাশের গ্রাম মুচি ফুলবাড়ী থেকেও পড়তে আসে অনেকে। এই স্কুল থেকে বহু কৃতি ছাত্র আজ জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে।

তবে গ্রামে কোন হাইস্কুল নেই। সাধারণ পাঠাগারও নেই।

৪। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

এ গ্রামে, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর যুবকল্যাণ সমিতি নামে যে সংস্থাটি আছে ঐ সংস্থার সদস্যারা এখানে মাঝে মাঝে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী পালন করা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এরা নাটক মঞ্চস্থ করে। আবৃত্তি ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং নৃত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজনও করে এরা।

৫। পূজা পার্বণ—

গোপালপুর গ্রামে রয়েছে একটি কালীমন্দির। ঐ কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ পূজা পাঠ হয়ে থাকে। পাঁঠাও বলি দেওয়া হয়। ঐ কালীমন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে বছর

দশেক আগে। প্রতিবছর জৈষ্ঠ্যমাসের অমাবস্যায় এখানে একটি 'বাউল মেলা' বসে'। ঐ মেলায় দেশের নানা প্রান্ত থেকে শতশত বাউলের সমাবেশ ঘটে থাকে।

এই গ্রামে সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা। এছাড়া কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী ও গণেশ পূজা এবং মনসা পূজাও করে থাকে গ্রামবাসীরা বেশ শ্রদ্ধা ভরেই।

৬। ব্রত পার্বণাদি—

গ্রামের মেয়েরা নানাবিধ ব্রত এবং পার্বণাদিও পালন করে থাকে। শিব রাত্রির ব্রত জন্মাষ্টমী, পৌষ পার্বণ ইত্যাদি ছাড়াও ষষ্ঠী পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, এবং ইতু পূজাও করে থাকে।

(ক) ইতু পূজা—

গোটা অগ্রহায়ণ মাস জুড়েই চলে এই ইতু পূজার অনুষ্ঠান। ইতুর ব্রত পালনের সময় ব্রতিনীরা যে মন্ত্র পাঠ করে তাহলো—

১। "এল ফুল বেল ফুল বনেরও ফুল মাথার চুল।
ঠাকুর তুমি হে বলা ফুল জল খাও খাবলা খাবলা।
বারো মাসে তের পূজো অঘ্রাণ মাসে ইতু পূজো।
ঠাকুর তুমি হেবলা ফুল জল খাও খাবলা খাবলা।

(খ) পাঁচালী—

এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মী পূজার সময়ে প্রায় বাড়ীতেই লক্ষ্মীর পাঁচালী পাঠ করা হয়।

আবার শনিবারে কোন কোন স্থানে শনির পাঁচালীও পাঠ করা হয়ে থাকে।

(গ) সাঝেঁর প্রদীপ—

প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ীতেই দেওয়া হয় সন্ধ্যাদীপ। চলতি কথায় এই দীপ জ্বালানো 'সাঁঝের দীপ' বা 'সাঁঝ দেওয়া' বলেই পরিচিত। ঐ দীপ দেওয়ার সময় গলায় আঁচল জড়িয়ে মেয়েরা মন্ত্র বলে এবং মা লক্ষ্মীকে গৃহে আহ্বান জানায়। ঐ মন্ত্র বা প্রার্থনাটি হলো—

২। 'সাঁঝ দিলাম সলতে—স্বর্গে দিলাম বাতি।
এসো মা লক্ষ্মী আমার ঘরে করতে বসতি।'

৭। লোক উৎসব ও মেলা—

(ক) বাউল উৎসব ও মেলা—

জৈষ্ঠ্য মাসের কালী পূজায় যে বাউল মেলা হয় ঐ মেলাটিই এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য লোক উৎসব। মেলাও বসে ঐ উপলক্ষ্যে।

(খ) রথযাত্রা ও মেলা—

তবে রথযাত্রার উৎসবটিও কম আকর্ষণীয় নয়। ঐ রথযাত্রা উপলক্ষ্যে এখানে একদিনের একটি মেলাও বসে থাকে।

৮। প্রাক্ ইতিহাস ও বর্তমান—

একদা গোপাল পুরে ছিল নীলকর সাহেবদের কুঠী বাড়ী। তবে বর্তমানে কুঠী বাড়ীর চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু ছড়িয়ে আছে ধ্বংসাবশেষ। অতীতের কতো সব ঘটনা বহুল দিনের সাক্ষী ঐ সব ধ্বংস স্তুপ তার কি হিসাব আছে ? মহাকালের গতিপথে কতো কিছুই না গুঁড়িয়ে যায়। কতোদিন আগে নীলচাষ বন্ধ হয়েছে কিন্তু স্মৃতি রয়ে গেছে তবু গ্রাম প্রান্তে গোপালপুরের ভগ্নস্তুপে।

হিন্দু প্রধান গোপালপুর গ্রামটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হলেও সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে আছে উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আজো এ গ্রামের মানুষ। বিজ্ঞান চেতনার অভাব চোখে পড়ে পদে পদে।

ইটাবেড়ে

১। পরিচিতি—

(ক) ইটাবেড়ে বা ইটেবেড়ে গ্রামটি ও গোপালপুর গ্রামের মতোনই হাঁসখালি দক্ষিন পাড়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। গ্রামটি দুটি পাড়ায় বিভক্ত। একটি নতুন ইটেবেড়ে অন্যটি পুরনো ইটেবেড়ে। দুটি পাড়াই হিন্দু পাড়া। তবে এই দুই পাড়ার মাঝখানে কয়েক ঘর মুসলমান আছেন। জনসংখ্যা তিনহাজারের মতো। কৃষিই প্রধান জীবিকা হলেও ব্যবসা এবং চাকুরীর সঙ্গেও যুক্ত আছেন কেউ কেউ। বেশীর ভাগই পাকা ইটের বাড়ী। মাটির ঘর খুবই কম। গ্রামে কোন নদী নেই তবে পুকুর আছে বেশ কয়েকটা।

(খ) নামকরণ—গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে শোনা যায় ইটের বাড়ী দিয়ে ঘেরা বা বেড় দেওয়া বলেই গ্রামের নাম হয়েছে ইটেবেড়িয়া—ইটেবেড়ে।

২। অর্থনৈতিক অবস্থা—

গ্রামটি কৃষি ভিত্তিক গ্রাম এবং সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। এর মূল কারণ হলো উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং সার ও জলসেচেরে ব্যবস্থা। অসম্ভব ভাল ধান ও পাট হয় এ গ্রামে। অন্যান্য ফসল এবং সব্জী ও হয় খুবই ভাল। এছাড়া ব্যবসা এবং চাকুরীর সূত্রেও অবস্থার উন্নতি হয়েছে অনেকেরই।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় তিনশোর মতো ছেলেমেয়ে পড়ে। পড়ানোর মান মোটামুটি ভালই।

বছর কয়েক আগেও গ্রামটি পিছয়ে ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু নবীন প্রজন্ম দ্রুত অগ্রগতি করছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। সাক্ষরতার অভিযানও সফল হয়েছে এ গ্রামে। ফলে সাক্ষরের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় 90% এর কাছা কাছি। ·

৪। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র—

গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে পীচ রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে বাসও চলে। তবে গ্রামের ভিতরের রাস্তা মোটেই ভাল নয়।

গ্রামে রয়েছে একটি পোষ্টাপিস। পাশের গ্রাম বা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালই।

গ্রামে রয়েছে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এখানে সকলেরই চিকিৎসার সুযোগ আছে তবে শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

৫। উৎসব অনুষ্ঠান—(পূজা)—

(ক) গ্রামে দুর্গাপূজা, কালী পূজা, গঙ্গা পূজা এবং সরস্বতী পূজায় আনন্দের হাট বসে যায়।

(খ) ১লা বৈশাখ—এছাড়া প্রতি বছর ১লা বৈশাখ এখানে যে বিশেষ নবীন বর্ষের উৎসব হয় সেই উপলক্ষ্যে দুদিনের একটি মেলাও বসে। ঐ মেলায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছেলেমেয়ে এবং বড়রাও আসে। বছর মিলনে ঐ মেলা হয়ে ওঠে মিলনের মহাতীর্থ।

(গ) গাজন—সারা চৈত্র মাস ধরেই চলে এই উৎসবের প্রস্তুতি। সন্ন্যাসীরা বাড়ী বাড়ী শিব মাথায় নিয়ে যান। গান গান। শোনা যায় বোলান গানও।

শেষ দিনে হয় চড়কের মেলা। সন্ন্যাসীরা বাণ ফোঁড়া, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া প্রভৃতি নানা ধরণের কষ্ট সাধ্য ক্রিয়াকলাপ দেখান।

(ঘ) ব্রত পার্বণ—গ্রামের মেয়েরা ইতু পূজা করে গোটা অগ্রহায়ণ মাস ধরে। সংক্রান্তির দিন বিশেষ পূজা সেরে ঘট বিসর্জন দেয়। পূজার সময় (১) মেয়েরা মন্ত্র বলে—

১। (ক) কার্তিক গেল অঘ্রাণ এলো।
ইতু ঠাকুর ঘরে বসলো।

(খ) পৌষ পার্বণ— গ্রামে ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণও হয়ে থাকে বেশ ঘটা করেই। ঘরে ঘরে ঐ দিন পিঠে পুলি হয়। আলপনা দেওয়া হয়।

৬। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

পূজার সময় মাঝে মাঝে গ্রামের পূজা মণ্ডপে গান বাজনা হয়। থিয়েটারও হয় কখনো কখনো। আবৃত্তি এবং নাচগানও হয়ে থাকে।

৭। লোকগীতি—

মাঝে মধ্যে বাউল গানের আসর বসে থাকে গ্রামে। তবে ভাটিয়ালী বা সারিগান ইত্যাদি শোনা যায় না বিশেষ।

৮। অতীত ও বর্তমান—

সত্যি কথা বলতে বর্তমানে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার দৌলতে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হলেও এখনো মানুষের মন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তবে শিক্ষার হার বাড়ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে গ্রামটি আরো উন্নত তথা আধুনিক হয়ে উঠবে।

চৌগাছায়

কৃষ্ণগঞ্জ থানার নীলবিদ্রোহ খ্যাত চৌগাছায় একদা যেসব উৎসব অনুষ্ঠান হতো বা যেসব ব্রত পার্বণের চল ছিল—আজ তাদের অনেক কিছুই বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালেব প্রবাহে আর্থ সামাজিক সংঘাতের প্রবল আবর্তে। তবু এখনো প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে শোনা যায় সেই সব উৎসব অনুষ্ঠান ও ব্রত পার্বণের ঘটনা। শোনা যায় অতীত দিনের নানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেব কথাও।

অনেক ব্রত পার্বণ বা উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলেও এখনো যে সব অনুষ্ঠানাদি এই গ্রামে হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইতু পূজার কথা। ছোট ছোট কুমারী মেয়েরাই এই ব্রতটি পালন কবে থাকে।

১। ইতুপূজো—

গোটা অগ্রহায়ণ মাস জুড়েই চলে এই ইতু পূজো। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ রবিবারে হয় বিশেষ পূজানুষ্ঠান। তারপরে ঘট বিসর্জন দেয় পুকুরে। সঙ্গে যায় প্রচুর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও। তবে আগে যতটা ঘটা করে এই ব্রত পালন করতো মেয়েরা বর্তমানে তেমনটা চোখে পড়ে না। এই ইতু পূজোর শেষ দিনে ইতুর ব্রত কথা বলা হয়। ইতু দেবীর কৃপায় কিভাবে এক গরীব ব্রাহ্মণ ও তার দুই মেয়ে উমনো ঝুমনোর অবস্থা ভাল হলো সেই কাহিনীই সবিস্তারে বলা হয়ে থাকে এই কাহিনীতে।

এই ইতুর ব্রত কাহিনীর সঙ্গে ধুবুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত অষ্টলোক ঠাকুরের ব্রত কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় অনেকটাই।

চৌগাছার ছোট ছোট মেযেবা এই ইতু পূজার সময়ে যে মন্ত্র বলে থাকে তা হলো—

(ক) "আট চাল আট দুর্বা ঘটের ভিতর থুয়ে
ইতুর পূজা করি সবে এক মন প্রাণ হয়ে।
ইতু দেবী দয়া বতী—ইতু দেন বর।
ধনে ধানে পুত্র কন্যায় বাড়ে সবার ঘর।"

ইত্যাদি।

২। পুণ্যি পুকুর ব্রত—

চৌগাছা গ্রামে এই পুণ্যি পুকুর ব্রতের ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের। গ্রামের পুণ্যি পুকুরটি এখনো সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতিবাহী হয়ে বিরাজ করছে সগৌরবে মুচি পাড়ার পাশে।

বৈশাখ মাসের শুরুতেই ছোট ছোট মেয়েরা ছোট পুকুর কেটে এই ব্রত পালন করে থাকে। বৈশাখ মাসে যাতে পুকুরে জল না শুখায়, গরমে গাছ না মরে এই উদ্দেশ্যেই এই ব্রত পালিত হয়।

এই ব্রতের যে অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে তা যেমন আকর্ষণীয় তেমনি কৌতুহল উদ্দীপকও বটে।

এই অনুষ্ঠানে প্রথমে একটি ছোট্ট পুকুর কাটা হয়। ঐ পুকুরের মধ্যে পোঁতা হয় একটি বেলের ডাল। জল ঢেলে পূর্ণ করা হয় ঐ পুকুরটি। ঐ বেলের ডালটিতে মালা দিয়ে

সাজানো হয় এবং পুকুরটির চারপাশও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। পুকুরে জল ঢালবার সময় মেয়েরা সমবেত স্বরে ছড়া বলে—

১। "পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা—
কে পূজেরে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলা বতী;
ভায়ের বোন পুত্রবতী।
হয়ে পুত্র মরবেনা;
ধরণীতে ধরবেনা।"

তবে এই ব্রতানুষ্ঠানে আগের মতো তেমন উৎসাহ আর দেখা যায় না।

৩। **'দশ পুতুল ব্রত'—**

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে এই দশপুতুল ব্রত শুরু করে মেয়েরা। প্রথমে উঠানের মাঝখানে একটি জায়গা পরিষ্কার করে আলপনা দেওয়া হয়। তার পরে পিটুলি বা আতপ চালের গুঁড়ো জলে দিয়ে ঐখানে দশটি পুতুল আঁকা হয়। এরপরে ঐ দশটি পুতুলের ওপরে ফুল ও দুর্বা দিয়ে পূজো করতে করতে ব্রতিনীবা তাদের কামনা জানায়—

১। 'এবার মরে মানুষ হব—রামের মতো পতি পাব।
এবার মরে মানুষ হব—সীতার মতো সতী হব।
এবার মরে মানুষ হব—লক্ষ্মণের মতো দেবর পাব।
এবার মরে মানুষ হব—দশরথের মতো শ্বশুর পাব।
এবার মরে মানুষ হব—কৌশল্যার মতো শ্বাশুড়ী পাব।
এবার মরে মানুষ হব—কুন্তীর মতো পুত্র পাব।
এবার মরে মানুষ হব—দ্রৌপদীর মতো রাঁধুনী হব।
এবার মরে মানুষ হব—ধরণীর মতো ভার সব।
এবার মরে মানুষ হব—ষষ্ঠীর মতো জেঁয়চ হব।
এবার মরে মানুষ হবে—সকলের আদরিণী হব।

রমণীর যা আদর্শ কামনা তাইই ব্যক্ত হয় এখানে।

তবে এই ব্রতের অনুষ্ঠানটি বর্তমানে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। এখনো যারা এই ব্রতটি পালন করে থাকেন তাঁরা গত হলেই হয়তো পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যাবে এই গ্রাম থেকে ঐ দশপুতুল ব্রতের অনুষ্ঠান।

আমরা ছোট বেলায় এই ব্রতের অনুষ্ঠানের যে আয়োজন দেখেছি এখন আর তেমন দেখা যায় না।

৪। **মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত—**

আসলে এই ব্রতটি হরিষ মঙ্গলচণ্ডীরই ব্রত। তবে 'মঙ্গলচণ্ডী'র ব্রত বলেই পরিচিত এখানে। সধবা মেয়েরাই সারাদিন উপোসী থেকে এই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করে থাকেন। সাধারণত বৈশাখের কোন এক মঙ্গল বারেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মূর্তির পরিবর্তে ঘট স্থাপন করেই ফুল দুর্বা দিয়ে চণ্ডীর পূজা করেন মেয়েরা। বাতাসা কলা, নাড়ু, আতপ চাল ও সন্দেশের ভোগও দেওয়া হয়। এই ব্রত সম্পর্কে একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে।

১। এই ব্রত পালন করলে কি হয় ?
এই ব্রত করলে মনের কষ্ট দূর হয়।

চিরকাল সংসারে সুখ থাকে।
কারো চোখে জল পড়ে না।
মরা জীব বেঁচে ওঠে।
স্বামী পুত্রে সংসার রমণীয় হয়।
সংসারে ও সমাজে খ্যাতি হয়। ....

৫। জয়মঙ্গলবার ব্রত—

চৌগাছায় বর্তমানে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠানটি আর বিশেষ চোখে পড়ে না। তবে অনেকেই জয়মঙ্গলবার ব্রত পালন করে থাকেন। এটি জৈষ্ঠ্য মাসের প্রতি মঙ্গলবারেই পালিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে 'জয়দেব ও জয়াবতীর' যে কাহিনীটি বলা হয় সেটিও বেশ চিত্তাকর্ষক।

৬। বিপত্তারিণী ব্রত—

আষাড় মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার পবে দশমীর মধ্যে শনি ভৌম দিনে এই ব্রতানুষ্ঠানটি করা হয়ে থাকে। বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্যই এই ব্রত।

বিপত্তারিণীর ব্রতে আসলে দেবী দুর্গারিই স্তব বা আরাধনা করা হয়ে থাকে। এই ব্রতের আগের দিন হবিষ্যি করে ঘট পেতে তাতে আমের শাখা ও নানাবিধ ফল ও নৈবেদ্য দিয়ে দেবী দুর্গার পূজা করা হয়ে থাকে।

১। এই ব্রত পালন করলে কি হয় ?

—এই ব্রত পালন করলে সব বিপদ কেটে যায়।
স্বামীর আদর পাওয়া যায়।
পুত্র—পৌত্রাদির সঙ্গে সুখে থাকা যায়।
সংসারে নাম যশ হয়।
শেযে স্বর্গ লাভ হয়।

বিপদত্তারিণী ব্রতে যে বিদর্ভ রাজা ও রাণীর কাহিনীটি বলা হয় সেটি মহাদেব স্বয়ং নারদমুনীকে বলেছিলেন বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। কাহিনীটিও বেশ আকর্ষণীয়।

৭। অন্যান্য ব্রত ও পালা পার্বণ—

আগে অরণ্য ষষ্ঠী, শিবরাত্রি তুঁয় তুষলী, শিব ব্রত গোকুল ব্রত, অক্ষয় বট ও অক্ষয় সিঁদূর ব্রত প্রভৃতি অনেক ব্রতানুষ্ঠান হতো এ গ্রামে। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতেন মাঝের পাড়ার বিখ্যাত 'বামুনদি।' কালে অনুষ্ঠানে ভাঁটা পড়তে থাকে। সময়ের সংঘাতে ক্রমে লুপ্তও হয়ে যায় অনেক ব্রতাদি।

আগে নবান্নের উৎসবে যোগ দিত গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই। বর্তমানে ছেলে মেয়েরা বনভোজন করে বটে কিন্তু নবান্নের তাৎপর্য ভুলে গেছে। একদা যে ভাবে এই শস্য উৎসবটি ঘরে ঘরে সঞ্চার করতো বিপুল আনন্দের আজ আর তেমনটি করে না।

দোল যাত্রা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতিও হয় আজো এই গ্রামে। তবে সবই কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে।

নদীয়া জেলার অন্যান্য অনেক গ্রামের মতোই চৌগাছারও সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব হলো চড়ক উৎসব। প্রকৃত পক্ষে চড়ক উৎসব হলো গণ উৎসব।

চৌগাছার গাজন তলায় চড়ক উৎসব চলে আসছে বহুকাল ধরে। চড়কের গাজনের জন্য সারা বছর ধরেই গ্রামবাসীরা প্রতীক্ষায় থাকে। সন্ন্যাসীদের 'দেবের দেব মহাদেব' ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে আকাশ বাতাস।

চড়কের আগে 'বড়জোল' থেকে তুলে আনা হয় 'শিবের পাট'। যথা নিয়মে সিঁদূর মাখিয়ে পাট পূজো করা হয়। প্রধান সন্ন্যাসী বা মূল সন্ন্যাসী অন্যান্য সন্ন্যাসীদের বিশেষভাবে দীক্ষা দিয়ে কঠোর ব্রত পালনের জন্য প্রস্তুত করেন চৈত্রের প্রথম থেকেই। সন্ন্যাসীরা ধ্বনি দিতে দিতে মাথায় শিব নিয়ে ঘোরেন বাড়ী বাড়ী। তার পরে চড়কের আগের দিন হয় নীল পূজা। কাঁচা বাঁশে আম বেঁধে পূজো করা হয়। তারপরে গাজন তলায় অনেকটা জায়গা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। সেখানে চলে চাষের অভিনয়। লাঙল চালায় সন্ন্যাসীরা অভিনয়ের ভঙ্গীতে। তার পরে ধান ছড়ানো হয়। ঐ ধানের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে দুজন সন্ন্যাসী গড়া গড়ি দেয় ঐ ধানের ওপরে মই দেওয়ার ভঙ্গীতে। তারপরে চলে ধান নিড়ানো ও কাটার অভিনয়। চার পাশে গোল হয়ে ঘিরে থাকে অগণিত দর্শক।

সারা দিন উপোসী থেকে রাত্রে ফলাহার করে সন্ন্যাসীরা প্রায় একমাস ধরে। পরের দিনে চড়কে বন বন করে ঘোরে ঐ সব সন্ন্যাসীরা। বিপুল করতালির দ্বারা অভিনন্দন জানায় দর্শকরা। ঐ উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলাও বসে।

তবে বর্তমানে চৌগাছায় চড়কের উৎসবে ভাঁটা পড়েছে কেউ এক মাস ব্যাপী সন্ন্যাস নেয়না। চড়কে ঘোরাও বন্ধ হয়েছে। নামে মাত্র উৎসব হয় এখন।

৯। ঝাপান—

চৌগাছায় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসার পূজা উপলক্ষ্যে আগে ঝাপান হতো। দূর দূর থেকে ওঝারা আসতো। পরীক্ষা হতো কোন ওঝার মন্ত্রের জোর কতো।

ঐ উপলক্ষ্যে ভাসান গানও হতো। বেহুলা—লখীন্দরের পালা গানও হতো।

বর্তমানে ঝাপান না হলেও পালা গান কিন্তু হয়। এই অনুষ্ঠান মূলতঃ বাগ্দী ও দুলে পাড়াতেই হয়ে থাকে।

১০। পূজা উৎসব—

বর্তমানে পাঁচটি দুর্গা পূজা হয় এবং বেশ কটি লক্ষী, কালী ও সরস্বতী পূজা হয় বিপুল উৎসাহ সহ কারে।

১১। লোক সংস্কৃতি—

(ক) লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বিভিন্ন লোক কথা এবং প্রবাদ প্রবচনের। প্রাচীন—প্রাচীনাদের মুখে আজো শোনা যায় নানা রূপ কথা ও লোক কথার কাহিনী। ছড়া এবং প্রবাদ প্রবচনও শোনা যায়।

(খ) **লোকনাট্য—**

(১) লোকনাট্যের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ''গুণাই যাত্রার।' ছোট বেলায় শোনা এই গুণাই যাত্রার গান এখনো মনে পড়ে। গুণাই এর রূপ বর্ণনার সেই গান—

(১) কি বলবো তার রূপের কথা ভাই জানরে, যেন আসমানের ঐ তারারে।

(২) কৃষ্ণযাত্রা— ....কংসবধ এবং কালীয় দমন পালাও ছিল খুবই জনপ্রিয় পালা গান।

(৩) চাঁদ সদাগর এবং লখীন্দরের পালাতো আজো এই গ্রামে জনপ্রিয়তার শিখরে।

(গ) **লোকগীতি—**

(১) লোকগীতির মধ্যে ভাটিয়ালী গানই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। বহু নামকরা শিল্পী এই গ্রামে জন্মেছেন।

(২) **বাউল—** বাউল গানও প্রচলিত আছে এই গ্রামে। অনেকেই বাউল গান করে থাকে।

(৩) দেহতত্ব এবং আধ্যাত্মিক তত্ব সম্বলিত গানেরও প্রচলন আছে এই গ্রামে।

(ঘ) কীর্তন—

চৌগাছায় রয়েছেন বেশ কয়েকজন ভাল কীর্তনীয়াও। এঁরা গ্রামের ভিতরে এবং বাইরেও নিয়মিত কীর্তন গেয়ে থাকেন। গ্রামে অষ্ট প্রহরও হয়ে থাকে।

(ঙ) লোক শিল্প—

লোক শিল্পের মধ্যে খেজুরের পাতার পাটি, তালপাতার পাখা ও আসন, বাঁশের খাঁচা আটুল, বিত্তি, কাঠের ও তারের কাজ ও বাঁশের বাঁশী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

১২। ইতিহাস ও পরিচিতি—

ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এই চৌগাছা গ্রামেই একদা নীলকুঠী ছিল কুঠীর পাড়ায়। বর্তমানে কুঠীর পাড়া আছে কিন্তু কুঠী বাড়ী ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন চিহ্ন মাত্র নেই আজ।

ইতিহাস খ্যাত বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের প্রাসাদোপম অট্টালিকার ও চিহ্নমাত্র নেই। নেই বিখ্যাত ঠাকুর দালান এবং গোলাবাড়ীও। আছে শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি।

আগে যাত্রা-নাটক গান বাজনা এবং নানাবিধ উৎসবের সমারোহে মুখরিত ছিল এই গ্রাম। কিন্তু বর্তমানে গ্রাম্য দলাদলি এবং রাজনীতির নাগপাশে স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই সব আনন্দ উৎসব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি। এখন ভিডিও হলে ভীড় করছে সবাই।

এই গ্রামের বহু কৃতি সন্তান ছড়িয়ে রয়েছেন দেশের নানাপ্রান্তে। গ্রামের নেতৃত্ব গিয়ে পড়েছে স্বার্থান্বেষীদের হাতে। ফলে নদীয়ার আর দশটা গ্রামের মতোই চৌগাছাও ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে। নবীন প্রজন্মের সম্মুখে নবীন যুগের আলোর মশাল তুলে ধরবার কেউ নেই। যাঁরা ছিলেন তাঁরাও অজ আর গ্রামে আসতে চাননা গ্রাম্য রাজনীতির তিক্ততায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে।

এভাবেই লোকসংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি গ্রাম ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির গর্ভে।

অথচ সত্যিই কি এই পরিণতি প্রাপ্য ছিল এই গ্রামের ?

মালিয়াপোতা

১। পরিচিতি—

তেহট্ট মহকুমা এবং থানার পাথর ঘাটা মৌজার একটি গ্রাম এই মালিয়াপোতা। জলঙ্গীর তীরবর্তী এই গ্রামটি বেশ প্রাচীন। একপাশ দিয়ে বয়ে গেছে সরস্বতী খাল। লোকে বলে সরস্বতী নদী। জলঙ্গী থেকেই বেরিয়েছে ঐ শাখা নদীটি। একদা এই সরস্বতী দিয়ে বড় বড় বাণিজ্য তরী এমনকি স্টীমারও যেতো গোয়ালন্দের দিকে। তবে আজ সরস্বতীর সেই গৌরবের দিন নেই। সে নিছকই একটি খাল মাত্র। তবে বর্ষাকালে ফুলে ফেঁপে ওঠে সে আজো। তখন আদি সেই নদী রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায় আবার। একদা এই সরস্বতীকে নিয়ে রচিত হয়েছে কতো গান, কতো গল্প। কিন্তু সে সবই আজ অতীতের গল্প মাত্র।

২। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণের পিছনে যে দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে তার একটি হলো সুদূর অতীতে কোন এক মালীকে নাকি কে বা কারা মেরে সরস্বতীর পাঁকে পুতে দিয়েছিল সেই থেকেই এই গ্রামের নাম হয়ে যায় 'মালিয়াপোতা।'

অন্য একটি মতে জানা যায় অতীতে এখানে কোন এক জমিদারের বাগান ছিল ঐ বাগানের মালীর পৌত্র বা পোতা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে পরবর্তীকালে এবং সেই থেকেই গ্রামের নাম হয়ে যায় 'মালিয়াপোতা।'

একদা এই গ্রামে ছিল 'নীলকুঠী।' ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে আজো। ছড়িয়ে আছে ঐ কুঠীবাড়ীকে ঘিরে নানাকাহিনী। নীলবিদ্রোহের সময় এই গ্রামের চাষীরাও বিদ্রোহ করেছিল। এখনো বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায় সেই বিদ্রোহের কাহিনী। শোনা যায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের নানা কাহিনীও।

৩। লোকসংখ্যা ও শিক্ষা—

বর্তমানে মালিয়াপোতার লোকসংখ্যা প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি। গ্রামে রয়েছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি জুনিয়র হাইস্কুল। আছে একটি মিশনারী স্কুলও। শতকরা পঞ্চাশ জন লিখতে পড়তে জানে। এই হার আরো বাড়ার সম্ভবনা রয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও সমান তালে এগিয়ে চলেছে আজ।

৪। ধর্মচর্চা—

মালিয়াপোতায় বসবাস করে তিন ধর্মের মানুষ। হিন্দু, মুসলিম এবং খৃষ্টান। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট আছে এই গ্রামে। গ্রামটি মূলতঃ মুসলিম প্রধান গ্রাম। এখানে রয়েছে দুটি মসজিদ এবং একটি গীর্জা। হিন্দু মন্দির না থাকলেও পূজা মণ্ডপ আছে। ঐ মণ্ডপে দুর্গাপূজা এবং কালীপূজা হয়ে থাকে। গ্রামে সরস্বতী পূজাও হয়। শিব চতুর্দশী এবং অন্যান্য উৎসবও হয়ে থাকে।

মুসলমানদের ইদলফিতর, ঈদ এবং মহরম যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খৃষ্টানদের বড়দিনের উৎসবে রীতিমতো জাঁকজমক হয়ে থাকে গীর্জায়। আলোর মালায় সাজানো হয় গীর্জাটিকে। শত শত লোকের ভীড় হয় ঐ সময় গীর্জায়। ছোট খাটো মেলাও বসে।

৫। লোকসংস্কৃতি—

এই গ্রামের বিভিন্ন ধর্মের জনগণ নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নানাবিধ ব্রত পার্বণ পালন করে থাকেন। লোকযাত্রা এবং পাঁচালী গানের প্রচলনও ছিল এককালে। তবে গুণাই যাত্রা, মনসার ভাসান, তর্জা ইত্যাদির প্রচলন বর্তমানে না থাকলেও এই গ্রামে বাউল গানের ব্যাপক প্রচলন আছে। নদীয়া তথা সারা বাংলার বিখ্যাত বাউল শিল্পী সনজিৎমণ্ডলের বাড়ী এই মালিয়া পোতাতেই। তিনি এই গ্রামের গর্ব।

৬। অর্থনৈতিক চিত্র—

মূলতঃ কৃষিভিত্তিক গ্রাম হলেও ব্যবসা এবং চাকুরীর সঙ্গেও যুক্ত আছেন অনেকে। এখানে রয়েছে বাসস্ট্যাণ্ড এবং একটি আইসক্রিম তৈরীর কারখানা। আছে একটি ব্যাঙ্কও। আর্থিক চিত্র এই গ্রামের ভাল বলেই জানালো বিলকিস্ খাতুনরা।

করিমপুরে

১। পরিচিতি—

করিমপুরকে আজ আর গ্রাম বলা যায় না। রীতিমতো জমজমাট গঞ্জের রূপ নিয়েছে আজ এই করিমপুর। দোকান-বাজার, স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্ক, অফিস ইত্যাদি নিয়ে করিমপুর আজ এক ব্যস্ত শহরই প্রায়।

বর্তমানে করিমপুরে রয়েছে দুটি পঞ্চায়েত। জনসংখ্যা তিরিশ হজারেরো বেশী। করিমপুর থানাকে আরো বেশী সক্রিয় করে তোলার জন্য মুরুটিয়া, হোগলবেড়িয়া এবং থানার পাড়া থানার সৃষ্টি করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে করিমপুরে পৌর সভা গঠিত হবে। অভয় পুর, মধ্য গোপালপুর, আনন্দপল্লী, রামকৃষ্ণপল্লী, লক্ষ্মীপাড়া প্রভৃতি ছোট বড় গ্রামের সমন্বয়েই বর্তমান করিমপুর গ্রাম।

২। নামকরণ—

নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম হলো এই করিমপুর। এর নামকরণের সঠিক ইতিহাস না পাওয়া গেলেও প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে একদা এখানে 'করিম শেখ' বলে জনৈক প্রভাবশালী মুসলিম ভদ্রলোক বাস করতেন। ঐ ব্যক্তির নাম থেকেই এই স্থানের নাম হয় করিমপুর। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পরবর্তীকালেই ধীরে ধীরে করিমপুরের লোক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ ধনে জনে হাটে বাজারে সমৃদ্ধ হয়েছে এই করিমপুর।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

করিমপুরে রয়েছে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। একটি বালকদের জন্য এবং অন্যটি বালিকাদের জন্য। রয়েছে একটি কলেজও। এছাড়া রয়েছে ছটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেশ কয়েকটি কেজি স্কুলও। শিক্ষার হার শতকরা প্রায় নব্বুই। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সজাগ। ফলে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তরেও পঠন-পাঠনের মান নদীয়া জেলার অন্যান্য অংশ থেকে যথেষ্ট উন্নত।

৪। স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা—

করিমপুরের গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এই এলাকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ। প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সুচিকিৎসা পাবার আশায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীদের ব্যবহার ও যথাযথ। এছাড়াও বহু প্রাইভেট ডাক্তার এবং নার্সিংহোমও আছে এখানে। এক কথায় বলা যায় করিমপুরবাসীরা আধুনিক চিকিৎসার সবরকম সুযোগ সুবিধাই পেয়ে থাকেন।

ব্যবসা বাণিজ্য চাকুরী এবং কৃষিই করিমপুর বাসীদের জীবিকার উৎস। এখানে রয়েছে একটি 'সুপার মার্কেট'। রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কও। অসংখ্য হোটেল লজ ও দোকান, বাজারে সর্বদাই ভীড় লেগে আছে।

৫। যোগাযোগ—

ব্যস্ত বাসস্ট্যাণ্ডে প্রতিনিয়তই যাওয়া আসা করছে শত শত বাস ট্যাক্সি, লরী, ট্রেকার ও অন্যান্য যান। সরকারী ও বেসরকারী দূরপাল্লার বাসও ছাড়ছে এখান থেকে। তবে রেল যোগযোগ নেই এটাই যা বেদনার।

৬। পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠান—

শারদীয়া দুর্গা পূজার উৎসবই করিমপুরের সবচেয়ে বড় উৎসব। চারিদিকে তখন বসে যায় আনন্দের হাট। আলোর মালায় সাজে তখন গোটা করিমপুর বিশেষ করে হোগালবেড়িয়ার সার্বজনীন দুর্গাপূজা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষের ভীড় হয় এখানে।

দুর্গা পূজা ছাড়াও কালীপূজা, রথযাত্রা, ঝুলন, লক্ষ্মীপূজা এবং সরস্বতী পূজাতেও যথেষ্ট আড়ম্বর লক্ষ্য করা যায়।

দুর্গা পূজার ভাসানের দিন জলঙ্গীতে শুরু হয় নৌকার বাইচ। তুমুল উৎসাহের সঙ্গে চলে এই প্রতিযোগিতা। বিপুল করতালি আর বহুকণ্ঠের সরব উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে নদীর দুই পার।

লক্ষ্মীপূজার সময় চলে পাঁচালী গান এবং কালী পূজার সময় বসে বাউল ও কবিগানের আসর।

৭। ব্রত পার্বণাদি—

করিমপুর আজ আধাশহরে রূপান্তরিত হলেও এখনো এই অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে নানা ধরণের ব্রত ও পার্বণাদি পালনের রীতিলক্ষ্য করা যায়। ঐসব ব্রত পার্বণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

(ক) ইতুপূজো—

নদীয়ার অন্যান্য অনেক গ্রামের মতন এই অঞ্চলের ছোট ছোট মেয়েরাও ভক্তিভরে ইতুপূজো করে থাকে এবং অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারে ঘট বসিয়ে ফুল দুর্বা এবং ভোগাদি দিয়ে ইতুর পূজো সেরে ইতুর ব্রত কথা শোনে। পূজার সময়ে ব্রতিনীরা মন্ত্র বলে—

১। "এল ফুল বেল ফুল তুলতে গেলাম।
ইতুর পাঁচটি কথা শুনে এলাম।
ইতুর কথা শুনলে কি হয় ?
নিপুত্রের পুত্র হয়। নির্ধনের ধন হয়।
বনের ফুল মাথার চুল।
ঠাকুর আমি হেবলা।
তুমি ফুল খাও খাব্‌লা খাব্‌লা।

(খ) অশোক ষষ্ঠীর ব্রত—

এই অঞ্চলে চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন এই ব্রত পালন করে থাকেন মায়েরা। ব্রত শেষ হলে ছটি মুগকলাই ও অশোক কুঁড়ি দই দিয়ে মেখে খান ব্রতিনীরা। এই দিন ভাত খাওয়া নিষেধ। ব্রত শেষ হলে ফলমিষ্টি বা লুচি পরোটা খেয়ে থাকেন ব্রতিনীরা।

(গ) সুবচনীর ব্রত—

এই ব্রতের অনুষ্ঠানটি বাড়ীর উঠানে করা হয়। উঠানে একটি চারকোণা ঘর কেটে সারি সারি জোড়া হাঁসের আলপনা দেওয়া হয়। চারপাশে ঘট বসিয়ে আমের পল্লব দেওয়া হয় ঐসব ঘটে। একটা ছোট গর্ত কেটে ঐ গর্তটি দুধ দিয়ে ভর্তি করা হয়। এরপরে শাঁখ বাজিয়ে পূজা শুরু হয়। পুরোহিত মন্ত্র বলেন। ঘন্টা বাজান। ফুল দুর্বা দেন। পূজাশেষ হলে ব্রতিনী এয়োস্ত্রীদের হাতে খৈ, পান, কলা, তেল, সিঁদুর প্রভৃতি দেন। সধবা মেয়েরা সারি সারি দাঁড়ালে ব্রতিনী তাদের পায়ে জল ঢেলে আঁচল ভিজিয়ে পুত্র বধূর মাথায় দেন। উপস্থিত সবাইকে প্রসাদ দেন এবং পুত্রবধূর কাঁখে জলপূর্ণ কলসী দিয়ে ঘরে তোলেন।

মূলতঃ পুত্রবধূর কল্যাণ কামনাতেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এই ব্রতানুষ্ঠানটি নদীয়ার অনেক গ্রামেই আগে হতো তবে বর্তমানে তেমন চোখে পড়ে না আর।

৮। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

এখানে স্কুলে কলেজে এবং বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থায় সারা বছরই নানা ধরণের সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সঙ্গীত আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিতর্কসভা, ক্যুইজ, অন্তক্ষরা, শ্রুতিনাটক এবং নাটকও মঞ্চস্থ হয়ে থাকে। এছাড়া বেশ কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হয় এখান থেকে।

সুর গান্ধার, ঐক্যতান, সঙ্গীতভবন যেমন এই করিমপুরের সঙ্গীত ধারাকে পুষ্ট করে চলেছে। তেমনি সর্বদাই শরৎ সংস্থাটি নাট্য প্রতিভার বিকাশে সজাগ রয়েছে।

সুবিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক শ্রী প্রণব আচার্য্য মহাশয় এই করিমপুরেরই বাসিন্দা।

এই করিমপুরের বহু কৃতি সন্তান আজ ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে।

নাটনা ও সোনাদহ

১। পূজাপার্বণ—

(ক) ছিন্নমস্তা—

তেহট্ট ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলেই পড়বে এই নাটনা গ্রাম। অশথতলায় থামলেই চোখে পড়বে সদ্য নির্মিত একটি কালী মন্দির—ছিন্নমস্তার মন্দিরওটি। মন্দিরটি আগেছিল মাটির ঘর মাত্র। ১৩৭৭ সালের ১৮ই কার্তিক ইটের মন্দির হয়েছে কালী বাবুর প্রচেষ্টায়। দারিয়াপুরের বাবুরাই পূজা করতেন আগে। বর্তমানে একটি পূজা কমিটি হয়েছে। ঐ কমিটিই বাৎসরিক পূজা পরিচালনা করে থাকে। দুর্গাষষ্ঠীর একমাস পরে ছিন্নমস্তার বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে ধুমধাম করে। মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। দেবীর ফটো বাঁধানো আছে। তবে বাৎসরিক পূজার সময়ে মূর্তি তৈরী হয়ে থাকে।

(খ) অন্যান্য পূজানুষ্ঠান—

এই দেবীকে জাগ্রতা বলেই মান্য করে সকলে। ছিন্নমস্তার বিশেষ পূজানুষ্ঠান ছাড়াও দুর্গা পূজা এবং লক্ষ্মী পূজা ও সরস্বতী পূজাও হয়ে থাকে বেশ আড়ম্বর করেই।

(গ) ব্রতপার্বণ—

নাটনার হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে যেসব ব্রত পার্বণাদি প্রচলিত আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইতুপূজা, শিবরাত্রির ব্রত, চাপড়া ষষ্ঠীও মূলাষষ্ঠীর ব্রত ইত্যাদি।

১। শিবরাত্রির ব্রত—

ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশীরদিন ব্রতিনীরা উপবাসী থেকে শিবের মাথায় জল দেয় এবং ফল ও পূজা উপকরণ সহ শিবের পূজা করে। অঞ্জলি দেবার সময়ে ব্রতিনীরা সুর করে বলে—

(ক)
'বনের ফুল তুলতে গিয়ে দেখলাম লতাপাতা।
শিবচরণে লুটায় দেখি শিবের মাথার জটা।
আকন্দ আর বিল্বপত্রে তোলা গঙ্গা জল।
এই পেয়ে তুষ্ট হও ভোলা মহেশ্বর।'

তারপরে তারা মন্ত্রোচ্চারণ করে—

(খ)
নমঃ শিবায় নমঃ। নমঃ শিবায় নমঃ।
নমঃ হরায় নমঃ নমঃ রুদ্রায় নমঃ।

২। চাপড়া ষষ্ঠীর ব্রত—

এই ব্রতানুষ্ঠানটি ভাদ্রমাসে করা হয়। পিটুলির পুতুল ও চাপড়া প্রস্তুত করে ব্রতিনীরা শুদ্ধচিত্তে উপবাসী থেকে মাষষ্ঠীর পূজা করেন এবং ঐ পুতুল ও চাপড়া দীঘির জলে ভাসিয়ে দেন। পুত্রবতী ব্রতিনীরা আঁচলে কলাবেঁধে পুত্রকন্যা কোলে নিয়ে এরপরে মাষষ্ঠীর ব্রত কথা শোনেন। এইদিন ব্রতিনীরা ভাত খান না। লুচি অথবা ফল মূলাদি আহার করে থাকেন।

৩। মূলা ষষ্ঠীর ব্রত—

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীর দিন এই মূলাষষ্ঠীর ব্রত পালন করে থাকেন এই অঞ্চলের মেয়েরা। সারাদিন উপবাসী থেকে ব্রতিনীরা মাষষ্ঠীর পূজা করেন। এই দিন রুটি ও মূলা খাবার প্রথা। ভাত বা আমিষ খাওয়া নিষেধ। মূলা দিয়েই করা হয় ষষ্ঠীর পূজা।

২। পরিচিতি—

নাটনা গ্রামটি নদীয়ার এই অংশের আর পাঁচটা গ্রামের মতোই একটি সাধারণ গ্রাম। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে গ্রামে। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট আছে এখানে। ওপার বাংলা থেকেও বেশ কিছু লোক এখানে এসে বসবাস করছেন। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পাঠ শুরু হয়। পরবর্তী স্তরে তারা যায় তেহট্টের হাইস্কুলে। শিক্ষার হার খুব ভাল নয়। কৃষিই প্রধান জীবিকা গ্রামবাসীর। কিছু লোক ব্যবসা বাণিজ্যও করে। চাকুরীও করেন এ গ্রামের কয়েকজন। এই গ্রামের পাশেই আছে বিখ্যাত কুঠীবাড়ী।

৩। কুঠীবাড়ী—

এই অংশের বিখ্যাত কুঠীবাড়িটি যদিও নাটনা মৌজার অন্তর্গত তবুও তেহট্টের একটি পল্লী সোনাদহেই অবস্থিত। অবশ্য এখনো লোকে ঐ কুঠীবাড়ীটি নাটনার কুঠীবাড়ী বলেই জানে।

সোনাদহের বিল পাড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে প্রাচীন কুঠীবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। চওড়া দেয়াল, চৌবাচ্চা, নীল জ্বাল দেওয়ার জায়গা, জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা সবই লক্ষ্য করা যায় আজো। প্রায় একশো বিঘা জমি জুড়ে ছড়িয়ে আছে এক কালের বিখ্যাত কুঠীবাড়িটি।

এই অংশের সবচেয়ে বড় কুঠীবাড়ী ছিল এটিই। পরবর্তীকালে এই কুঠীবাড়ীটি কিনে নেন পাল চৌধুরীরা।

কুঠী বাড়ীর বিশাল বাংলোটি ভেঙে বর্তমানে নতুন বাড়ী তৈরী করে বাস করছেন কুঠী বাড়ীর নায়েবের বংশধরগণ।

ঐ বাংলোর সামনেই রয়েছে প্রাচীন এক বিশাল আম গাছ এবং দক্ষিণে রয়েছে সুগভীর এক দীঘি। অবাধ্য চাষীদের নাকি ঐ আমগাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক মারা হতো। নীলকর সাহেবদের নানা অত্যাচারের কাহিনী আজো ছড়িয়ে আছে সোনাদহের আশে পাশে।

৪। সোনাদহ—

(ক) সোনাদহ নামটি এসেছে একটি দহ বা জলাশয় থেকে। শোনা যায় ঐ দহে আগে নাকি সোনা পাওয়া যেতো। দহের তীরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলে সোনার থালা বাটি গ্লাস উঠে আসতো উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে তবে অনুষ্ঠান শেষ হলে ফিরিয়ে দিতে হতো সেসব। একবার কে বুঝি ফিরিয়ে দেয়নি সেই থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে সবকিছু।

(খ) লোকশ্রুতি—

এ প্রসঙ্গে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে সেটি হলো—বহুদিন আগে ঐ দহের তীরে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। ঐ সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকতো একটি বাছুর। বাছুরটি ক্রমে বড় হয়ে পরিণত হলো ষাঁড়ে। একদিন কোথা থেকে একটি সোনালী রঙের ষাঁড় এসে আক্রমণ করলো ঐ সন্ন্যাসীর ষাঁড়কে। বেঁধে যায় তুমুল লড়াই। শেষ পর্য্যন্ত মারা পড়ে দুটি ষাঁড়ই। দুটি ষাঁড়কেই শেষ পর্য্যন্ত ঐ দহের জলে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে যান ঐ সন্ন্যাসী।

এরপর থেকেই ঘটতে লাগলো ঐসব আশ্চর্য্য ঘটনা। সোনার বাসন উঠে আসতো বলেই নাম হয়ে গেল ঐ জলাশয়ের সোনাদহ। ক্রমে ঐ স্থানের নামও হয়ে গেল সোনাদহ।

ক্রমে ঐ সোনাদহের চারপাশে হয়ে যায় গভীর জঙ্গল। চাষের প্রয়োজনে ঐসব জঙ্গল যখন পরিষ্কার করা হয় তখন বড় বড় হাড়ি এবং কড়াই ও অন্যান্য বহু জিনিষ পাওয়া যায়।

৫। সোনাদহের শিক্ষা ও ব্রত পার্বণ—

(ক) শিক্ষা—

এখানে রয়েছে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার হার শতকরা সত্তর ভাগ।

(খ) পূজা—

দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী, কালী এবং সরস্বতী পূজা ছাড়া মনসা পূজাও হয় এখানে।

(গ) ব্রত পার্বণ—

মেয়েরা ইতুপূজা, সূর্য্য পূজা এবং বিপত্তারিণীর ব্রতাদি পালন করে থাকেন নিষ্ঠাভরেই।

মাঝদিয়া

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাঝদিয়া একটি প্রাচীন জনপদ। বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় আট হাজার। দেশ ভাগের পরেও নানা সময়ে এখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাঝদিয়ার উত্তর পশ্চিমে মাথাভাঙা এবং দক্ষিণ পূর্বে ইছামতী নদী এর বুক চিরে চলে গেছে কলকাতা—ঢাকা রেলপথ। জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। এর মাটিতে ধান-পাটের চাষ ভাল হবার মূল কারণ হলো এখানকার দোঁয়াশ মাটি। খেজুর গুড়ের জন্য বিখ্যাত মাঝদিয়ার হাট।

২। নামকরণ ও ইতিহাস—

এই গ্রামের মাঝখান দিয়ে শোনা যায় চলে গেছে কল্পিত কর্কটক্রান্তি রেখা। আর তাইই এই স্থানের নাম হয়েছে মাঝদিয়া।

আজ অবশ্য মাঝদিয়াকে আর গ্রাম বলা যায় না। স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্ক, অফিস, হাট, বাজার, রেলষ্টেশন, সিনেমা হল নিয়ে গম্ গম্ করছে আজকের মাঝদিয়া। তবে আগে যেসব মেলগাড়ী যথা আসাম মেল, সুর্মা মেল, দার্জিলিং মেল প্রভৃতি যাতায়াত করতো বর্তমানে আর সেই সব মেল যাতায়াত করে না। যেহেতু বাংলাদেশের সঙ্গে রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বর্তমানে। এই মাঝদিয়ার ওপর দিয়ে সুভাষ চন্দ্র, গান্ধীজি, জিন্না, নেহরু, চিত্তরঞ্জনের মতো বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি যাতায়াত করেছেন একদা। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল এখানে যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার করুণ স্মৃতি স্মরণ করে প্রবীণরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এখনো।

৩। স্বাধীনতা আন্দোলনে মাঝদিয়া—

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই মাঝদিয়া। স্বদেশী পণ্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য যে আন্দোলন উঠেছিল ভারতবর্ষে সেই আন্দোলন ঝড় তুলেছিল এই মাঝদিয়াতেও। ৪২এর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা মাঝদিয়া সহ কৃষ্ণগঞ্জ, চৌগাছা, চন্দন নগর, দেয়ানবেড়ে, বাণপুর প্রভৃতি অসংখ্য জনপদ। বহু নেতা কারাবরণও করেছিলেন সেই সময়। ঐসব নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুধীর রঞ্জন লাহিড়ী, ভোলানাথ দত্ত, তুষার ভাদুড়ী, ননী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, কৃষ্ণঘোষ, শান্তি মৈত্র, রমেশ চন্দ্র সান্যাল, সত্যেন ভট্টাচার্য, নীলগোপাল বিশ্বাস প্রমুখ। সর্বস্ব পণ করে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এঁদের অনেকেই।

দেশ স্বাধীন হবার পরে দেখা যায় মাথাভাঙার পূর্ব পাড়ের মাঝদিয়া, বাণপুর চলে গেছে পূর্ব পাকিস্থানে। তিন দিন পরে কৃষ্ণনগরের মহারাণী, শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী, তুষার ভাদুড়ী ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় ঐ অংশ আবার ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

বর্তমানে এখানে রয়েছে তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি ডিগ্রী কলেজ। শতাব্দী প্রাচীন রেল বাজার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাঝদিয়া মহা বিদ্যালয়টি। আছে কয়েকটি নাসরি স্কুলও। শিক্ষার হার প্রায় শতকরা আশি।

৫। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

সারাবছর ধরেই এখানে চলে নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ-গান থেকে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ক্যুইজের প্রতিযোগিতাও চলে বিভিন্ন ক্লা ব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এখানে 'প্রগতিবাদী নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শিল্পী পরিষদের উদ্যোগে ঐ সময় বিসর্জন, ডাউন ট্রেন, দুই বিঘা জমি, মহেশ প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয় বেশ সাফল্যের সঙ্গেই।

বর্তমানে 'শিল্পী পরিষদ' বন্ধ হয়ে গেলেও 'কোরাস্' শাখাটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে নবীন উদ্যমে। বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছে 'কোরাস্'।

৬। সাহিত্য চর্চা—

কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে এই মাঝদিয়াই। এখান থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকা 'প্রথমা'। পরবর্তীকালে প্রগতি, নবাঙ্কুর, বনপলাশ, দেবদূত, স্পন্দন, কচিপাতা, প্রতিধ্বনি প্রভৃতি বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে 'কৃষি সাহিত্য' পত্রিকাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

৭। খেলাধূলা ও শরীর চর্চা—

গোটা জেলাতেই খেলাধূলা ও শরীর চর্চার ক্ষেত্রে খ্যাতি আছে মাঝদিয়ার। এখানে যে 'শীল্ড' খেলা হতো ফুটবলে সেই প্রতিযোগিতায় আগে কুষ্ঠিয়া, রাজসাহী, বাটা, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট ও নবদ্বীপ থেকেও নামী দল খেলতে আসতো।

বর্তমানে অবশ্য ফুটবল প্রতিযোগিতার স্থান নিয়েছে ক্রিকেট ও ভলিবল প্রতিযোগিতা।

৮। পূজা-পার্বণ-ব্রতাদি—

মাজদিয়াতে পাঁচ ছটি দুর্গা পূজায় যেমন আড়ম্বর হয় তেমনি কালী পূজা এবং সরস্বতী পূজাতেও যথেষ্ট হৈ হৈ হয়ে থাকে। লাহিড়ী বাড়ীর পূজামণ্ডপের খ্যাতি আজো ছড়িয়ে আছে গোটা জেলায় যদিও বর্তমানে লাহিড়ী বাড়ীর সেই গৌরবের দিন আর নেই।

অতীতে এখানে মেয়েদের বিভিন্ন ব্রতানুষ্ঠানের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে ষষ্ঠী পূজা ও জয়মঙ্গল ব্রত ছাড়া তেমন কোন ব্রতের প্রচলন নেই।

তবে মাঝদিয়ার রথযাত্রার উৎসবটি জমে উঠছে ধীরে ধীরে।

৯। লোকগীতি—

বর্তমানে মাঝদিয়া গঞ্জের রূপ নিলেও বিভিন্ন লোগগীতির প্রচলন কিন্তু আজো আছে। বাউল গানের জনপ্রিয়তা যেমন আছে এখানে তেমনিই লালন গীতিরও সমাদর আছে। আছে বেশ কয়েকটি কীর্তনের দলও।

১০। যোগাযোগ ব্যবস্থা—

বাস এবং রেল যোগা যোগ বেশ ভালই যদিও বাজারের রাস্তাটির অবস্থা করুণ। ভ্যান, অটো রিক্সাও আছে প্রচুর এখানে।

১১। উপসংহার—

একদা বহু জ্ঞানীগুণী ও খ্যাতিমান ব্যক্তির বাস ছিল এখানে। ছিল বহু নামকরা ডাক্তারও। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে অনেকেই বাইরে চলে গেছেন। নবীন প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা মাঝদিয়ার পুরনো দিনের গৌরবকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় কাজে নেমেছেন। তাদের প্রচেষ্টা সফল হোক নদীয়াবাসী হিসাবে এই কামনাই করি। একদা আমাদের কাছে এই মাঝদিয়া ছিল স্বপ্নের লীলাভূমি। কিশোরে দেখা সেই মাঝদিয়া নতুন করে জেগে উঠুক আবার সেই স্বপ্ন দেখার জন্যই প্রতীক্ষায় আছি আজো।

ইছাপুর

১। পরিচিতি—

অঞ্জনার তীরবর্তী দোগাছির নিকটবর্তী গ্রাম এই ইছাপুর। গ্রামটি প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন গ্রাম। কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক গ্রাম এটি। একদা এই গ্রামের পাশ দিয়ে কুলু কুলু বেগে বয়ে যেতো অঞ্জনা নদী। বর্তমানে সেই অঞ্জনা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দীঘি খনন করা হয়েছে আবার মাঝে মাঝে চাষও হচ্ছে প্রাচীন অঞ্জনার খাতে।

২। নামকরণ—

'ইছাপুর' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হলো ইশা+পুর। অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছাকরে যাওয়া হয়। গ্রামটির নামকরণের পিছনে যে দুটি কাহিনী এই গ্রামে প্রচলিত আছে সে দুটির একটি হলো একবার নাকি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই গ্রামে ইচ্ছা করে নেমেছিলেন বা পদার্পণ করেছিলেন। সেই থেকেই গ্রামের নাম হয় ইছাপুর।

দ্বিতীয় কাহিনীতে জানা যায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৭ বঙ্গাব্দে দোগাছির গোপাল দত্ত নামে এক ব্যক্তির গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ৫১ বিঘা পতিত জমিদান করেন। গোপাল দত্ত ঐ ভূমি পরিষ্কার করে বাস যোগ্য করে তোলেন। পরে কোন এক সময় ঐ গ্রামে মহারাজা বেড়াতে আসেন এবং গায়ক ও রাজার ইচ্ছাতে ঐ গ্রামের নাম রাখা হয় ইছাপুর।

৩। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার হার—

বর্তমানে ইছাপুরে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইছাপুর জি. এস. এফ. পি. বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিনশো। পাকা দেয়াল এবং টালির ছাদের নীচেই চলছে ক্লাস। তেত্রিশ শতক জমি আছে বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক। ছোট একটা খেলার মাঠও আছে। তিনজন শিক্ষক ক্লাস চালাচ্ছেন। শিক্ষার মান খুব যে ভাল এমন দাবী করতে পারেন না স্বয়ং প্রধান শিক্ষকও।

দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি পরিচিত পাট প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে। এটি স্থাপিত হয়েছে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে। প্রায় দেড়বিঘা জমির ওপরে গড়ে উঠেছে এই বিদ্যালয়টি। খেলার মাঠ আছে। পাকা দেয়াল। ছাদ টিনের। মোট চারজন শিক্ষক আছেন। ছাত্র সংখ্যা আড়াইশো। ইদানীং একটু পরিদর্শনে কড়াকড়ি দেখা দিলেও মান যে খুব একটা বেড়েছে তেমন মনে হয় না।

গ্রামে শিক্ষার হার শতকরা ষাটের মতো। তবে সুখের কথা বর্তমানে গ্রামবাসীরা ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন।

৪। স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি—

এই গ্রামের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হলেও মুক্ত বাতাসের কল্যাণে জনস্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই। হাতুড়ে ডাক্তার আছেন গ্রামে। তাঁরাই চিকিৎসা চালান ছোটখাটো অসুখের ব্যাপারে। তবে বাড়াবাড়ি কিছু হলে কৃষ্ণনগরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। পানীয় জলের জন্য তিনচারটি টিউবওয়েল আছে।

ইছাপুরের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। তবে ব্যবসা এবং চাকরীতে নিযুক্ত আছেন বেশ কয়েকজন। মোটের ওপর গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই বলা যায়।

৫। যোগাযোগ ব্যবস্থা—

বর্তমানে পঞ্চায়েতের কল্যাণে গ্রামের রাস্তায় ইট বিছানো হয়েছে। কৃষ্ণনগরের সঙ্গে বাসরুট আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালই বলা যায়। নিকটবর্তী রেলস্টেশন হলো কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন।

৬। পূজা—

দুর্গা, কালী ও সরস্বতী পূজার সময় যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। আগে চৈত্র শেষে গ্রামে গাজন ও চড়ক হতো তবে বর্তমানে আর হয় না।

৭। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

গ্রামে রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন পূজার সময় আবৃত্তি ও গানের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা না থাকলেও বেশ কয়েকজন কবিতা ও গল্পও লেখেন বলে জানা গেল।

মাঝে মাঝে গ্রামের ছেলেরা মঞ্চ বেঁধে নাটকও মঞ্চস্থ করে থাকে। তবে নিয়মিত নাট্যচর্চা হয়না এই গ্রামে।

৮। ব্রত পার্বণাদি—

এই গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা যেমন ইতুপূজায় উৎসাহী বড়রা তেমনি আবার জয়মঙ্গল ও ষষ্ঠী পূজায় আগ্রহী।

এছাড়া পৌষ পার্বণও পালিত হয় এখানে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই। তবে নবান্নের উৎসব বড় একটা পালিত হয় না এখন।

৯। লোকগীতি—

লোকগীতির মধ্যে বাউলগানের প্রচলন আছে এখানে। মাঝে মধ্যে কবি গানের আসরও বসে বিভিন্ন পূজা উপলক্ষ্যে। তাছাড়া প্রায়ই কীর্তনের আসর বসে গ্রামের পূজা মণ্ডপে।

দোগাছি

১। পরিচিতি—

দোগাছি পঞ্চায়েতের অধীন ১১৩ নং মৌজার নাম হলো দোগাছি। এর পাশ দিয়ে বয়ে যেতো এককালে কুলু কুলু ধ্বনি তুলে অঞ্জনা নদী। তবে আজ সেই অঞ্জনা মৃত। এখন তার বু ক চাষ হচ্ছে পুকুরও কেটেছে অনেকে যত্রতত্র তার খাতে। বহু স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম এই দোগাছি। এ গ্রামের ইতিহাস যেমন প্রাচীন তেমনিই নানা লোকঐতিহ্যেও সমৃদ্ধ কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী এই গ্রামটি।

২। নামকরণ—

দোগাছির অর্থ হলো দুটি গাছ। ঐ দুটি গাছ থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে দোগাছি বলে মনে করেন অনেকে। আবার কেউ বলেন এখানে বহু পূর্বে ছিল দুটি পাড়া। ঐ দুই পাড়ায় হতো দুটি চড়ক। সেই দুটি চড়ক গাছ থেকেই হয়েছে দোগাছ—দোগাছি।

আবার অনেকে বলেন বহু দিন আগে এই গ্রামের দুই প্রান্তে ছিল দুটি বিশাল বট আর অশথ গাছ। ঐ দুই গাছ থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে দোগাছ—দোগাছি।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী গ্রাম এই দোগাছিতে শিক্ষার চর্চাছিল বহু যুগ পূর্ব থেকেই। এখানে টোল এবং চতুষ্পাঠীও ছিল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল প্রাথমিক এবং মাইনর স্কুলও। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আছে একটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও। শিক্ষার হার শতকরা আশির ওপরে।

৪। ইতিহাস ও পুরাকীর্তি—

দোগাছির ইতিহাস অতি প্রাচীন। যখন কৃষ্ণনগরের সৃষ্টি হয়নি তারো আগে থেকেই এই দোগাছি ছিল সমৃদ্ধ গ্রাম বলে মনে করেন অনেকে। ভারত তথা বাংলার নীলবিদ্রোহের সময়েও এই দোগাছির কৃষকরা নিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

(ক) গোপাল মন্দির—

এখানে দ্বিজ বলরাম দাসের একটি গোপাল মন্দির ছিল বলে জানা যায়। বাল গোপালের মূর্তি ছিল ঐ মন্দিরে। পরে ঐ মূর্তিটি নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপে। তবে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে দ্বিজ বলরাম দাসের তিরোভাব তিথিতে ঐ বিগ্রহটি আনা হয় এখানে।

(খ) শিব মন্দির—

দ্বিজ বলরাম দাসের শ্রীপাটের অদূরে ছিল একটি দক্ষিণ মুখী শিব মন্দির। রাজা রাঘবের আমলে তৈরী ঐ শিব মন্দিরটির টেরাকোটার কাজ ছিল নাকি দেখার মতো। তবে বর্তমানে মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই।

(গ) কপিলমুণী—

বছর তিরিশ পূর্বে এখানে কপিলমুণীর যে মূর্তিটি পাওয়া যায় সেটি এখন কলকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামে জমা আছে। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ঐ মূর্তিটি নাকি কপিলমুণীর নয়। ওটি আসলে 'মত্তময়ূর শৈব সম্প্রদায়ের কোন আচার্যের মূর্তি বলেই মনে করেন তাঁরা।

(ঘ) মহামায়ার মন্দির—

বর্তমানে দোগাছির অন্যতম দ্রষ্টব্য হলো মহামায়ার মন্দিরটি। ঐ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন অনিল কুমার ঘোষাল মহাশয়। তিনি ছিলেন উচ্চকোটির সাধক এবং জ্যোতির্বিদ ও কবিরাজ। পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন ভূকৈলাসের জমিদার বংশের সন্তান। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই স্থানে আসেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে খনন কাজ চালিয়ে মাটির নীচে পান একটি বিশাল তাম্র কলস। ঐ কলসের মধ্যে পান ক্ষুদ্র একটি চামুণ্ডা দেবীর মূর্তি। পান শিবলিঙ্গ সহ কিছু পুরা বস্তুও। শোনা যায় কিছু প্রাচীন মুদ্রাও পান ঐ স্থানে। ঐ সব মুদ্রা দিয়েই স্থাপন করেন বিশাল এই গৃহ মন্দিরটি এবং ঐ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন অষ্টাদশ ভূজা মহালক্ষ্মী মহামায়ার মূর্তি। বিশাল তাম্রকলসটি বসানো আছে দেবীর সম্মুখে।

৫। উৎসব ও মেলা—

অগ্রহায়ণ মাসে এখানে দ্বিজ বলরামদাসের তিরোভাব দিসব উপলক্ষ্যে যে মহোৎসব হয় ঐ উৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে।

এছাড়া বাসন্তী পূর্ণিমায় মহামায়ার পূজা উপলক্ষ্যেও একটি মেলা বসে দোগাছিতে। ঐ সময় চারিদিকে পড়ে যায় বিপুল সাড়া। দোগাছিতে বহু লোকের ভীড় হয় ঐ উপলক্ষ্যে।

৬। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

অতীতে দোগাছিতে নানাবিধ যাত্রা, পাঁচালী ও কবি গানের আসর বসতো। হতো অষ্টক গান, খেড়ু, আষাড়ে গল্প, মনসার গান, বাউল ভাটিয়ালী ও পীরের গান প্রভৃতি অনেককিছুই। তবে বর্তমানে আর ঐসব চোখে পড়ে না তেমন। অবশ্য কীর্তনাদি হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। গ্রামের থিয়েটার পার্টিটি বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছুকাল পূর্বে। এই গ্রামেরই নাট্যকার প্রফুল্ল সরকার মহাশয় বেশ কয়েকটি নাটক লিখে মঞ্চস্থও করেছিলেন এককালে তবে বর্তমানে কোন নাটক আর মঞ্চস্থ হয় না। সব স্তব্ধ।

৭। সাহিত্য চর্চা—

এই গ্রামের বেশ কয়েকজন কবি ও গল্পকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখে নাম করেছেন ইতিমধ্যেই। এদের মধ্যে বিষ্ণু ঘটকের নাম উল্লেখযোগ্য। হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকাও আছে এই গ্রামে।

৮। ব্রত পার্বণ ও পূজাদি—

গ্রামের মেয়েরা এখনো ইতু পুজো, ষষ্ঠী পুজো ও জয়মঙ্গলার ব্রত পালন করে। দুর্গা পূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা ছাড়াও এই গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজাও হয়ে থাকে বেশ আড়ম্বর করেই।

৯। লোকশিল্প—

আগে এখানে কাঁসা ও পিতলের পাত্রাদিও তৈরী হতো তবে বর্তমানে হয় না। এখন খেজুরের পাতার পাটি, পলিথিনের ব্যাগ ও বিড়িই প্রধান লোক শিল্পের স্থান গ্রহন করেছে।

ক্ষীর পুলিগ্রাম

১। পরিচিতি—

দোগাছি পঞ্চায়েতের অধীন ১১২নং মৌজা ও গ্রামের নাম হলো ক্ষীর পুলি গ্রাম। গ্রামটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। এখানে পঞ্চায়েত আছে। ধীরে ধীরে গ্রামটি এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে।

২। নামকরণ—

ক্ষীরপুলি নামটি বেশ মজা। কেউ কেউ মনে করেন বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ক্ষীর পুলি থেকেই বুঝি এই গ্রামের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গ্রামের নাম এসেছে 'ক্ষীর বৃক্ষের পোল' থেকে যার অর্থ হলো অশ্বত্থের বন। ক্ষীরদ্রুম শব্দের অর্থ হলো অশ্বত্থ। পোল অর্থে বন। ক্ষীর পোল—ক্ষীরপুলি।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে অঞ্জনা তীরে পূর্বে কৃষ্ণনগরের রাজাদের যে উপবন ছিল তার নাম ছিল আনন্দবন। ঈশ্বর চন্দ্র ঐ বনে সুরম্য প্রাসাদ তৈরী করান ও নামদেন শ্রীবন। ঐ প্রাসাদের দক্ষিণের কাননকে বহা হতো 'মধুপোল'।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

আদিবাসী মালপাহাড়ীদের গ্রাম এই ক্ষীরপুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা খুব বেশী দিন হয়নি। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে এই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। তিনজন শিক্ষক থাকলেও এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা একশোরও কম। ছাদ আছে পাকা দেয়াল যুক্ত বিদ্যালয়টির। খেলার মাঠও আছে। শিক্ষার হার খুবই কম। তবে চেতনা বাড়ছে ধীরে ধীরে গ্রামবাসীদের।

৪। পূজা পার্বণ—

বর্তমানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসার ফলে এদের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব পড়ছে দেখা যায়। তাই দেখা যায় এরা বর্তমানে দিব্যি কালী পূজা এবং সরস্বতী পজাও করছে বর্তমানে। এদের বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও হিন্দু প্রভাব পড়ছে।

৫। উৎসবানুষ্ঠান—

ক্ষীরপুলি গ্রামের আদিবাসীদের প্রধান উৎসব হলো 'পুণঠাণ্ডি'। পৌষ মাসে এটি অনুষ্ঠিত হয় সকল গ্রামবাসীদের মঙ্গল কামনায়। এটিই প্রধান উৎসব এদের।

গ্রামের সবাই মিলে বসে দিনক্ষণ স্থির করে উৎসবের। আগের দিন একটি বেদী তৈরী করা হয়। প্রত্যেক বাড়ীর একজন পুরুষ উপবাসে থেকে বসে থাকে ঐ বেদীর পাশে। একটি প্রদীপ জ্বলে ঐ বেদীর ওপর প্রত্যেক বাড়ী থেকে কিছু ভাত ও উনুনের ছাই আনা হয় দেশী বদ ও জল এনে রাখা হয় সেখানে। উচ্চস্বরে মন্ত্র পাঠ করে মহামায়াকে আহ্বান করা হয়। দুজোড়া পায়রা ও একজোড়া মোরগ বলি দিয়ে তাদের রক্ত রাখা হয় মাটির সরায়। সেই সঙ্গে মদ পান সুপারী এবং বাতাসাও রাখা হয় ঐ সরাতে।

গ্রামের সকলের মঙ্গল কামনা করে পূজা পর্ব শেষ হলে মোরগ ও পায়রা পুড়িয়ে লবণ হলুদ সহযোগে রান্না করা হয়। ঐ মাংস মদ সহযোগে বিবাহিত মেয়েরা বাদে সবাই খেয়ে নাচ গানে মত্ত হয়। ঢোল বাজে। বাঁশী বাজে। তালে তালে চলে নাচ আর গান।

৬। যোগাযোগ ও অর্থনীতি—

এই গ্রামের রাস্তাটি এখনো কাঁচা। নিকটবর্তী রেলষ্টেশন হলো জালালখালি।

এই গ্রামের দু পাঁচজনের নিজস্ব জমিজমা থাকলেও অধিকাংশই এরা কৃষি শ্রমিক। নারী পুরুষ দুজনেই এরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

৭। লোকশিল্প—

সুন্দর সুন্দর খেজুর পাতার পাটি তৈরী করে এই গ্রামের মেয়েরা। এছাড়া বাঁশের ঝুড়ি এবং বৃত্তি ও পলো তৈরীতেও দক্ষ গ্রামবাসীরা।

যাত্রাপুর

১। পরিচিতি—

নদীয়া জেলার দোগাছি পঞ্চায়েতের অধীন ১১১নং মৌজায় যে তিনটি গ্রাম আছে তারই একটি হলো এই যাত্রাপুর গ্রাম। নদীয়ার করিমপুর এবং চাকদহ থানাতেও দুটি যাত্রাপুর আছে। এই গ্রামটির পাশ দিয়েও একদা বয়ে যেতো অঞ্জনা। গ্রামটি একান্তই কৃষি প্রধান। আয়তনে খুব বড় নয় গ্রামটি। লোক সংখ্যাও বেশী নেই।

২। নামকরণ—

অনেকে মনে করেন আগে এখানে যাত্রানুষ্ঠান হতো খুব এবং সেই থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে বুঝি যাত্রাপুর।

কিন্তু এ গ্রামের নামকরণের ইতিহাস তা নয়। অতীতে এই গ্রামটি ছিল কৃষ্ণনগর রাজস্টেটের অধীন। তখন এই গ্রামের লোকেরা পাশের বেড়াবেড়িয়া গ্রামের কাছারী বাড়ীতে গিয়ে খাজনা দিত। পেয়াদা এসে গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিয়ে খাজনা দিতে যেতে বলতো। গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে সব খাজনা দেবার জন্য যাত্রা করতো। এই বিশেষ যাত্রা থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে যাত্রাপুর।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

এই গ্রামটি প্রাচীন হলেও শিক্ষার হার মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে। মাত্র ২৭ শতক জমির ওপরে স্থাপিত হয়েছে স্কুলটি। ছোট্ট খেলার মাঠও আছে অবশ্য। ঘরটি পাকা ঘর। ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুশো। শিক্ষক চারজন।

গ্রামে আগে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল তবে বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে সেটি। শিক্ষার হার খুবই কম। শতকরা চল্লিশ জন মাত্র লিখতে পড়তে পারে।

৪। যোগাযোগ ও জন স্বাস্থ্য—

এই গ্রামটির রাস্তা কাঁচা রাস্তা। পঞ্চায়েতের রাস্তা ভাঙা চোরা হাঁটা যায় না। সংস্কারের দিকে লক্ষ্য নেই কারো।

গ্রামের জন স্বাস্থ্যও উপেক্ষিত। অসুখ করলেই ছুটতে হয় সেই কৃষ্ণনগরে।

৫। পূজা—

গ্রামে একটি মাত্র দুর্গা পূজা হয়। কালী পূজা এবং সরস্বতী পূজায় উৎসাহ বেড়ে যায় উদ্যোক্তাদের। লক্ষ্মী পূজাও হয়। তবে অনাড়ম্বর ভাবেই হয়।

৬। ব্রত পার্বণ—

ছোট ছোট মেয়েরা যেমন এই গ্রামে আজো ইতুপুজো করে বড়রা তেমনি ষষ্ঠী পূজা, মঙ্গল চণ্ডী এবং লক্ষ্মী পূজা করে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারেই।

পৌষ পার্বণে আজো হৈ হৈ লেগে যায় ঘরে ঘরে। পিঠে পুলি তৈরী হয় তখন ঘরে ঘরে। আনন্দের হাট বসে যায় সর্বত্রই।

৭। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

যদিও গান বাজনার তেমন চল নেই গ্রামে তবু মাঝে মধ্যে কীর্তন ও বাউল গানের আসর বসে। আগে অবশ্য যাত্রানুষ্ঠান, তর্জা ও মনসার গানও হতো এখন সবই ঝিমিয়ে গেছে কেমন যেন।

৮। জীবিকা ও অর্থনীতি—

যদিও কৃষিই জীবিকার প্রধান অবলম্বন তবু কেউ কেউ ভ্যান রিক্সাও চালায়। বিড়ি বেঁধে, ঝুড়ি বেঁধে এবং খেজুর পাতার পাটি তৈরী করেও সংসার চালায় কেউ কেউ। তাছাড়া দর্জির কাজও করে দুচারজন।

সত্যি কথা বলতে কি গ্রামটি নানা দিক দিয়েই অবহেলিত হয়ে আছে।

নাংলা গ্রাম

১। পরিচিতি—

নাকাশি পাড়া থানার অন্তর্গত এই গ্রামটি আজো বেশ অবহেলিত। গ্রামের পথও দুর্গম। 'গাছা' গ্রাম থেকে পাঁচ কিলোম্যিার উত্তর পূর্বে অবস্থিত এই গ্রামটির জনসংখ্যা মাত্র এক হাজার।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক স্কুলটিতে ছাত্র সংখ্যা দুশোরও কম। পড়াশুনার মানও যে খুব উন্নত তাও বলা যায় না। শতকরা চল্লিশ জন মাত্র লিখতে পড়তে পারে। তবে চেতনা বাড়ছে।

৩। পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস—

নাংলা গ্রামের বট-অশথের গোড়ায় রয়েছে এক খণ্ড বেলেপাথর। সম্ভবত ওটি কোন স্তম্ভেরই অংশ। ঐ প্রস্তরখণ্ডে খোদিত আছে পদ্মাসনে বসা বুদ্ধমূর্তি। ঠিক যেমনটি আছে চাপড়া থানার আলফার ব্রহ্মাণী তলায়। বার্ণিয়ার দীঘির পাড়েও অনুরূপ ক্ষোদিত মূর্তি ছিল তবে সেটি চুরি হয়ে গেছে বছর কয়েক আগে।

আলফা-নাংলাসহ নদীয়ার বিস্তীর্ণ অংশে যে একদা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল এই স্তম্ভ গাত্রের মূর্তিটি সেই সাক্ষ্যই দেয়।

৪। মেলা ও পূজা—

এখানে প্রতি বছর আষাড় মাসে অম্বুবাচীর মেলা হয়। মাঘী পূর্ণিমাতেও মেলা বসে হাজার হাজার ভক্তজনের ভীড়ে গম্ গম্ করে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন। ভক্তরা কাঁচা দুধ দিয়ে স্নান করায় ঐ মূর্তিকে। শিরনি দেয়। মোরগ বলি দেয় ছলনের ঘোড়াও উৎসর্গ করেন অনেকে।

ঐ স্থানটির নাম সাহেবতলা। আর ঐ বৃক্ষের নাম 'নাজানি' বৃক্ষ।

হিন্দু মুসলিম সবাই পূজো দেয় ওখানে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্বল দৃষ্টান্ত এই সাহেব তলার বুদ্ধ ঠাকুর।

৫। কাটাপীর—

নাংলা গ্রামের উল্লেখযোগ্য গর্বের বিষয় হলো এই কাটাপীরের থান। ভক্তরা দলে দলে আসেন পীরের থানে। মানত করেন। এই থানে রয়েছে কাটাপীরের সমাধি। এখানে পাওয়া যায় জলপড়া, কবচ, তেলপড়া ও মাটি পড়া, বহু রোগ সেরে যায় কাটাপীরের দয়ায়। ঐ থানে যে খাদেম থাকেন তিনিই ওষুধ দেন।

নদীয়ার আর কোন স্থানে কাটাপীরের সমাধি বা মাজার নেই।

কত বছর আগে যে ঐ পীর এই বিশেষ স্থানে এসেছিলেন তা বলা যায় না তবে ১৭০ বছর আগেও যে এই পীরের খ্যাতি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২৩৯ বঙ্গাব্দে তেহট্টের লালমোহন বিশ্বাস তাঁর বাবা লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এর জন্য কাটাপীরের থান থেকে কবচ নিয়েছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় একটি প্রাচীন চিঠিতে।

কাটাঁপীরের থানটি আবার ঐ সাহেব তলাতেই অবস্থিত। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পবিত্রস্থান এই সাহেবতলা।

স্তম্ভ গাত্রের মূর্তিটি যদি ঐ নাংলা গ্রামেরই হয় তাহলে এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না যে একদা নাংলা গ্রামটি ছিল বৌদ্ধ গ্রাম। পরে তুর্কী আমলে এখানে যে আক্রমণ ঘটে সেই আক্রমণেই ধ্বংস হয় বৌদ্ধ মন্দির ও অন্যান্য নিদর্শন এবং ধীরে ধীরে পীরের আবির্ভাব ঘটতে থাকে ও ধর্মান্তরিত হতে থাকে বৌদ্ধরা। অনুমান করা যেতে পারে আজকের নাংলাবাসীরা প্রাচীন বৌদ্ধদেরই বংশ ধর। তবে এ বিষয়ে আরো প্রমাণ দরকার।

৬। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও লোকগীতি—

এখানে সংস্কৃতির চর্চা বিশেষ নেই বললেই চলে। তবে বাউল গানের আসর বসে মাঝে মধ্যে। মেলার সময় ফকির দরবেশের ভীড়ও হয়। শোনা যায় ফকিরী গানও।

৭। যোগাযোগ ও অর্থনীতি—

রাস্তঘাট খুবই হতাশাজনক। গ্রামবাসীদের সবারই জীবন কৃষি নির্ভর প্রায়।

জালাল খালি

১। পরিচিতি—

দোগাছি পঞ্চায়েতের অধীন ১১৫ নং মৌজার নাম হলো জালাল খালি। জালালখালি গ্রামটিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি পাড়া। অঞ্জনা পাড়া, মণ্ডল পাড়া, খৃষ্টান পাড়া, বাঙাল পাড়া, সাঁওতাল পাড়া, ওঁরাও পাড়া, হরিপুর পাড়াও কচুই ডাঙার সমন্বয়েই বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে এই জালালখালি গ্রামটি। দেশ বিভাগের পরে গড়ে উঠেছিল নিত্যানন্দপাড়া আবার ১৯৭১ এর যুদ্ধের পরে নতুন করে যে পাড়াটি গড়ে উঠেছে সেটি হলো 'বাঘাযতীন পল্লী'। গ্রামটি আদিবাসী, হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম।

২। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে প্রচলিত প্রথম মতটি হলো একদা জালাল উদ্দীন তরফদার নামে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির বাস ছিল এই গ্রামে। বহু জমি জমা ছিল জালালুদ্দীনের। অঞ্জনা নদী থেকে বেরিয়ে আসা সোনাখাড়ি খাল ও অন্যান্য জলাশয়ও ছিল তাঁর অধীন। ঐ জালালুদ্দীনের নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে জালাল খালি।

দ্বিতীয় মতে বলা হয় এই গ্রামের নামটির মূলে কোন ব্যক্তি নয় আসলে এর উৎস মূলে আছে 'জল, আল ও খাল' এই তিনটি উপাদান। অর্থাৎ 'জল + আল্ + খাল + ই এর তিনের সমন্বয়ের জলালখালি—জালালখালি।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা পাঁচশোর কাছাকাছি। চারজন শিক্ষকও রয়েছেন। একটি মাধ্যমিক স্কুলও চলছে এখানে বেসরকারী উদ্যোগে। শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ২৭ জন। বিদ্যালয়টি এখনো সরকারী অনুমোদনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।

শিক্ষার হার শতকরা চল্লিশের কাছাকাছি।

৪। ধর্মাচার ও উপাসনাগার—

এই গ্রামটিতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায় নিজ নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম মতানুসারে ধর্মাচারণ করে থাকেন।

(ক) মাজার—

গ্রামের মুসলমান পাড়ায় রয়েছে একটি মাজার। ঐ মাজারটি বিখ্যাত পীর মাদার পীরের। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই ঐ মাজারটি অতি পবিত্র বলে গণ্য।

(খ) গীর্জা—

এখানে রয়েছে একটি দর্শনীয় গীর্জা। গীর্জাটি স্থাপিত হয় ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে ঐ গীর্জাটি শুরু হয় থমাস মণ্ডলের বাড়ীতে। মাটির ঘরে উপাসনা চলতে থাকে। পরে কৃষ্ণনগর চার্চের উৎসাহ ও আন্তরিক সহযোগিতায় বর্তমান পাকা গীর্জাটি তৈরী হয়। ঐ গীর্জার নক্সা প্রস্তুত করেন ইতালীয়ান ফাদার বিখ্যাত 'আলদো ডেকারলি'।

(গ) মসজিদ—

মুসলমান পাড়ায় রয়েছে গ্রামেব মসজিদটি। এটি বেশ পুরনো। নিত্য এখানে উপাসনা করেন মুসলমানগণ।

(ঘ) পূজামণ্ডপ—

গ্রামে পাকা কোন মন্দিব না থাকলেও পূজামণ্ডপ ও বারোয়াবী তলা আছে।

৫। উৎসব—অনুষ্ঠান—

(ক) জালালখালিতে হিন্দুপাড়ায় বিভিন্ন পূজাপার্বণ বেশ উৎসাহেব সঙ্গেই হয়ে থাকে। গ্রামে দুটি দুর্গা পূজা, দুটি কালী পূজা, দশটি লক্ষ্মীপূজা ও বারোটি সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে।

(খ) খৃষ্টানদের বড়দিনের উৎসব এবং গুড্ ফ্রাইডে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই হয়ে থাকে।

(গ) মুসলিমদেব মহবম এবং ঈদলফিতর উৎসবও পালিত হয় যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে।

(ঘ) এছাড়া আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাওদের বাঁধনা, করম, সহরায, নবান, ফাগুয়া প্রভৃতি উৎসবও বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

৬। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম—

এই গ্রামের ক্লাবের ছেলেবা বিভিন্ন সময়ে নানাধরণের নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। তাছাড়া আবৃত্তি এবং কুইজ প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে গ্রামে। কেউ কেউ কবিতাও লেখেন।

৭। লোকসংস্কৃতি—

গ্রামে অষ্টক গানের প্রচলন আছে বহুদিন থেকেই। এছাড়া মাঝে মাঝেই বাউল গানের আসরও বসে এখানে।

এছাড়া মনসার গানও হয়। পুতুল নাচের আসরও বসে গ্রামে। পাঁচালী গানও হয়ে থাকে।

৮। লোকশিল্প—

লোকশিল্পের মধ্যে খেজুরপাতার পাটি, বাঁশের ঝুড়ি, মাছ ধরার বৃত্তি, পলো প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পাতার আসনও করে কেউ কেউ। আদিবাসীদের বাড়ীর দেয়াল গুলির আলপনা এবং রঙের কাজও দেখার মতো।

৯। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিনোদন ব্যবস্থা—

গ্রামের রাস্তাঘাট তেমন ভাল নয়। রাস্তা কাঁচা। বাস রাস্তা নেই। তবে রেলস্টেশন আছে। গ্রামে আছে একটি পোষ্টাফিসও।

বিনোদনের জন্য রয়েছে দুটি ভিডিও হলও। আছে খেলাধূলার ব্যবস্থাও।

টুঙ্গী গ্রামে

১। পরিচিতি—

কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন জনপদ হলো এই টুঙ্গী গ্রাম। মাজদিয়ার পূর্ব দিকের এই গ্রামটি একদা পূজা-পাঠ-ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। গ্রামটির পাশেই রয়েছে বিশাল বিল। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোমুগ্ধকর।

২। নামকরণ—

'টুঙ্গী' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'তুঙ্গ' শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো উঁচু স্থানে মাচার ওপর ঘর। জলের ওপরে মাচা বেঁধে যে ঘর করা হয় তাকেও বলা হয় টোঙ বা টুঙ্গী। আবার জলের মধ্যেকার ঘরকে বলা হয় 'জলটুঙ্গী। সম্ভবত বিলের ধারে গ্রামটির অবস্থান হওয়ায় অতীতে হয়তো গ্রাববাসীরা মাচার ওপরে ছোট ছোট ঘর বেঁধে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেতেন এবং সেই সূত্রেই টোঙ বা টুঙ্গীর থেকে গ্রামের নাম হয়েছে 'টুঙ্গী।'

৩। ইতিহাস—

বহু বিখ্যাত ব্যক্তির স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম এই টুঙ্গী। একদা এই টুঙ্গী ছিল খুবই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। লেডি রাণু মুখার্জীর বাবার আদি বাড়ী ছিল এই টুঙ্গী গ্রামেই।

বিখ্যাত চিত্র নাট্যকার শচীন অধিকারীর পিতৃভূমিও এই টুঙ্গী গ্রাম।

এছাড়াও এই গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন বিখ্যাত গবেষক নিরঞ্জন সিংহ, স্থপতি কে. এম. ব্যানার্জী, ডাঃ পঞ্চানন সেন, রাজীব লোচন দে, কানাই দে প্রভৃতি ব্যক্তিগণ।

শুধু গোটা নদীয়া জেলাতেই নয় গোটা পশ্চিমবঙ্গেই ছড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত এই টুঙ্গী গ্রামের নাম।

স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই টুঙ্গী গ্রামের গৌরবময় ভূমিকা ছিল। মন্মথ সরকারের বাড়ীতে বসতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন বৈঠক। বিয়াল্লিশ এর আগষ্ট বিপ্লবের সময় যখন সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখন এই টুঙ্গী বাসীরাও সাড়া দিয়ে ছিলেন সেই আন্দোলনের ডাকে। মল্লিকব্রহ্ম, মন্মথ সরকার প্রভৃতি অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্বে উপড়ানো হয়েছিল রেললাইন। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মুখর হয়েছিল টুঙ্গী ও তার আশে পাশের গ্রামের আকাশ বাতাস।

৪। পূজা পার্বণ ও মেলা—

(ক) টুঙ্গীর বিশ্বাস বাড়ীতে যে শিবলিঙ্গটি রয়েছে সেটি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আনা হয়েছিল সুদূর কাশী হতে। বিগত আড়াইশো বছর ধরে ঐ লিঙ্গটি পূজিত হচ্ছে আজো। ওখানে নীল পূজো এবং গাজনও হয়। চড়ক উপলক্ষ্যে সাড়া পড়ে যায় চারদিকে। ঐ উপলক্ষ্যে ছোট একটি মেলাও বসে একদিনের জন্য।

(খ) এই টুঙ্গী গ্রামে রয়েছে পঞ্চাননের থানও। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা অসুখে বাবা পঞ্চাননের আশীর্বাদ অব্যর্থ ওষুধের কাজ করে।

(গ) এই গ্রামের চালচিত্রের দুর্গাপূজা শতবর্ষ অতিক্রমের পথে। খুবই ধুমধাম হয় দুর্গাপূজায়।

(ঘ) এছাড়া টুঙ্গীর দোল উৎসবেরও খ্যাতি আছে। এখানে ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে রাধাকৃষ্ণের পঞ্চম দোল উৎসব হয়ে থাকে।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষি ও মৎস জীবী হলেও শিক্ষার হার কিন্তু ভালই। শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ মানুষই শিক্ষিত। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার মানও বেশ ভালই। বহু কৃতি সন্তান আজ ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে।

৬। ব্রতাদি—

গ্রামের মেয়েরা ইতু পূজা, ষষ্ঠী পূজা এবং শিবরাত্রির ব্রতাদি পালন করে থাকেন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে।

৭। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

এককালে গ্রামে খুব নাম করা যাত্রাদল ছিল। বর্তমানে ক্লাবের উদ্যোগে নাটক, আবৃত্তি এবং নৃত্য গীতের প্রতিযোগিতা হয় বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময়। মাঝে মধ্যে বাউল গানের আসরও বসে। নাচ গানের চর্চা আছে গ্রামে।

ধরমপুরে

১। পরিচিতি—

তেহট্ট থেকে জলঙ্গী পেরিয়ে বাস ধরে কিছুদূর গেলেই পড়বে হাঁসপুকুর গ্রাম তার উত্তরে যে গ্রামটা রয়েছে সেটাই হলো ধরমপুর বা ধর্মপুর গ্রাম।

হাঁসপুকুর বাজার থেকে উত্তর দিকে কয়েক পা গেলেই পড়বে সজ্জিত হাঁসপুকুর পঞ্চায়েত অফিস। তার পরেই সুউচ্চ জলের ট্যাঙ্ক। আরেকটু এগিয়ে গেলেই রাস্তার বাঁদিকে পড়বে একটা আশ্রম। পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে গ্রামের বারোয়ারী তলা। দেখা যাবে একটু ভিতরে ঢুকে আরো একটা আখড়া। বুঝবেন ধর্মচর্চায় সোচ্চার এই ধরমপুর।

২। ধুরকুণ্ড ও পীরতলা—

গ্রামের সব বাড়ীই প্রায় পাকা বাড়ী। গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলুন। গ্রাম ছাড়া কাঁচা রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিমে মাঠের দিকে। এক সময়ে পথ হারাতে হবে মাঠের বুকে। আখের ক্ষেতে গা ছম্ ছম্ ভাব। ভয় কাটিয়ে পটল আর বেগুন ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সন্তর্পনে চষা মাঠের ঢ্যালা ভেঙে কিছুদূর গেলেই চোখে পড়বে পাহাড়ের মতো উঁচু একটা স্তুপাকার মাটির টিলা। ওপরে উঠতে দম লেগে যাবে। কিন্তু কোন ক্রমে বন জঙ্গলে ঢাকা ঐ টিবির ওপরে উঠলেই সব ক্লান্তি আর শ্রান্তির অবসান। তেঁতুল ছায়ায় দাঁড়িয়ে দিগন্তে চোখ মেললেই নয়ন যাবে জুড়িয়ে। ছবির মতো ভেসে উঠবে ছায়া সুনিবিড় নদীয়ার গ্রাম বাংলার ছবি। যদি সূর্য্যাস্তের সময়ে ঐ স্তুপের উপরে দাঁড়াতে পারেন তাহলে অস্তগামী সূর্য্যের যে বিশালাকায় রক্তিম চেহারা দেখবেন তা জন্মজন্মান্তরেও ভুলতে পারবেন না—এমনই মনোহর এবং চিত্তাকর্ষক সেই দৃশ্য।

দক্ষিণে বনজঙ্গলে ঢাকা বিশাল এক দীঘি। ঐ স্তুপ এবং দীঘি রয়েছে নয় নয় করে ২১ বিঘা জমি জুড়ে। গোটা এলাকাটা ঘুরতে গেলে পা ধরে যাবে। জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে বিশালাকার গোসাপের দল। আর রয়েছে বিষধর গোখুরার দল। বনের মধ্যে ঢোকার দুঃসাহস না দেখানোই ভাল কেন না ঐ দীঘি এবং স্তুপ ঐসব ভয়ঙ্কর সরীসৃপদের দখলেই আছে বর্তমানে। আশে পাশে কয়েক মাইলের মধ্যে জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই। দিনের বেলাতেও স্তুপের ওপরে অন্ধকার। বিশাল দুই তেঁতুল গাছ প্রহরীর দায় কাঁধে নিয়ে নিশ্চুপ সেখানে। তাদের বয়স যে কতো জানেনাকো কেউ। হতে পারে পাঁচশো ছশো বা হাজার বৎসরও। বুক ঢিব্ ঢিব্ করে ওঠে সেখানে অতি বড় সাহসী ব্যক্তিরও। একা একা দিনের বেলাতেও কেউ যায় না সেখানে। রাতের বেলায় তো ঐ স্তুপ এবং কুণ্ডের নামও মুখে আনেনা কেউ।

তেঁতুল তলার সামনেই দেখতে পাবেন ছলনের ঘোড়ার স্তুপ। পশ্চিমে দেখবেন হাল আমালের ইটের বাঁধানো বেদী। দেখবেন সিঁদুরের ছাপ। পাশের জবা ফুলের গাছেও লক্ষ্য করবেন সিঁদুরের ছাপ। পাশেই দেখতে পাবেন মাটিতে বিশাল বিশাল দুটি উনুন। বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এখানে বছরের কোন বিশেষ সময়ে ভক্তজনের সমাবেশ ঘটে।

স্তুপ থেকে নীচের দিকে নামতে গেলেই দেখতে পাবেন মাটির বুকে গেঁথে আছে অসংখ্য ভাঙা মৃৎপাত্র ও পাথরের পাত্রের ভগ্নাংশ। আশে পাশের মাটি খুঁড়লেই পেয়ে যেতে পারেন প্রাচীন দিনের মোহর—তবে ভাগ্য প্রসন্ন থাকা চায়।

একরাশ প্রশ্নের রহস্য ঘনীভূত হবে আপনার মনে। ঐ স্তুপে কারা বাস করতেন ? ওটা কি কোন বৌদ্ধ স্তুপ ? অথবা কোন প্রাসাদ ছিল ওখানে ? কতোদিন আগে গড়ে উঠেছিল ঐ স্তুপ বা প্রাসাদ ? স্থানটা এতো নির্জনই বা কেন ? আগে কি ওখানে বা আশে পাশে কোন লোকালয় ছিল ? যদি থেকে থাকে তারা তাহলে কোথায় গেল ? ঐ স্তুপে বা প্রাসাদে যারা ছিল তারাই বা কোথায় গেল ? কিভাবেই বা ধ্বংস হলো এই স্তুপ বা লোকালয় ?

প্রশ্ন জাগবে ঐ দীঘিকে নিয়েও। বনজঙ্গলে ঘেরা ঐ নির্জন দীঘিকে ধুর কুণ্ডই বা বলা হয় কেন ? ওখানে মুসলমানপীর এবং হিন্দু দেবদেবীর বেদীই বা এলো কিভাবে ? কবে থেকে নতুন করে ভক্তদের যাতায়াত শুরু হয়েছে ওখানে ?

এই সব নানা প্রশ্নে ক্ষত বিক্ষত হয়ে চলে আসুন মাঠ পেরিয়ে ধরমপুরে। পরিচয় করুন রঞ্জন মণ্ডল, নেপাল মণ্ডল, পাঁচকড়ি মণ্ডল, বিকাশ মণ্ডল, ধীরেন বৈরাগ্য ও অন্যান্য প্রাচীন ও প্রাচীনাদের সাথে। জিজ্ঞাসা করুন ঐ স্তুপ এবং দীঘি সম্বন্ধে—ভাসা ভাসা উত্তর পাবেন। শুনতে পাবেন গহন বনজঙ্গল ও বাঘের কথা। নরকঙ্কাল ও মোহরের কথা। মৃৎপাত্র এবং পাথরের পাত্রাদির কথাও শুনতে পাবেন। জানতে পারবেন প্রাচীন মুদ্রাদি পাবার কথাও। তথ্য ও তত্ত্বের ভারে আপনার বিচার বুদ্ধি যাবে গুলিয়ে।

(৩) ইতিহাস—

আসলে বর্তমানের এই ধরমপুরের পূর্বনাম ছিল ধুরকুণ্ডপুর। ঐ কুণ্ড থেকেই জনপদের নাম হয়েছিল ধুরকুণ্ডপুর। যার অর্থ হলো জোয়ালের আগে তীর্থ জলাশয়। যে জলে দেহের এবং মনের তৃষ্ণা দূর হয়।

এখনো প্রাচীন দলিল ও কাগজপত্রে ঐ নাম দেখা যায়। ঐ কুণ্ডের জল ছিল অতি পবিত্র। নদীয়ার এই অংশের প্রাচীন দিনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে একদা এই অংশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল বহু বৌদ্ধ মন্দির এবং স্তুপ ও বিহারও। গৃহী বৌদ্ধও ছিলেন বহু। সম্ভবত প্রাচীন যুগে এই ধুরকুণ্ডের উপরে গড়ে উঠেছিল কোন বৌদ্ধ স্তুপ বা বিহার। নইলে নির্জন মাঠের মধ্যে অত উঁচু মাটির স্তুপই বা কেন তৈরী হবে ? কেনই বা সেখানে মিলবে ভগ্ন মৃৎ ও প্রস্তর পাত্রাদির অংশ ?

মনে রাখতে হবে ধরমপুরের দক্ষিণের গ্রামে হাঁসপুকুরের প্রাচীন নাম ছিল 'হংস পুষ্কর' এবং পাশের বাঘাগোড়িয়া' গ্রামের নাম ছিল ব্যাঘ্রতট'—এসবই সেই বৌদ্ধ যুগের স্মৃতিবাহী গ্রাম।

এছাড়া ধমরপুরের অদূরে 'বড়েয়া' গ্রামে পাওয়া গেছে বৌদ্ধ মূর্তি সহ অন্যান্য মূর্তিও। পলশুণ্ডাতেও প্রাচীন কালের প্রত্নদ্রব্যাদি মিলেছে। কিছু দূরের বার্ণিয়াতেও পাওয়া গেছে প্রস্তর স্তম্ভে বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধ মূর্তি মিলেছে আলফা গ্রামের প্রস্তর স্তম্ভেও। শুটিয়া গ্রামে, ফুলবাড়ী, লক্ষ্মীগাছা, কালীগঞ্জ ও অন্যান্য বহু গ্রাম-গঞ্জেই ছড়িয়ে আছে বৌদ্ধযুগের নানা স্মৃতি চিহ্ন।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে নদীয়া জেলায় ধর্ম শব্দ যুক্ত যে কটি গ্রাম আছে সেই সবকটি গ্রামই অতি প্রাচীন গ্রাম। কোন ব্যক্তিবিশেষের নামেও ঐ গ্রামগুলোর নামকরণ হয়নি। ধর্মের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত এই গ্রামগুলো। ধর্মরাজের পূজাও হয়ে থাকে এই সব গ্রামে। চড়ক এবং গাজনও হয় বেশ ঘটা করেই।

তেহট্ট থানা তথা মহকুমার ৮৩ নং মৌজা এই ধরমপুরেও গাজন হয়। আগে চড়ক তো তবে বর্তমানে হয় না। সন্ন্যাসীরা ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ী বাড়ী ঘোরে 'পাট' মাথায় করে।

এই গ্রামটিও অতি প্রাচীন গ্রাম। নাথযোগীদের কোন সন্ধান না মিললেও বৈষ্ণব সাধকদের আশ্রম আছে বেশ কয়েকটি। আশ্রমের মধ্যে গুরু শিষ্যের বসা অবস্থায় সমাধিও আছে। এখানকার আশ্রমের রীতিনীতি ও ধর্মাচরণের মধ্যে অনেকে নাথযোগীদের ধর্মাচরণের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকেন। এই নাথযোগীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলেই স্বীকার করেন বিশেষজ্ঞরা।

আমাদের অনুমান ধরমপুরের ধুরকুণ্ডের জলে সন্ধান করলে বৌদ্ধদেবদেবীর মূর্তি মেলা অসম্ভব নয়।

খুব সম্ভবত, মহম্মদ খলজির নদীয়া অভিযানের সময়েই এই ধরমপুরের বৌদ্ধ বিহার বা স্তুপ ধ্বংস হয় এবং পরবর্তীকালে এখানে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হয় এবং পীরের আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে বৌদ্ধ স্তুপের পরিচিতি হয়ে য়ায় পীরতলা বা হাজিপীর তলা নামে।

কিন্তু উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এ দীঘিটির নাম রয়ে যায় সেই বৌদ্ধযুগের স্মৃতিবাহী ধুরকুণ্ডই। ওটাকে কিন্তু পীর পুকুর বলে না কেউই।

অবশ্য ঐ স্তুপের আশে পাশের জমিতে বা ঐ স্তুপে যেসব মোহর বা মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলো সবই সুলতানী যুগের মুদ্রা বা মোহর। হিন্দু বা বৌদ্ধ যুগের কোন মুদ্রা আমার চোখে পড়েনি। অনুমান করা যেতে পারে সুলতানী যুগে ঐ স্তুপের আশে পাশে এবং ঐ স্তুপের ওপরেও লোক বসতি ছিল। সম্ভবত বন্যা বা মহামারীর কারণেই ঐ স্তুপ ও তার আশে পাশের এলাকা জনশূণ্য হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে শ্বাপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার ধরমপুর গ্রামে বর্তমানে কোন মুসলমানের বাস নেই। যদিও হাঁসপুকুর এবং আশে পাশের গ্রামে বহু মুসলমানের বাস আছে।

৪। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র—

বর্তমানের ধমরপুরে এক হাজার লোকের বাস। অধিকাংশ লোকই কৃষি নির্ভর। ব্যবসা এবং বিভিন্ন চাকুরীও করেন কয়েকজন। বেশ সম্পন্ন গ্রাম এটি। চুরি ডাকাতি নেই। দু একজন ছাড়া সকলেরই অবস্থা বেশ ভাল।

যাত্রা নাটক এবং গান বাজনার আসর বসে প্রায়ই গ্রামে। বোলান গানের দল আছে। আছে কীর্তনীয়ার দলও। বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠানে লীলাকীর্তনও হয়ে থাকে। মাহিষ্য প্রধান গ্রাম এটি।

৫। পূজাপার্বণ—

গ্রামে দুটি দুর্গা পূজা হয়ে থাকে। কালী পূজা এবং লক্ষ্মী পূজাও হয়। এছাড়া সরস্বতী পূজা এবং ষষ্ঠী পূজাও হয়ে থাকে।

পৌষ পার্বণে সাড়া পড়ে যায় ঘরে ঘরে। জমে ওঠে পিঁঠে-পুলির উৎসব।

৬। আখড়া—

(১) গ্রামে দুটি আখড়া রয়েছে। লালু দাস বৈরাগ্যের আখড়াটি প্রায় শতাধিক বছর আগেকার। এই আখড়ার ঘরের মেঝেতেই বসা অবস্থাতে সমাধিস্থ আছেন লালু দাস ও তাঁর প্রধান শিষ্য। আখড়ার বর্তমান সেবিকা হলেন সন্ধ্যারাণী বৈরাগ্য।

এখানে দোল উৎসব, উল্টোরথ এবং নবান্নের উৎসব হয় খুবই ধুমধাম করে। আখড়াটি গ্রামের মধ্যে।

২। নটবর আখড়া—

এই আখড়াটি স্থাপিত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। নটবর গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই আশ্রমটি। বর্তমানে তাঁর ছেলে হেমাঙ্গ গোস্বামী সেবায়েত। ৭ই পৌষ নটবর গোঁসায়ের তিরোধান দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। এছাড়াও জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী এবং দোল উৎসব হয় ধুমধাম করে।

৭। ব্রতাদি—

গ্রামের মেয়েরা ইতু পূজা করে থাকে যেমন তেমনিই জয়চণ্ডীর ব্রতও পালন করে থাকে। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতি বারে লক্ষ্মী পূজা হয়ে থাকে প্রতি ঘরেই।

শ্রাবণ মাসের শেষ বৃহস্পতি বারে গ্রামের মেয়েরা ধুরকুণ্ডে স্নান করে পীরতলায় কালী পূজা করেন এবং দুধ কলা ও সিঁদুর দেন বেদীতে ও জবা গাছে। কোন মূর্তি তৈরী হয়না। সকলে সারাদিন উপবাসী থাকেন। ঐ উপলক্ষ্যে ওখানে বালকভোজনও করানো হয়।

৮। লোক সংস্কৃতি—

(১) লোকগীতি—

ধরমপুরের প্রধান লোকগীতি হলো বোলান। শিবপুর চাঁদের ঘাট—কালীগঞ্জের মতোই এ গ্রামে নিজেদের বোলান গানের দল আছে। চৈত্রমাসে দিকে দিকে সাড়া পড়ে যায়। বোলান গানের আসরে ভীড় করে আবালবৃদ্ধ জনতা। পালা গান লেখকও আছেন এই গ্রামেই।

(২) লোকশ্রুতি—

ধুরকুণ্ডের ঢিবি এবং ঐ কুণ্ডকে ঘিরে ধরমপুরে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতির কাহিনী।

লোকে বলে ধুরকুণ্ডের ঐ ঢিবিতে নাকি আছে একটা বিশাল অজগর সাপ। তার মাথায় আছে মণি। গভীর রাতে ঐ অজগরটি নাকি ঘুরে বেড়ায় ঐ ঢিবি এবং দীঘির চারধারে। তখন চারিদিক আলো হয়ে যায়।

ঐ দীঘির বুকেও নাকি গভীর রাতে নানা শব্দ ওঠে। তোলপাড় হয় জল। ঐ দীঘির জলে মাছ ধরার সাধ্য নেই কারো। রাতের বেলায় মাছ ধরতে গিয়ে বিপদে পড়েছে অনেকেই। হঠাৎ নাকি ঐ কুণ্ড থেকে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি উঠে এসে সামনে দাঁড়ান। তাঁর ধব ধবে সাদা চুল। হাতে তাঁর লাঠি। মুখ ঢাকা দীর্ঘ সাদা দাড়িতে। কেউ বলে তিনি নাকি হাজিপীর। কেউ বলে প্রাচীন কোন সন্ন্যাসী।

গভীর রাতে ঐ ঢিবির তেঁতুলগাছের মাথা থেকে ভেসে আসে কান্নার সুর। ঢিবির গভীরে ওঠে ঠুং ঠাং—ঝন্ ঝন্ শব্দ। কেউ বলে যখের ধন আছে ওখানে। কেউ বলে ওসব ভৌতিক ব্যাপার। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করতে এগিয়ে আসেনি কেউই। ধরমপুরের দুঃসাহসী যুবক নেপাল মণ্ডল নাকি রহস্য উদঘাটনের জন্যে একবার ঐ তেঁতুল তলায় ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছিল রাতে। তার পরেই সে শুনেছিল ঐ সব নানা বিচিত্র শব্দ। ভয়ে গা শিউরে উঠেছিল তার। তবুও সাহসে ভর করে দুর্গা নাম জপতে জপতে সে বসেছিল পদ্মাসনে। এক সময় হঠাৎ দেখতে পায় সে' সম্মুখে তার ভয়ঙ্করী এক নারী মূর্তি। বিকট হাসিতে সমস্ত স্তূপ এবং ধুরকুণ্ড কাঁপিয়ে নেপালের হাত ধরে ঐ নারী দিয়েছিল একটান।

শূণ্যে উঠে ছিট্‌কে পড়েছিল সে। তারপরেই জ্ঞান হারিয়েছিল। পরের দিন বাড়ীর লোকজন খুঁজতে খুঁজতে স্তুপের জঙ্গলে পেয়েছিল তার নিথর নীরব দেহ। ধুরকুণ্ডের জল মাথায় ঢালার পরে জ্ঞান ফিরেছিল তার ঘণ্টা কয়েক পরে কিন্তু সেই থেকেই সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আছে আজো।

আমার কাছে নেপাল যে বর্ণনা দিয়েছিল ঐ মূর্তির তাতে মনে হয়েছিল সম্ভবত 'বজ্রযোগিনীরই' দর্শন পেয়েছিল সে এবং ঐ বজ্রযোগিনী আসলে বৌদ্ধ দেবী।

ঐ ঘটনার পর থেকেই ঐ স্তুপে শুরু হয়েছে 'কালীপূজা'। তবে কোন মূর্তি গঠন করে পূজা হয় না। বর্তমানে কালীতলা বেং পীরতলা দুই নামেই পরিচিত ঐ স্তুপ।

৯। **প্রত্নতাত্বিক উপাদান—**

ধমরপুরের মাঠে বিশেষ করে ধুরকুণ্ড এবং ঐ স্তুপে ও তার আশে পাশে ছড়িয়ে রয়েছে বহু ভাঙা মৃৎপাত্র এবং পাথরের পাত্রাদির ভগ্নাংশ, ইটের টুকুরো এবং প্রাচীন মোহর বা মুদ্রাও। এছাড়া ওখানে খুঁড়লেই বের হয়ে আসে মানুষের দেহের হাড় বা কংকাল। দীঘির পবিত্র জলের মধ্যেও খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান। সমাধান হতে পারে বহু জটিল প্রশ্নের।

প্রত্নতত্ব বিভাগের শুভ দৃষ্টি কি পড়বে না ঐ স্তুপ এবং কুণ্ডের ওপরে ? নদীয়া প্রেমিক তথা গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি।

বহিরগাছি

১। পরিচিতি—

বহিরগাছি গ্রামটি রাণাঘাট ব্লক দুই এর ধানতলা থানার অধীনে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোকের বাস এই গ্রামে। পঞ্চায়েত সদস্য আছেন তিনজন। গ্রামে আছে পঞ্চায়েত অফিস এবং গ্রামীন ব্যাঙ্কও। একদা এই গ্রামটি ছিল মুসলমান প্রধান গ্রাম। কিন্তু দেশ ভাগের পরে মুসলমানরা চলে যায় পূর্ব পাকিস্থানে। কয়েক জন আশ্রয় নেয় আশে পাশের গ্রামেও। ওপার থেকে ছিন্নমূল মানুষরা এগ্রামে এসে দখল করেন তাদের ঘরবাড়ী এবং জমি জমাও। অবশ্য বেশ কিছু জমি স্বল্পমূল্যে কিনে নেন এ গ্রামের সম্পন্ন স্থায়ী হিন্দুরাও।

ধর্মের নামে দেশভাগের মূল্য যেমন দিয়েছেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তেমনি এ পারের মুসলমান জনগোষ্ঠীর একাংশকে ও যে সেই মূল্য দিতে হয়েছে তার দৃষ্টান্ত এই বহিরগাছি গ্রাম।

২। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণের পিছনে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে সেটি হলো অতীতে এই গ্রামে ছিল প্রচুর খেজুর গাছ। ঐ সব গাছ থেকে রস বের করার জন্যে বাইরে থেকে আসতো গাছিরা। কালক্রমে ঐসব বাইরে থেকে আসা গাছিদের কল্যাণেই গ্রামটির নাম হয়ে যায় 'বাহির গাছি'। এবং শেষে 'বহির গাছি'। বর্তমানে এ গ্রামে শিয়ালদহ গেদে সেক্সনের হল্ট্ স্টেশন হয়েছে। এখাকার রেলের টিকিটে লেখা থাকে 'বাহিরগাছি'। বহিরগাছি নয়।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

গ্রামে রয়েছে তিনটি কেজি স্কুল এবং দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছাত্র সংখ্যাও প্রচুর প্রতিটি স্কুলে। উচ্চমাধ্যমিক স্কুলটির ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১২০০র মতো। গ্রামবাসীর শিক্ষা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। শিক্ষিতের হার শতকরা আশি প্রায়।

৪। অর্থনৈতিক অবস্থা—

গ্রামবাসীদের সকলেরই প্রায় সচ্ছল অবস্থা। চল্লিশ ভাগ বাড়ী পাকা। বাকি ষাট ভাগ বাড়ী মাটির হলেও টালি ও টিনের ছাওনি দেওয়া। গ্রামের প্রায় তিরিশ ভাগ লোক চাকুরী জীবী। চল্লিশ ভাগ কৃষিজীবী এবং বাকি তিরিশ ভাগ ছোট খাটো ব্যবসা ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। মাছের চাষও করে অনেকে। তাছাড়া তাঁতে কাপড় গামছাও বোনে আনেক। তাঁত সংস্থাও আছে গ্রামে।

গ্রামে আছে শাখা পোস্ট অফিস এবং গ্রামীন ব্যাঙ্ক। স্বল্প সঞ্চয়ের হারও বেশ ভালই।

৫। সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপ—

গ্রামের যুবগোষ্ঠীর উদ্যোগে বছরের বিভিন্ন সময়ে নাটক যেমন মঞ্চস্থ হয় তেমনি আবৃত্তি, নৃত্য, ক্যুইজ এবং ছবি আঁকার প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। ছেলে মেয়েদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যায় এই সব সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সময়ে।

৬। পূজা পার্বণ—

গ্রামের হাইস্কুলের মাঠে খুব ধুমধাম করেই দুর্গা পূজা এবং কালী পূজা হয়ে থাকে। সরস্বতী পূজাও হয়ে থাকে প্রচুর সংখ্যায়। এছাড়া ভাঙা বড়তলায় প্রতি শনিবার খুবই ভক্তিভরে বারের পূজো হয়।

গ্রামের বাজারে যে রাধা গোবিন্দের মন্দির আছে সেখানে নিত্য সেবা পূজা হয়। তাছাড়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে বিশেষ পূজা পাঠ ও অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন ও হয়ে থাকে।

গ্রামটি বর্তমানে নমঃশূদ্র প্রধান গ্রাম হওয়ায় প্রতিবছর ১লা ফাল্গন থেকে ৩রা ফাল্গুন পর্য্যন্ত গুরু চাঁদ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয় সাড়ম্বরে। দূর দূরান্ত থেকে যাত্রীরা এখানে আসে দলবদ্ধ হয়ে নিশান, জয়ডঙ্কা, খোল, করতাল, শিঙা প্রভৃতি নিয়ে। দিনে চলে নামকীর্তন ও আলোচনা। রাতে হয় হরিযাত্রা বা গুরুযাত্রা অর্থাৎ হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদের জীবন ও অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে রচিত যাত্রা পালাগান। দ্বিতীয় দিনে হয় কবিগান ও আলোচনা। তৃতীয় দিন দিনে চলে আলোচনা সভা এবং রাত্রে ঠাকুর কেন্দ্রিক পুতুল নাচ। বিশাল মেলাও বসে যায় ঐ সময়। গম্ গম্ করে ওঠে বহিরগাছির আকাশ বাতাস।

আগত ভক্তদের জন্য তিনদিনই খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ভক্তবৃন্দ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে কবে ১লা ফাল্গুন আসবে।

৭। লোক সংস্কৃতি—

(ক) পুতুলনাচ—

বহিরগাছির লোকসংস্কৃতির গৌরবময় এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এর পুতুল নাচ। ছোট ছোট পুতুল তৈরী করে সূতোর সাহায্যে তাদের নাচানো হয়। অভিনয়ও করানো হয়। বাংলার এই অঞ্চলের পুতুলনাচের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে আজ ভারতের সর্বত্র।

রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে ছোট ছোট পালা তৈরী করে পুতুল নাচের মাধ্যমে দেখানো হয়। একজনই স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুর কণ্ঠ নকল করে কথা বলে যায়।

(খ) বাউল গান—

এছাড়া গ্রামে বাউল গানের চর্চাও হয়ে থাকে। বেশ কয়েকজন নামী বাউলও আছেন বহিরগাছিতে।

(গ) লোকশিল্প—

এই গ্রামে এবং আশে পাশের বহু গ্রামেই পুতুল নাচের পুতুল তৈরী হয়ে থাকে। বিভিন্ন মেলায় এবং পূজার সময় এখানকার পুতুলনাচের দল যায়। এই চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই বহু বাড়ীতেই পুতুল তৈরী হয়। বর্তমানে এটি চলে গেছে লোকশিল্পের পর্য্যায়ে।

৮। যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—

গ্রামটির যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে ঐ রেল স্টেশনটি ছাড়া বাস রাস্তা নেই। গ্রামের রাস্তার অবস্থাও খুবই শোচনীয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। হাতুড়ে ডাক্তারই ভরসা।

চন্দননগরে

১। পরিচিতি ও নামকরণ—

কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন চন্দননগর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রাম। এই গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে চূর্ণী নদী বাঁকা চাঁদের মতো বেড় দিয়ে। চন্দ্রের এই বেড় দেওয়ার ফলে এই জনপদকে মনে হয় দুর্ভেদ্য গড়ের মতো। চন্দ্রের গড় থেকেই এই জনপদের নাম হয়ে যায় 'চন্দ্রগড়'। চন্দ্রগড়ই লোকমুখে পরিবর্তিত হতে হতে চন্দ্রনগড়—চন্দনগর—চন্দন নগর—হয়েছে কালক্রমে।

২। ইতিহাস—

নদীয়ার এই গ্রামটি ইতিহাসে উঠে আসে নীলকর সাহেবদের আগমনের সূত্রে। চূর্ণীর তীরে এই মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠে সুদৃশ্য এবং মজবুত নীলকুঠী। এর কিছু দূরেই চৌগাছা গ্রামের কুঠীরপাড়ায় গড়ে ওঠে আরো একটা কুঠী বাড়ী। এই সব কুঠীর কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে ছিলেন চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের নির্যাতিত চাষীগণ।

চন্দননগরের এই কুঠী বাড়ীতে চাকরী করার সূত্রে সেদিন অনেকেরই অবস্থা ফিরে ছিল। তাঁদের বংশধরদের কেউ কেউ এখনো বসবাস করছেন এই চন্দননগরে।

প্রাচীন সেই কুঠী বাড়ীতে পরবর্তীকালে হাইস্কুলের হোস্টেল ও প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছিল। আজ হোস্টেল নেই তার ওপরেই গড়ে উঠেছে হাইস্কুলের মূল বিল্ডিং।

মূল কুঠী বাড়ীর সম্মুখে যে দুটি সুন্দর বকুল গাছ ছিল সে দুটি বর্তমানে নেই। বছর কয়েক আগে চূর্ণী গ্রাস করেছে তাদের।

তবে ঐ সাহেবদের সময়কার বেশ কয়েকটি লিচু গাছ এবং একটি জামরুল গাছ টিঁকে আছে এখনো। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগরের চেৎলাঙ্গীরা নীলামে কিনে নেন ঐ কুঠী বাড়ী এবং আরো পরে ঐ কুঠী বাড়ী দান করেন হাইস্কুলকে।

৩। চন্দননগর হাইস্কুল ও কামাখ্যানাগ—

চন্দননগরের সু সন্তান বিখ্যাত শিক্ষাবিদ কামাখ্যানাগের চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে এই হাইস্কুলটি। বহু কৃতি ছাত্র এই স্কুল থেকে বেরিয়ে দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছেন গৌরবময় নানা দায়িত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে। বর্তমানে দু হাজারের মতো ছাত্র পড়াশুনা করছে এখানে। হোস্টেলেও থাকে বহু ছাত্র। বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী সেকসানের ক্লাস হয় দিনে। আর বালিকা বিভাগের ক্লাস হয় সকালে।

উভয় বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। গোটা নদীয়া জেলায় নাম আছে এই স্কুলটির। প্রয়াত জ্যোৎস্না মজুমদার ছিলেন দীর্ঘকাল এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রয়াত গুরুপদ দাস, তারিণী গাঙ্গুলী, বিনয় মুখোপাধ্যায়, ভুলু বাবু, যতীন বাবু প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষাবিদগণ ছিলেন এই স্কুলের শিক্ষক। এঁদের কাছেই পঞ্চাশের দশকে পাঠ নিয়েছেন এই গ্রন্থের বর্তমান লেখক। এঁদের কথায় শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে আজো এই লেখকের।

একদা এই স্কুলে প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং বহু বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এসেছেন।

৪। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

সংস্কৃতির চর্চায় একদা এই চন্দননগর সাড়া জাগিয়েছিল গোটা জেলায় বিশেষ করে নাট্যচর্চায় চন্দননগর এক সময় চমকে দিয়েছিল দারুণ ভাবে সারা জেলাকে। এই গ্রামের নন্তু বিশ্বাসের নিজস্ব থিয়েটার দল ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন একজন অসামান্য অভিনেতা। টিপু সুলতান, প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান প্রভৃতি নাটকেতাঁর স্মরণীয় অভিনয় আজো দাগ কেটে আছে বহু নাট্য রসিকের মনে। বাইরেও বহু বার নন্তু বাবু তাঁর দল নিয়ে গিয়ে সাফল্যের সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। নন্তুবাবু এই গ্রামের গর্ব।

নাটক ছাড়া আবৃত্তি এবং গানেও নাম করেছেন অনেকে।

তবে বর্তমানে আবৃত্তি, ক্যুইজ ইত্যাদির অনুষ্ঠান হলেও নাটকে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনা বর্তমান প্রজন্মের কুশীলবগণ।

৫। পূজা পার্বণ—

বেশ কয়েকটি দুর্গা এবং কালী পূজা হয় এই গ্রামে। সরস্বতী পূজার সময় হাইস্কুলে দারিদ্র নারায়ণ সেবা হয়ে থাকে আজো। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এবং গরীব জনগণ যোগদেয় ঐ সেবায়।

(ক) আড়ং—

দুর্গা পূজার শেষে বিসর্জনের দিন নানা গ্রাম থেকে প্রতিমা এসে জমা হয় এখানে। ধূপারাতি ও ধুনুচি নৃত্যের শেষে একে একে চূর্ণীর বুকে বিসর্জন দেওয়া হয় সব প্রতিমা।

এই আড়ং উপলক্ষ্যে বিরাট এক মেলা বসে এখানে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় হাইস্কুলের ফুটবল মাঠ। হৈ হৈ—রৈ, রৈ বাঁশীর শব্দে, কলরবে, উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে চূর্ণীর তীরবর্তী চন্দননগরের আকাশ বাতাস।

৬। ব্রতাদি—

গ্রামের মেয়েরা আজো নিষ্ঠার সঙ্গে ইতু পূজা ও ষষ্ঠী পূজা করে থাকেন। এছাড়া মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতও পালন করেন অনেকে।

৭। লোক সংস্কৃতি—

(ক) লোকগীতি—

এক কালে চূর্ণী নদীর তীরে শোনা যেতো মন কাড়া ভাটিয়ালি গান এবং মেঠো সুরের বাঁশীর সুর। বেশ নামও করেছিল কয়েকজন গায়ক এবং বংশী বাদক। তবে সেই ধারা ধরে রাখতে পারেননি পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীগণ।

৮। যোগাযোগ ও শিক্ষা—

কৃষ্ণনগর—মাজদিয়া পাকা সড়কের সঙ্গে যুক্ত চন্দননগরের পাকা রাস্তাটি। গ্রামের রাস্তায় ইট পড়লেও বর্তমানে রাস্তা ভাল নয় মোটেই।

হাইস্কুলের পাশেই রয়েছে বাজার। সপ্তাহে শনি মঙ্গল বার দুদিন হাট বসে। তবে বর্তমানে পাকা রাস্তার ধারে শোণঘাটায় নতুন বাজার বসায় চন্দননগরের হাট ও বাজার দুইই ঝিমিয়ে পড়েছে কেমন যেন।

গ্রামের শিক্ষার হার ভালই। শতকরা সত্তরজন সাক্ষর এই গ্রামে।

৯। অর্থনীতি ও বর্তমান অবস্থা—

গ্রামবাসীদের অনেকেই ব্যবসা এবং নানা ধরনের চাকরীতে নিযুক্ত, কৃষিতেও নিযুক্ত আছেন অনেকে।

এই গ্রামের বহু কৃতি সন্তান আজ ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে। তবে আগের সেই গৌরবময় সোনারঙের দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কেমন যেন নিষ্প্রাণ ও নিস্তরঙ্গ হয়ে গেছে সবকিছু।

শিবনিবাসে

১। প্রাক ইতিহাস ও নামকরণ—

নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন শিবনিবাস একটি বিখ্যাত স্থান। চূর্ণী নদীর তীরবর্তী এই রমণীয় স্থানটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৌলতে। একবার মহারাজা আসেন চূর্ণীর তীরে কুখ্যাত ডাকাত নসরৎ খাঁকে দমন করতে। সেইখানে এসে ভাল লেগে যায় চূর্ণী তীরের এই মনোরম স্থানটি। ঐ সময় চলছিল দেশে বর্গীদের হাঙ্গামা। কখন তারা রাজধানী কৃষ্ণনগর আক্রমণ করে বসে কে জানে ? দ্বিতীয় রাজধানী একটা করা খুবই দরকার। পছন্দ হয়ে গেল জায়গাটা। শুরু হয়ে গেল নতুন রাজধানীর প্রাসাদ নির্মাণ। সেটা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কথা।

তার পরে গড়ে উঠলো একে একে অসংখ্য মন্দির ও প্রাসাদ। রাজা এলেন। রাণী এলেন। এলেন আত্মীয় স্বজন ও পারিষদ বর্গ। গম্ গম্ করে উঠলো নতুন রাজধানী। তৈরী হলো সুউচ্চ শিবমন্দির ও রাম সীতার মন্দির। শিবের নিবাস বলে নাম রাখা হলো নবীন রাজধানীর শিবনিবাস।

ইন্দ্রপুরী তুল্য নগরী হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠলো এই শিবনিবাস।

২। বর্তমান অবস্থা—

কিন্তু হায় আজ সে সবই ইতিহাস মাত্র। স্মৃতি শুধু গুম্‌রে-গুম্‌রে কাঁদে আজ ভগ্ন প্রাসাদের বুকে। এককালের সমৃদ্ধ জনপদ আজ জনশূণ্য প্রায়। শুধু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাজ রাজেশ্বর, রাজ্ঞীশ্বর ও রামসীতার মন্দির। আর আছে শীতলা দেবীর মন্দির। তবে এত দিনে হয়তো এই মন্দিরগুলোও অক্ষত অবস্থায় থাকতো না যদিনা ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে বিড়লা-জনকল্যাণ ট্রাস্ট এই মন্দিরগুলোর সংস্কার করতেন।

একদা যে জনপদে দেবঘড়ি বাজতো আজ সেখানে হায়! হায়! ধ্বনি। মন্দিরের গায়ে এখন অসংখ্য টিয়াপাখীর বাসা। আবার ফুটে উঠছে ক্ষয়িষ্ণু রূপ।

৩। স্থাপত্য নিদর্শন—

তবু এখনো ঐ মন্দির তিনটি এই শিবনিবাসের গর্ব। এত উঁচু মন্দির নদীয়ায় নেই। 'রাজ রাজেশ্বর' এবং রাজ্ঞীশ্বরের খ্যাতি আজো সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। মন্দিরের গায়ে রয়েছে অনবদ্য স্থাপত্যের নিদর্শন যা আজো রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বড় লিঙ্গটির উচ্চতা ৯ ফুট এবং বেড় ২১ ফুট দশ ইঞ্চি—যা উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় লিঙ্গটির উচ্চতা ৭ ফুট। রামসীতার মন্দিরটিও অপূর্ব। কষ্টি পাথরের রাম এবং অষ্টধাতুর সীতা এখনো বিস্ময় জাগায় রসিক হৃদয়ে। একটা বিষ্ণু মূর্তিও আছে এই মন্দিরের বারান্দায়।

৪। পূজা পার্বণ ও মেলা—

(ক) ভৈম একাদশীর মেলা—

প্রতি বছর মাঘ মাসে ভৈম একাদশীর দিন এখানে যে মেলা বসে সেই মেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় হতো আগে। প্রায় একমাস চলতো ঐ মেলা। সারা নদীয়া জেলার লোক

ভীড় করতো ঐ মেলায়। বাইরের জেলা থেকেও প্রচুর জনসমাগম হতো আগে। যাত্রা, সার্কাস, নাগরদোলা, ম্যাজিক, দোকান পাটে গম্ গম্ করতো মেলা প্রাঙ্গন। ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়াই ছিল কষ্ট সাধ্য। মন্দিরে ঢোকাও ছিল কষ্টদায়ক। গরুর গাড়ী চেপেও কতো লোক যে আসতো মেলায় তার হিসাব রাখা দায়।

তবে এখন মেলার সেই জৌলুষ নেই। ভীড়ও তেমন হয় না। একমাসের মেলা মাত্র সাত দিনেই শেষ হয়ে যায়।

(খ) গঙ্গা পূজার মেলা—

ভৈম একাদশীর মেলা ছাড়াও এখানে গঙ্গা পূজা উপলক্ষ্যেও একটি মেলা বসে একদিনের জন্য। বেশ ভীড় হয় ঐ মেলায় আজো।

(গ) রথের মেলা—

রথের মেলার জৌলুষ কমে গেলেও চলে আসছে আজো পুরনো দিনের রীতি ও ঐতিহ্য মেনে।

৫। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার হার—

রাজাদের আমলে এককালে এখানে টোলছিল। সংস্কৃত শিক্ষার চর্চা হতো রীতি মতো। বর্তমানে টোল নেই। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা চলছে বেশ ভালই। শিক্ষার হারও খুবই উঁচু। শতকরা নব্বুই জন সাক্ষর এই শিবনিবাসে। এখানকার বহু কৃতি সন্তান ছড়িয়ে আছে আজ দেশের নানা প্রান্তে।

৬। ব্রতাদি—

এককালে ব্রাহ্মণ প্রধান এই শিবনিবাসে পালিত হতো শাস্ত্রীয় আচার মেনে বহু ব্রতাদি। তবে বর্তমানে ওপার থেকে বহু লোক এখানে এসে বসবাস করার ফলে সেই নিরুঙ্কুশ ব্রাহ্মণত্ব আর নেই এই শিবনিবাসের। এখন আগেকার মতোন ব্রতানুষ্ঠানও আর তেমন চোখে পড়ে না।

তবে শিবরাত্রির ব্রত, ইতু পূজা, ষষ্ঠী পূজা এবং লক্ষ্মী পূজার প্রচলন এখনো আছে। মঙ্গলচণ্ডী ও বিপদতারিণীর ব্রতও পালন করে থাকে অনেকে।

৭। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

আগে গ্রামে যাত্রদল ছিল। নিয়মিত যাত্রার আসর বসতো এখানে। থিয়েটারও হতো। তবে এখন আর যে সব বিশেষ চোখে পড়েনা। দুর্গা পূজা বা কালী পূজা উপলক্ষ্যে অবশ্য গান বাজনা হয়ে থাকে এখনো।

৮। লোক সংস্কৃতি—

একদা বোলান গানের রমরমা ছিল এই শিবনিবাসে। দু এক জন বিখ্যাত গায়ক ও ছিলেন এখানে। তবে বর্তমানে সেসব বিগত অধ্যায় মাত্র।

৯। যোগাযোগ ও অর্থনীতি—

শিবনিবাসের সব দিকেই নদী। ফলে নদী পথে পারা পার হওয়া ছাড়া উপায় নেই। চূর্ণীর ওপরে ব্রীজের দাবী দীর্ঘ দিনের এই গ্রামবাসীদের। কিন্তু তাদের আবেদন নিবেদন যথাস্থানে পৌঁছালে তো ?

এখানে রয়েছে একটি সেরিকালচার অফিস। নদীয়া জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির মূল কেন্দ্রটিও এখানেই অবস্থিত।

গ্রামবাসীদের সার্বিক অবস্থা বেশ ভালই বলতে হবে। মৎসজীবী, কৃষিজীবী এবং বেশ কয়েকজন চাকুরী জীবীও আছেন গ্রামে। তবে ধনী বা শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই আজ বাইরে থাকেন।

১০। বিখ্যাত ব্যক্তিগণ—

বর্তমানের বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এই শিবনিবাসেরই সন্তান।

বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীও ছিল এই শিবনিবাসেই।

বিখ্যাত মহিলা কবি প্রয়াতা স্নেহলতা চ্যাটার্জীর পিতৃভূমিও এই শিবনিবাসেই।

বিখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর দাদা কেশব চন্দ্রও জন্মেছিলেন এই গ্রামেই।

এছাড়া সাধক মোহনানন্দজী এবং কবি সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীও এই শিবনিবাসেই।

এই গ্রামের আরো কতো ব্যক্তিযে স্বস্বক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়ে দেশের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছেন তার হিসাব রাখা দায়।

শোণঘাটা

১। পরিচিতি—

কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন শোণঘাটা গ্রামটি একটি প্রাচীন জনপদ। মাজদিয়া কৃষ্ণনগর পাকা সড়কের পাশেই এই গ্রামটি। এগ্রামের দক্ষিণ পাশ দিয়ে কুলু কুলু বেগে বয়ে চলেছে চূর্ণী নদী। তারপরেই বিখ্যাত শিবনিবাস। দক্ষিণ পশ্চিমে চন্দননগর এবং ব্রহ্মডাঙা। উত্তরে ইতিহাসখ্যাত চৌগাছা গ্রাম এবং পূর্ব দিকে কৃষ্ণগঞ্জ।

গ্রামটি খুব বড় না হলেও সাহাপাড়া মুচিপাড়া এবং অন্যান্য পাড়ায় বিভক্ত। আগে সাহাদের দু একটা দোকান থাকলেও বর্তমানে এখানে প্রচুর দোকান হয়েছে। নিত্য হাটও বসে। ব্যবসা কেন্দ্রহিসাবে বর্তমানে শোণঘাটা জমে উঠেছে এবং প্রতিনিয়তই বাজারটি বাড়তে বাড়তে এগিয়ে চলেছে চৌগাছার কালীতলার দিকে।

২। নামকরণ—

শোণঘাটার নামকরণ নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে এই অঞ্চলে। একটি মতে জানা যায় আগে চূর্ণী নদীর তীরে এইখানে যে ঘাট ছিল সেই ঘাটে বড় বড় বাণিজ্য নৌকা ভীড়তো এবং এই ঘাট থেকে নানা কৃষিজপণ্য উঠতো ঐসব নৌকায়। ঐ সব পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উঠতো শণ। কালক্রমে ঐ শণের জন্যই বিখ্যাত হয়ে ওঠে এই ঘাট। এবং নাম হয়ে যায় শণের ঘাট এবং ক্রমে শণঘাট—শোণঘাটা।

অন্য মতে জানা যায় পূর্বে শোণঘাটায় ছিল শ্মশান। নদীর তীরে বহু বড় বড় বট অশথের গাছ। রীতিমতো নির্জন ছিল নদীর তীর। তখন ঐসব গাছের তলায় নিয়ে আসা হতো মৃতদেহ সংকারের জন্য। মৃতদেহগুলো এনে মাটিতে শুইয়ে রাখা হতো। ঐ শ্মশান থেকেই কালক্রমে শ্মশানঘাট—শাণঘাট—শাণঘাটা—শোণঘাটা হয়ে যায় লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে।

তবে গ্রামবাসীরা প্রথম মতটিকেই বেশী গুরুত্ব দিতে চান যদিও দ্বিতীয় মতটিকেও তারা উড়িয়ে দিতে চাননা পুরোপুরি কেননা কিছু দূরে এখনো দাহ করা হয় মৃতদেহ।

৩। শিক্ষার হার ও শিক্ষা ব্যবস্থা—

এই গ্রামের জনসংখ্যা বর্তমানে এক হাজারের মতো। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য রয়েছে একটি কেজি স্কুল এবং একটি জুনিয়র হাইস্কুল। ঐ জুনিয়র হাই স্কুলের সঙ্গে প্রাথমিক বিভাগটিও যুক্ত আছে। পড়াশুনার মানের উন্নতি ঘটছে সাম্প্রতিককালে। তাছাড় অভিভাবকরাও সচেতন এ ব্যাপারে।

গ্রামে শিক্ষার হার শতকরা প্রায় ষাটের কাছাকাছি।

৪। যোগাযোগ ও অর্থনীতি—

গ্রামের পাশ দিয়েই চলে গেছে বাস রাস্তা সোজা কৃষ্ণনগরের দিকে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন হলো মাজদিয়া। গ্রামের ভিতরের রাস্তায় এক কালে ইট পড়লেও বর্তমানে অবস্থা খুবই সঙ্গীন। অন্যান্য বহুগ্রামের মতোই এগ্রামেও পঞ্চায়েত সদস্যরা উদাসীন এ ব্যাপারে।

গ্রামের সাহারাই মূলত বিত্তশালী বাণিজ্যের দৌলতে। বেশীর ভাগই বাড়ীই পাকা ব্যবসা এবং কৃষিই জীবিকার প্রধান উৎস গ্রামবাসীর।

এখানকার ময়রাদের তৈরী মিষ্টান্নের সুনাম আছে। আগে কৃষ্ণগঞ্জ—শিবনিবাস এবং মাজদিয়াতেও এখানকার রসগোল্লা ও সন্দেশ চালান যেতো। তবে বর্তমানে সেই গৌরব আর নেই।

এক সময়ে এখানে একটি চরখা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। বহু দুঃস্থ মেয়েরা ট্রেনিং নিতো এবং চরখায় প্রচুর সুতোও কাটা হতো তবে বর্তমানে সেটি বন্ধ হয়েগেছে।

৫। পূজাপার্বণ—

গ্রামে একটিমাত্র দুর্গাপূজা হয়। কালী পূজাও হয় একটি। তবে সরস্বতী পূজা হয় অনেক কটি।

একসময়ে খব ধুম ধাম করে এখানে নবান্নের উৎসব হতো নদীর তীরে। পৌষপার্বণও হতো হৈ হৈ করে। তবে বর্তমানে সেই উৎসাহ আর চোখে পড়ে না তেমন।

৬। ব্রতাদি—

গ্রামের মেয়েরা পার্শ্ববর্তী চৌগাছার মেয়েদের মতোই ইতুপূজা এবং ষষ্ঠীপূজা করে থাকে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে। ব্যাঙের বিয়ের প্রচলনও ছিল এই গ্রামে তবে এখন সে সব চোখে পড়ে না আর।

তবে বিপত্তারিণীর ব্রত এবং চাপড়াষ্ঠীর ব্রত পালন করে থাকে গ্রামের মেয়েরা আজো।

৭। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে দ্রুত উঠে আসলেও এখনো রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরেই হয়ে থাকে স্থানীয় স্কুলের মাঠে। এছাড়া আবৃত্তি এবং গানের প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে প্রায়ই। এক সময় ভাল যাত্রার দলও ছিল তবে এখন সেসব অতীত ইতিহাস মাত্র।

৮। লোক সংস্কৃতি—

(ক) লোকগীতি—

এক সময়ে গ্রামে ভাটিয়ালী গানের প্রচলন ছিল খুবই। ছিল বোলান গানের কদরও। কিন্তু বর্তমানে শহরমুখী হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন। টিভির দৌলতে আজ আর লোকে গ্রামীন শিল্পীদের কদর দিতে চায় না।

(খ) মৃৎশিল্প—

তবে এখানকার মৃৎশিল্পীদের তৈরী প্রতিমার কদর আছে আশে পাশের গ্রামে। বিভিন্ন পূজোর সময় এখান থেকেই আশে পাশের গ্রামের লোকেরা প্রতিমা নিয়ে যায়। তবে ঐ শিল্পীরা সবাই এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে দেশ বিভাগের পরে।

৯। উপসংহার—

শোণঘাটা গ্রামটি বর্তমানে দ্রুত গঞ্জের রূপ নিচ্ছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃতি ঘটছে বাজারের। বাড়ছে জৌলুষ দোকান পত্রের। গ্রামের ভিতর থেকে সরে এসে এখন অনেকেই বাড়ীঘর তৈরী করছে বাজারের কাছে।

কৃষ্ণগঞ্জ

১। প্রাক্ ইতিহাস—

নদীয়া জেলার 'কৃষ্ণগঞ্জ' একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ তবে মাথাভাঙার তীরে অবস্থিত এই গ্রামকে এখন আর গ্রাম বলা যায় না। রীতি মতো জমজমাট গঞ্জ এটি বর্তমানে। গঞ্জটি স্থাপন করেছিলেন শিবনিবাসে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করার সময় কৃষ্ণচন্দ্র এবং নিজের নামানুসারেই গঞ্জের নাম রাখেন কৃষ্ণগঞ্জ।

আবার কেউ কেউ মনে করেন এই গঞ্জটি আরো প্রাচীন। স্থানীয় অধিবাসীরা ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণের আরাধনা করতেন তাঁরা নদীতীরে কদমতলায়। সেই জন্যই এই গঞ্জের নাম রাখেন তাঁরা কৃষ্ণের গঞ্জ বা কৃষ্ণগঞ্জ।

চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে নদীয়ার মানচিত্রে কৃষ্ণগঞ্জ এক উল্লেখযোগ্য গঞ্জ হিসাবে খ্যাত হয়ে আসছে আজ বহুকাল ধরে।

এই কৃষ্ণগঞ্জের কিছু দূর দক্ষিণে গিয়েই বিখ্যাত মাথাভাঙা নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটির নাম হয়েছে চূর্ণী এবং অন্যটির নাম হয়েছে ইছামতী।

বর্তমানের 'মাজদিয়া' স্টেশনটির পূর্বের নাম ছিল এই কৃষ্ণগঞ্জের নামেই। অবশ্য তারো পূর্বে নাম ছিল শিবনিবাস স্টেশন। অবশ্য তখন ঐ স্টেশনটি ছিল ইছামতীর ব্রীজের বাঁ পাশের উঁচু বাঁধানো জায়গায়। কৃষ্ণগঞ্জ স্টেশনের নাম কেন পাল্টানো হলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নদীয়া গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে—"The change being necessiated by the fact that there are atleast two other railway stations in India named kissengunge where by confussion was cansed in the booking of perecels and goods."

স্টেশনটি মাজদিয়ার নামে চালু হলেও এই কৃষ্ণগঞ্জের ব্যবসা বাণিজ্য বা খ্যাতির যে খুব একটা হানি হয়েছে এমন মনে হয় না।

২। যোগাযোগ ও অর্থনীতি—

এককালে নৌপথে দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এই কৃষ্ণগঞ্জের। পরবর্তীকালে সড়ক পথে সদর শহর কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সরা সরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

বর্তমানে মাথাভাঙা নদীর ওপরে ব্রীজ তৈরী হওয়ায় মাজদিয়া স্টেশনে যাওয়া সহজ হয়েছে এবং রেলের সুবিধাও পাচ্ছেন কৃষ্ণগঞ্জের অধিবাসীরা সহজেই। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা বেড়ে গেছে অনেকটাই।

'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' প্রবাদটার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো এই কৃষ্ণগঞ্জ। স্থানীয় অধিবাসীদের বেশীর ভাগ লোকই কোন না কোন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেকেই বেশ অবস্থাপন্ন। এখানকার ঘরবাড়ী দেখলেই সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না কারো।

বর্তমানে এখানে থানা ছাড়াও রয়েছে বি.ডি.ও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্টান। ছোট খাটো শহরের রূপ নিতে চলেছে আজ কৃষ্ণগঞ্জ প্রায় তিন হাজার লোকের ভার বয়ে।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

এখানে রয়েছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি কেজি স্কুল এবং একটি মাধ্যমিক স্কুল। আগে থানার পাশে একটি পি.টি. স্কুলও ছিল তবে বর্তমানে সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। মাধ্যমিক স্কুলে যে সব বিখ্যাত শিক্ষক এককালে পড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রী বিমল কুমার জোয়ারদার এবং শ্রী সুনীল কুমার সিংহ প্রভৃতি।

শিক্ষার হার এই গঞ্জে শতকরা আশির ওপরে। এই গঞ্জ থেকে বহু কৃতি সন্তান আজ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন।

৪। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ—

এই এলাকাব সাংস্কৃতিক জাগরণে কৃষ্ণগঞ্জ বরাবরই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং এখনো আসছে। নিয়মিত উচ্চাঙ্গের নাটক যেমন এই এলাকার ছেলে মেয়েরা মঞ্চস্থ করে থাকে তেমনিই আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং ক্যুইজের ব্যবস্থাও করে থাকে। নৃত্য এবং ছবি আঁকার প্রতিযোগিততাও হয়ে থাকে প্রায়ই।

নাটকে অভিনয় এবং পরিচালনায় যাঁরা ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কমল দত্ত, নারায়ণ দত্ত এবং প্রয়াত বিশু সিংহ।

নিয়মিত অনেকেই কবিতা, গল্প এবং নাটকও লেখেন। খেলাধূলা এবং ব্যায়াম চর্চাও হয় নিয়মিত এখানে।

৫। পূজা পার্বণ—

বর্তমানে দুটি দুর্গা পূজা এবং চারটি কালী পূজা হয় এখানে। আলোর কাজে চমক লেগে যায় দর্শকদের ঐ দুই পূজার সময়ে। বহু দূর দূরান্ত থেকে দর্শকরা ভীড় করেন পূজার সময় ঐ আলোক সজ্জা দেখার আশাতেই।

সরস্বতী পূজাতেও দারুণ হৈ হৈ -রৈ রৈ ব্যাপার হয় এখানে। আগে নদীর ধারে দশহরা পূজা হতো তবে এখন আর হয় না।

৬। ব্রতাচার—

কৃষ্ণগঞ্জের মহিলা সমাজে বর্তমানে ইতু পূজা বা ষষ্ঠী পূজার তেমন চল নেই তবে রাধাষ্টমী ও শিবরাত্রির ব্রতাদি পালন করে থাকে অনেকেই। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান অবশ্য বেশ ঘটা করেই হয়ে থাকে নদীয়ার অন্যান্য অংশের মতো।

৭। লোকসংস্কৃতি—

(ক) লোকগীতি—

এককালে এখানে ভাটিয়ালি গানের খুবই চল ছিল। ছিল বাউল গানেরও রমরমা। কিন্তু এখন দ্রুত নগরায়নের যুগে সেসব গানের চর্চা আর তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

(খ) লোক শিল্প—

লোকশিল্প বলতে নাইলনের তৈরী মাছ ধরা জাল ছাড়া তেমন কিছু চোখে পড়ে না। তবে নলেন গুড়ের সন্দেশ তৈরীতে সুখ্যাতি আছে এই কৃষ্ণগঞ্জের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী তথা ময়রাদের।

খাল বোয়ালিয়া

১। ইতিহাস—

মাথাভাঙা নদীর তীরবর্তী একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ হলো এই খালবোয়ালিয়া গ্রাম। গ্রামটি অতি প্রাচীন। পাশেই রয়েছে বোয়ালিয়া গ্রাম। দেশ ভাগের পরে ওপার থেকে বহু লোক এসে বসবাস করছেন এখানে। এর ফলে যেমন লোক সংখ্যা বেড়েছে তেমনিই নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধও হয়েছে এই প্রাচীন গ্রামটি। একদা এখানে নীলকুঠীও ছিল। তবে এখন ধ্বংস প্রাপ্ত।

২। নামকরণ—

এই গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে দুটি মত এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

একটি মতানুসারে জানা যায় একদা নীলকুঠীর সাহেবরা নীল চাষের সুবিধার জন্য পলদা থেকে মাথাভাঙা পর্য্যন্ত দীর্ঘ একটা খাল কাটিয়েছিলেন ঐ খালে নাকি প্রচুর বোয়াল মাছ ঘুরতো। সেই থেকেই গ্রামের নাম হয়ে যায় খালবোয়ালিয়া।

অন্য একটি মতে বলা হয় একদা এই খালবোয়ালিয়া ছিল বোয়ালিয়া গ্রামেরই একটা পাড়া পরবর্তীকালে যখন ঐ অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন বোয়ালিয়ার থেকে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোঝাতেই খাল শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয় এবং নাম হয় খাল-বোয়ালিয়া অর্থাৎ খাল দ্বারা পৃথক বোয়ালিয়া গ্রাম।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার—

এই গ্রামে রয়েছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। সুপ্রাচীন এই হাইস্কুল থেকে বেরিয়েছেন বহু কৃতি ছাত্র। তাঁরা আজ দেশের নানা প্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছেন।

যেসব খ্যাতনামা শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন তাঁদেরই একজন হলেন ইতিহাস খ্যাত চৌগাছা গ্রামের শ্রী পবন তরফদার মহাশয়। বর্তমানে তিনি শোণঘাটায় বাস করছেন। এই গ্রামের শতকরা প্রায় ৭০ জন শিক্ষিত।

৪। অর্থনীতি ও যোগাযোগ—

গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। অল্প কয়েকজন ব্যবসা ও চাকরীও করেন। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা ভালই। জলসেচ এবং উন্নত বীজ ও সারের কল্যাণে মাঠে ফসল বেশ ভালই ফলে।

সরাসরি গ্রামের সঙ্গে বাসে যোগাযোগ আছে কৃষ্ণনগর এবং কৃষ্ণগঞ্জের সঙ্গে। তবে গ্রামের রাস্তা ঘাট খুবই খারাপ।

৫। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম—

গ্রামে নাটকের চর্চা আছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে নাটকও মঞ্চস্থ করে ক্লাবের ছেলেরা। তাছাড়া রবীন্দ্রজয়ন্তী এবং ২৩শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠান হয় খুবই ঘটা করে।

এছাড়া আবৃত্তি এবং গানেরও প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে প্রায়ই।

বেশ কয়েকজন কবি এবং গল্পকার আছেন এই গ্রামে। বাৎসরিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয় একটি। অনেকেই লেখেন ঐ পত্রিকায়।

৬। পূজা পার্বণ—

দুর্গা পূজা এবং কালী পূজা ছাড়াও সরস্বতী পূজা হয়ে থাকে খুবই ধুমধাম করে। তবে নবান্নের উৎসবে কিন্তু রীতিমতো হৈ হৈ পড়ে যায় চারদিকে।

৭। ব্রতাদি—

ছোট ছোট মেয়েদের ইতু পূজা এবং বড়দের ষষ্ঠী পূজা ছাড়াও জয়মঙ্গলবার ব্রত এবং মাঘী ব্রতেরও প্রচলন আছে এই গ্রামে। তবে মাঘীব্রতটি ওপার থেকে আসা মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত।

৮। লোক সংস্কৃতি—

(ক) লোকগীতি—

লোকগীতির মধ্যে এখানে বাউল গানই প্রধান। অনেকেই বাউল গান করে থাকেন। এছাড়া কীর্তনীয়ার দলও আছে গ্রামে। ভাটিয়ালি গানও গায় অনেকে।

(খ) লোক শিল্প—

বাঁশের কাজ ও বৃত্তি, আটুল প্রভৃতি তৈরীতে দক্ষ অনেকেই। খেজুর পাতার পাটিও তৈরী করে অনেকেই।

শিকারপুরে

১। পরিচিতি ও প্রাক্ ইতিহাস ঃ—

কল্যাণী মহকুমার অন্তর্গত চাকদহ থানার অধীন একটি প্রাচীন গ্রাম হলো এই শিকারপুর। এর পাশদিয়ে কুলুকুলু বেগে বয়ে গেছে ভাগীরথী।

আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে গড়ে উঠেছে এই গ্রামটি। বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় ৮০০০। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই মিলে মিশে বাস করছে এখানে। পূর্ববঙ্গ থেকেও বহু লোক এসেছে এখানে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে গ্রামের আয়তনও।

শোনা যায় অতীতে এখানে নীল চাষ হতো। তবে কোন কুঠী বাড়ী এখানে নেই। যদিও শিমুরালির চাঁদুরিয়ায় একটি কুঠী বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে।

২। নামকরণ ঃ—

শোনা যায় একদা এই এলাকায় ছিল গভীর জঙ্গল। ঐ জঙ্গলে বাঘ, শিযাল, বুনো শূয়োর এবং খটাসেরা ঘুরে বেড়াতো নির্ভয়ে। সাহেব এবং জমিদাররা ঐ জঙ্গলে আসতেন শিকার করতে মাঝে মাঝেই। এই শিকার থেকেই কালক্রমে জায়গাটির নাম হয়ে যায় শিকারপুর।

৩। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার ঃ—

এখানে আছে ৬ টি অঙ্গনওয়ারি এবং তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি হাইস্কুল ও একটি জুনিয়র হাইস্কুল। গ্রামের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক সাক্ষর। ডক্টর রমাপদ চৌধুরী ও ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ তরফদার গ্রামের দুই কৃতি সন্তান।

৪। যোগাযোগ ও জীবিকা

রাস্তাঘাট ভালই। এটি কৃষি প্রধান গ্রাম হলেওও ব্যবসা এবং চাকুরীতেও যুক্ত আছে বহুলোক। দ্রুত গঞ্জের রূপ নিচ্ছে এই শিকারপুর গ্রামটি।

৫। পূজা পার্বণ ঃ—

এখানে প্রতিবছর পাঁচটি দুর্গাপূজা ও ছটি কালী পূজা এবং সরস্বতী পূজাও হয়ে থাকে প্রচুর। এছাড়া-মুসলমানরা ইদল ফিতর, মহরম প্রভৃতি উৎসব যথাযথ মর্য্যাদার সঙ্গেই পালন করে থাকেন।

এই গ্রামে আছে শিব দুর্গা ও কালী মন্দির। মন্দির তিনটি রয়েছে কালী তলায়। পাশের গ্রাম প্রিয় নগরে মাঘী পূর্ণিমায় ঘটা করে হয় বিখ্যাত রাজ রাজেশ্বরী দেবীর পূজা। ঐ পূজা উপলক্ষ্যে বিরাট মেলাও বসে।

৬। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ঃ—

বিভিন্ন পূজা উপলক্ষ্যে এই গ্রামে বিতর্ক, সঙ্গীত, ক্যুইজ এবং নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন হয়ে থাকে। থিয়েটার এবং যাত্রানুষ্ঠানও হয়ে থাকে কখনো কখনো।

প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময়ে 'সবুজের খোঁজে' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। নতুন নতুন লেখকের আত্মপ্রকাশ ঘটে ঐ পত্রিকার মাধ্যমে।

এছাড়া প্রতিমাসে বের হয় 'সবুজের খোঁজের' দেয়াল পত্রিকাও। এই পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ইদানীং।

৭। ব্রত পার্বণ ঃ—

এই গ্রামের মেয়েরা যে সব ব্রতাদি পালন করে থাকেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'জয়চন্ডীর ব্রত, জয় মঙ্গলবার ব্রত, সত্যব্রত, বিপত্তারিণীর ব্রত, সূর্য্যব্রত, তুলসী পূজাও ইতু পূজার ব্রত।

এছাড়া অশোক ষষ্ঠী, মূলা ষষ্ঠী, দুর্গাযষ্ঠী, প্রভৃতিও করে থাকেন মেয়েরা।

শনিবারে বারের পূজাও বেশ-জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বর্তমানে এই গ্রামে। এখানে হাই স্কুলের পাশে একটি শনি মন্দিরও হয়েছে। প্রচুর ভীড় হয় ঐ মন্দিরে প্রতি শনিবারেই।

তুলসী পূজার সময়ে যে মন্ত্রটি মেয়েরা বলেন সেটি হলো—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী ব্রাহ্মণ।
তোমার তলায় ঢালি জল।
অন্তিমকালে দিও স্থল।"

৮। লোক সংস্কৃতি ঃ—

শিকারপুরের বহু মানুষই বাউল সঙ্গীতের ভক্ত। নামকরা শিল্পী তেমন না থাকলেও অনেকেই বাউল গান গায়। প্রতিবছরই এখানে বাউল গানের আসর বসে।

এছাড়া কীর্তনের দলও আছে। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প অবশ্য এ গ্রামে নেই।

তবে গ্রামে ছড়িয়ে আছে নানা লোককথা এবং লোকশ্রুতির কাহিনীও। এগুলো প্রাচীন ও প্রাচীনদের কাছ থেকে এখনই সংগ্রহ না করলে চিরতরে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

কালীপুর

১। পরিচিতি ঃ—

চাকদহ থানার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম হল কালীপুর। কল্যাণী মহকুমার বিখ্যাত শিকারপুরের পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রাম। এই গ্রামের উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী নদী। গ্রামটি আকারে খুব বড় না হলেও লোকসংখ্যা প্রায় তিনহাজার। হিন্দু প্রধান এই গ্রামে মাহিষ্য ও কায়স্থদের সংখ্যাই বেশি।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার ঃ—

কালীপুরে রয়েছে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টি উচ্চ বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান খুব ভাল না হলেও হাইস্কুলটির শিক্ষার মান কিন্তু বেশ ভালই। এই স্কুল থেকে বেরিয়ে বহু কৃতি ছাত্র ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে। শিক্ষার হার শতকরা নব্বই (৯০) এই গ্রামে।

৩। পূজা ঃ—

গ্রামে ২ টি বারোয়ারী আছে। প্রতি বছর খুব ধুম ধাম করে সেখানে দূর্গাপূজা ও কালীপূজা হয়ে থাকে। এছাড়া লক্ষ্মীপূজাও হয়। আর সরস্বতী পূজাতো প্রায় ঘরে ঘর হয়ে থাকে।

কালীপুরের ঘাটে যে বিশাল বটগাছটা আছে সেটি বাঁধানো হয়েছে এবং এখানে একটি শিব মন্দিরও আছে। নিত্য শিবের পূজা হয়। তবে শিবরাত্রির উৎসবের সময় খুবই ধুমধাম হয়। শ্রাবন মাসে ঘরে ঘরে মনসার ঘটে পূজা হয়ে থাকে। আগে ঐ উপলক্ষ্যে ঝাপানও হতো তবে এখন হয় না।

৪। মেলা ও উৎসব ঃ—

কালীপুরের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে মূলত ফাল্গুন মাসের রং দোলের উৎসবের জন্য। ঐ সময় গ্রামে একটি বিশাল মেলা বসে। মেলাটি চলে প্রায় চারদিন ধরে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজনরা আসে। ঐ সময় রসগোল্লা খাওয়ানোর একটা বিশেষ প্রথা প্রচলিত আছে। আশে পাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক যোগ দেয় ঐ মেলায়। ঐ উপলক্ষ্যে পালা কীর্ত্তন হয়ে থাকে কখনো কখনো যাত্রাও হয়ে থাকে।

৫। ব্রত পার্বণ ঃ—

গ্রামের মেয়েরা ইতু পূজো ছাড়াও জয়মঙ্গলবার ব্রত, বিপদত্তারিনী ব্রত, ও শিব রাত্রির ব্রতও পালন করে থাকে।

নবান্নের উৎসব তেমন চোখে না পড়লেও পৌষ পার্বণের উৎসবের ঘটা লক্ষ্য করা যায় প্রায় প্রতি ঘরে।

৬। যোগাযোগ ও আর্থিক অবস্থা ঃ—

গ্রামের রাস্তাঘাট মোটামুটি ভালই। কৃষি নির্ভর গ্রাম হলেও গ্রামের অনেকেই ব্যবসা এবং চাকুরীর সঙ্গে যুক্ত আছেন। গ্রামবাসীদের প্রায় সকলেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সজাগ। আর্থিক দিক দিয়ে সকলের অবস্থা বেশ সচ্ছলই বলা যায়।

৭। সাংস্কৃতিক চিত্র ঃ—

গ্রামে উৎসাহী যুবক এবং সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষদের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী ও বেশ উৎসাহেব সঙ্গে পালিত হয় এবং ঐ উপলক্ষ্যে আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য এবং কুাইজের প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। বহু ছেলে মেয়ে এই সব প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং তাদের পুরস্কারও দেওয়া হয়।

৮। লোকসংস্কৃতি

গ্রামের কীর্ত্তন গানের প্রচলন থাকলেও লোকসঙ্গীতে চর্চা বিশেষ নেই বললেই চলে।

তবে বয়স্কাদের কাছে খোঁজ নিলে পাওয়া যেতে পারে বহু প্রবাদ ও প্রবচন। পাওয়া যেতে পারে লোকশ্রুতি এবং বহু লোক কথাও। এ ব্যাপারে লোকসংস্কৃতি প্রেমিক গবেষকদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।

ম্যাচপোতা

১। পরিচিতি ও প্রাক্ ইতিহাস ঃ—

ম্যাচপোতা গ্রামটি নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত। ধনঞ্জয়পুর এক নম্বর পঞ্চায়েতের অধীন এই গ্রামটির অবস্থান প্রায় বিল মাঠের মধ্যেই বলা যায়। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটা খাল। পাগলাচন্ডীর সঙ্গে যুক্ত এই খালটি মিশেছে জলঙ্গীর বুকে। নিম্নজলাভূমি বলে গ্রামটি প্রায়ই বন্যার কবলে পড়ে। অবশ্য তার ফলে পলিমাটির কল্যাণে যেমন জমির উর্বরতা বেড়ে যায় তেমনি প্রচুর মাছেরও আমদানি হয়। তবে গ্রামের বাড়ীগুলো যথাসম্ভব উঁচু ভূমিতেই অবস্থিত। বহুকাল আগে এই বিল মাঠে জেলেরা মাছ ধরতে আসতো দূর-দূর থেকে। প্রায় পাঁচশো বছর আগে ঐ সব জেলেরাই এখানে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে লোক সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং গ্রাম গড়ে ওঠে এই নিম্ন জলাভূমিতে।

২। নামকরণ ঃ—

এই গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে জানা যায় যে এখানে আগে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো বলে এই স্থানের নাম হয় মাছপোতা। আবার কেউ কেউ বলেন বন্যার জল সরে যাওয়ার সময় পলিতে প্রচুর মাছপোতা থাকতো বলেই এই স্থানের নাম হয় মাছপোতা। পরে লোকমুখে বিবর্তিত হতে হতে মাছপোতা হয় মেছোপোতা এবং শেষে হয়ে দাঁড়ায় ম্যাচপোতা!

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও শিক্ষার হার ঃ—

প্রায় তিন হাজার লোকের বাস এই গ্রামটিতে। গ্রামে রয়েছে তিনটি অঙ্গনওয়ারী ও তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গ্রামের প্রায় আশি ভাগ লোক সাক্ষর।

৪। আর্থিক অবস্থাও যোগাযোগ ঃ—

গ্রামটি মূলত কৃষি প্রধান গ্রাম হলেও বর্তমানে মাছ ধরা এবং দুধের ও সব্জীর ব্যবসাতেও যুক্ত আছে বহু লোক। জেলে, ঘোষ, রাজবংশী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেরই অবস্থা বেশ সচ্ছল। গ্রামে চুরি ডাকাতি বিশেষ নেই বললেই চলে তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। শিবপুরে থেকে বেথুয়াডহরী পর্য্যন্ত যে কাঁচা রাস্তাটি চলে গেছে সেটাই অন্যান্য গ্রাম বা গঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। বর্ষাকালে চারদিক জলে ডুবে গেলে নৌকাই একমাত্রা ভরসা।

৫। সরকারী পরিষেবা ঃ—

গ্রামে রয়েছে পোষ্টাফিস, পঞ্চায়েত অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইলেকট্রিক অফিস এবং স্থাপিত হয়েছে একটি পুলিশ ক্যাম্পও।

৬। পূজা ঃ—

ম্যাচপোতার প্রধান পূজা হলো গণেশ জননীর পূজা। দেবী দুর্গার যোগমায়া রূপেই হয় এই পূজাটি। সরস্বতী পূজার পরের দিন থেকে পরপর পাঁচদিন চলে এই পূজা। মূর্তিটি স্বপ্নে পাওয়া। দেবীর দুটি হাত। পাশে জয়া-বিজয়া। কোলে গণেশ। চারদিন ব্যাপী বিরাট মেলাও বসে ঐ উপলক্ষ্যে। খুবই হৈ হৈ রৈ রৈ চলে পূজার সময়।

কবে থেকে যে গণেশ জননীর পূজো শুরু হয়েছে তা বলতে পারেনা কেউই। অন্তত চারশো বছরের পুরনো এই পূজো। শোনা যায় ২০০ মছর আগে নাকি একবার বন্ধ হয়েছিল দেবীর পূজা। কিন্তু সে বছরই সারা গ্রাম আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল।

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে বিসর্জনের দিন যদি কোন নারী গণেশকে কোলে নেয় তবে তার পুত্র সন্তান হয়। ভারতের আর কোথাও গণেশ জননীর পূজা হয় বলে জানা নেই আমাদের। এদিক দিয়ে ম্যাচপোতা এক বিরল গৌরবের অধিকারী।

অন্যান্য পূজা ঃ—

এছাড়া লক্ষ্মী, কালী দূর্গা ও সরস্বতী পূজাও হয়ে থাকে। এই গ্রামে।

৭। ব্রত পার্বণ ঃ—

গ্রামের মেয়েরা ইতুপূজো, কাঁচাঘট পূজো, অশোক ষষ্ঠীর ব্রত যেমন পালন করে তেমনি কলুই চন্ডীর ব্রত ও পালন করে থাকে।

এছাড়া বসন্তকালে 'পালনী ব্রত' করে থাকে মেয়েরা। তিনদিন ধরে চলে এই ব্রতানুষ্ঠান। গ্রামের শেষে তেমাথায় এবং দেবস্থানে তিনদিন মাটির প্রদীপ জ্বালায় এবং চতুর্থদিন ব্রহ্মাণী তলায় সারাদিন উপবাসী থেকে বিশেষ পূজাপাঠ সারে। এরপরে উপবাস ভঙ্গ করে সবাই। সমস্ত গ্রামবাসীর মঙ্গল কামনাই এই পালনীর উদ্দেশ্য।

ভদ্রমাসের সংক্রান্তিতে জেলেরা লক্ষ্মীপূজা করে এবং নৌকা পূজা করে। রাতে নৌকাতে চড়ুই ভাতি করে হৈ হৈ করে ছেলেমেয়েরা। নৌকা যে জেলেদের লক্ষ্মী তাইই নৌকাপূজা!

৮। লোক সংস্কৃতি ঃ—

গ্রামে বোলান গানের দল আছে। বাইরেও যায় তারা গান করতে। তাছাড়া বাউল এবং কীর্তনের আসরও বসে মাঝে মধ্যে। তবে নামকরা শিল্পী তেমন কেউ নেই। গ্রামে ছড়িয়ে আছে বহু লোককথা এবং প্রবাদ প্রবচন।

সাংস্কৃতিক দিকঃ—

সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে গ্রামটি একটু পিছিয়েই আছে এই অংশের অন্যান্য গ্রামের থেকে।

"রামজীবনপুর"

১। পরিচিতি ঃ—

তেহট্টথানার গোপালপুরের উত্তরের গ্রামটি হল রামজীবনপুর। এই গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ১২০০। গ্রামটি নতুন। গ্রামের বেশিরভাগ লোকই এসেছেন একাত্তর সালের ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ফরিদপুর জেলা থেকে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার ঃ—

গ্রামে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। হাইস্কুল নেই। বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে পাশের গ্রাম দেবনাথপুর হাইস্কুলে যায়। গ্রামের প্রায় ৬০ ভাগ লোক সাক্ষর।

৩। যোগাযোগ ও আর্থিক চিত্র ঃ—

গ্রামের রাস্তা কাঁচা। বহুক্ষেত্রে উঠোন এবং রাস্তা এক হয়ে মিশে গেছে। তবে রাস্তা খুবই পরিচ্ছন্ন। ছায়া সুনিবিড় গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে যায় প্রাচীন বাংলার গ্রামের কথা। প্রতিটি বাড়ীর উঠান ঝক্ঝকে চক্চকে। ঘরগুলো মাটির হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেক বাড়ীতেই লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা হয়। সর্বত্রই যেন বিরাজ করছে লক্ষ্মীশ্রী।

ওপার থেকে আসা মানুষরা তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমস্ত বাধা দূর করে আজ জীবনের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মাঠে সবুজ শস্যের হাসি এবং দিকে দিকে মাথা তুলছে সব্জীর ক্ষেত। গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরই অবস্থা সচ্ছল।

৪। পূজা-পার্বণ ঃ—

গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় দুটি করে দুর্গাপূজাও কালীপূজা হয়। ঐ সময় বাউল গান এবং যাত্রার আসরও বসে।

এছাড়া গ্রামের প্রায় বাড়ীতেই হরি ঠাকুরের পূজো হয়।

পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে যে পৌষ কালির পূজো হয় তাতে প্রচুর পাঁঠা বলি হয় এবং খুবই ধুমধাম হয়।

মাঘী পূর্ণিমাতে হয় লক্ষ্মীপূজো। মূর্তি নির্ম্মাণকরে খুবই সমারোহ করে লক্ষ্মীর আরাধনা চলে।

তবে এই গ্রামে যে পূজার জন্য সর্বাধিক খ্যাতি তা হল কাত্যায়নী পূজা, কার্ত্তিক মাসের এই কাত্যায়নী পূজাপলক্ষ্যে সাত দিন ধরে মেলা বসে। এই কাত্যায়নী দেবী আসলে দেবী দুর্গারই আর এক রূপ। কাত্যায়নী ঋষি প্রথমে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন এই মূর্তিতেই। এই পূজো উপলক্ষ্যে যাত্রা, থিয়েটার, বাউল এবং ধর্মীয় গানের আসর বসে। গ্রামের অধিবাসীরা সারাবছর প্রতীক্ষায় থাকে কবে কাত্যায়নী দেবীর পূজা আসবে। ১৩৮০ সালে কাত্যায়নী দেবীর স্থায়ী মন্দির নির্মিত হয়েছে।

৫। ব্রত ঃ—

গ্রামের মেয়েরা যে সব ব্রত পালন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইতু পূজা ও সূর্য পূজো। সূর্যপূজাকে আবার মাঘী ব্রতও বলা হয়। এই মাঘী ব্রত মাঘ মাসে গ্রামের বয়স্কা মহিলারা করে থাকেন।

নবান্নের উৎসব এবং পৌষ পার্বণ যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। এছাড়া দোল পূর্ণিমা এবং জন্মাষ্টমীর উৎসবেও গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই যথেষ্ট উচ্ছ্বাস এবং আবেগের সঙ্গে মেতে ওঠেন।

৬। লোক সংস্কৃতি ঃ—

নানা ধরনের ব্রত কথা ও লোক কাহিনী প্রচলিত আছে এই গ্রামে। প্রবাদ প্রবচন এবং ধাঁধাও মুখে মুখে ফেরে। এই সবক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার লোকঐতিহ্য সহজেই চোখে পড়ে। গ্রামে বেশ কয়েকজন বাউল গান করে থাকেন। গ্রামের বিশিষ্ট বাউল গায়ক হলেন আশুবালা। এছাড়া আরেকজন বিখ্যাত গায়ক হলেন নগেনবাবু।

গ্রামে দেহতত্ব মূলক গানের ব্যাপক প্রচলন আছে। দেহতত্বমূলক গানের বিশিষ্ট শিল্পী হলেন ভোলানাথ মন্ডল, কেষ্টবারিকদার ও আশুবালা। বিজয় সরকার রচিত একটি বিখ্যাত দেহতত্ত্বমূলক গান হল—

"পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী,
একদিন জেনো পোহালে রজনী।
তাই ওরে মন, গুরু-ভজ-এক মনে—
দিবা সন্ধ্যায় সংসার কাননে।

৭। উপসংহার ঃ—

সংগ্রামী গ্রামবাসীরা যেভাবে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে চলেছেন এবং সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

হেমন্তের এক গোধূলি লগ্নে এই গ্রামের পথে পথে দল বেঁধে ঘুরতে ঘুরতে বারবারই মন চলে যাচ্ছিল অতীত দিনের আনন্দময় লক্ষ্মী শ্রীযুক্ত গ্রাম বাংলার বুকে। আবু, হাসান, চঞ্চল, শ্রীকান্ত, কাপু, কান্ত, শিপ্রা, শিল্পীও নবনীতারা বারবারই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল এই গ্রামের আনন্দময় পরিবেশে। তবে খালের উপরে বাঁশের সাঁকোতে পার হবার ব্যাপারটা সত্যই বড় মধ্যযুগীয় যোগাযোগের ব্যবস্থা বলেই মনে হয়েছে সবার। বাঁশের সাঁকোটি বি পাকা সেতু হবে না কোনদিনই? উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিকি পড়বে না এই সাঁকোর ওপর?

গোপালপুর

১। পরিচিতি ঃ—

তেহট্ট মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামটি একটি বেশ প্রাচীন গ্রাম। গ্রামটি লম্বার প্রায় ২ কিলোমিটার। কাছেই বাংলাদেশ সীমান্ত। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০ নদীয়ায় গোপালপুর নামে আরো কয়েকটি গ্রাম থাকলেও তেহট্টের কাছের এই গ্রামটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি বড় খাল। বর্তমানে খালটি সরু হয়ে এলেও একদা এটি যে প্রায় নদীর মতোই ছিল তা এর পুরানো খাত দেখলেই বোঝা যায়।

২। প্রাক্ ইতিহাস ঃ—

একদা নদীয়ার এই অংশে প্রবাহিত ছিল ভয়ংকর ভৈরব নদী এবং তার শাখানদী। কিন্তু বন্যা, ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে মূল ভৈরব নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। শাখানদী গুলোও ধীরে ধীরে ম্রিয়মান হয়ে খালে পরিণত হয়েছে।

সমৃদ্ধ নদীতীরে একদা যে সব সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল সেই সবগ্রাম তাদের প্রাচীন গৌরব হারিয়ে কালের প্রবাহে কেমন যেন দীন হীন হয়ে পড়েছে।

একদা এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী তীরে গড়ে উঠেছিল নীলকুঠি। গোপালপুরে ঢোকার মুখেই পড়ে যে নাটনা গ্রাম সেই গ্রামে এখনও নদীতীরে বিশাল কুঠীবাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে।

আরো আগে গোপালপুর গ্রামটি ছিল বৌদ্ধ প্রভাবিত গ্রাম। যার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল এখানকার ধর্মরাজের মন্দিরও তার পূজা পদ্ধতি।

৩। যোগাযোগ ও আর্থিক অবস্থা ঃ—

গোপালপুর গ্রামটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। গ্রামের রাস্তাটি কাঁচা। একদা বাস রাস্তা পর্যন্ত ইটের রাস্তা করা হলেও বর্তমানে তার চিহ্ন নেই। গ্রামে ঢুকতে গেলে খালের উপরে নড়বড়ে সেতু পেরিয়েই ঢুকতে হয়।

গ্রামটি হিন্দু প্রধান গ্রাম। ঘোষ, মাহিষ্য এবং তপশীল জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এই গ্রামে শতকরা ৯৫ জন লোকই কৃষিজীবী। মোটামুটি আর্থিক দিক দিয়ে সকলেই স্বচ্ছল।

৪। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার হার ঃ—

গ্রামে ২ টি প্রাইমারী স্কুল থাকলেও মাধ্যমিক স্কুল নেই। গ্রামের ছেলে মেয়েরা তেহট্ট ও দেবনাথপুর হাইস্কুলে পড়তে যায়। শতকরা ৫০জন সাক্ষর।

সাক্ষর। কৃষিছাড়া ব্যবসা এবং চাকুরীতেও নিযুক্ত আছেন কয়েকজন।

৫ পূজা পার্বণ ঃ—

গ্রামে দুর্গাপুজা, কালীপুজা, বেশ ধূমধাম করেই হয়। এছাড়া ফাল্গুন মাসে শিব পূজোও হয় বেশ ঘটা করেই। সারাদিন উপবাসে থেকে মেয়েরা জল ঢালে শিবের মাথায়। পূজো করে ভক্তি ভরে।

চৈত্র মাসের শেষে ঘোষপাড়ার গাজনতলায় গাজন হয়। ঐ সময় অনেকে সন্ন্যাসী হয় এবং নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে থাকেন। আগে একমাস ধরে সন্ন্যাসী হতে হলেও বর্তমানে হতে হয় মাত্র সাত দিনের জন্য। মূল সন্ন্যাসী ঘোষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়ে থাকেন। এখানে আগে চড়কও হত।

সন্ন্যাসীরা চড়কে ঘুরতেন, বাণ-ফোঁড়া, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ইত্যাদি নানা ক্রিয়াকলাপ তাঁরা দেখাতেন। তবে বর্তমানে গাজন উৎসবের সমারোহ কমে এসেছে।

এই গ্রামের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল ধর্মরাজের পূজো। গ্রামের বাগদি পাড়ায় রয়েছে ধর্মরাজের মন্দির। ঐ মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। কিন্তু ধর্ম রাজের প্রতীক হিসাবে আছে গোলাকার একখন্ড সাদা পাথর। কত যুগ ধরে যে এখানে ধর্মরাজের পূজো হয়ে আসছে তা বলতে পারেনি কেউই। এই ধর্ম রাজ যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা একথান বললেও চলে। ধর্মরাজের পূজা পদ্ধতির মধ্যেও প্রাচীন দিনের বৌদ্ধরীতি লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ধর্মরাজের ব্যাপক প্রভাব আছে।

ধর্মরাজের কৃপায় বন্ধ্যানারীর সন্তান হয়, মন্ত্রপূত জল ও তেলে নানা অসুখ সেরে যায়। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হলে ধর্মরাজের কাছে গোপালের মূর্তি উৎসর্গ করা হয়। প্রচুর গোপাল মূর্তি জমা আছে ধর্মরাজের মন্দিরে।

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মরাজের বিশেষ পূজো হয়। ৭ দিনের জন্য অনেকেই সন্ন্যাসী হন ধর্মরাজের জয়ধ্বনি দেন। বিশেষ পূজোর দিন আগুনে ঝাঁপ দেনও বাণ ফোটান । ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজো চলে তিন দিন ধরে। এবং ঐ সময় একটি মেলাও বসে তিনদিনের জন্য।

এই ধর্মরাজের প্রধান পুরোহিত ছিলেন আগে জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় বর্তমান পূজারী চরণ প্রামাণিক। তবে বহুপূর্বে বীরভূমের পূজারীর হাতেই ছিল পূজার ভার।

৬। ব্রত অনুষ্ঠান ঃ—

গ্রামের মেয়েরা ইতু পূজো, কাঁচা ঘট পূজো ও কলুই চন্ডীর পূজো করে থাকেন। কলুই চন্ডীর পূজায় কুলোতে ১৭টি পিটুলির ফোঁটা দেওয়া হয়। ১৭টা কুলের পাতা রাখা হয় ১৭ টা মুলোর চাকা এবং একটি মূলো রাখা হয়। এছাড়াও থাকে ১৭টা নতুন আ·ন ধান। ১৭ টা দূর্ব্বা ঘাস। ১৭টি কলার পাতাও ২ টি মানুষের মূর্তি আঁকা থাকে। পূজা শেষ হলে ব্রতিনীরা ঐ কূলো মাথায় করে নদী বা পুকুর ঘাটে যান এবং একজন ব্রতিনী ঐ কুলোটি মাথায় কুরে ডুব দিয়ে পূজার উপকরণ জলে ভাসিয়ে উঠে আসেন। পূজার সময় কলুই চন্ডীর উপাখ্যানও বলা হয়। ব্রতিনীরা সকলে সারাদিন উপবাস করে থাকেন। এবং পূজার শেষে রুটি বা লুচির প্রাসাদ গ্রহণ করে থাকেন।

৭। মন্দির ও মেলা ঃ—

গ্রামে ২ টি শিব মন্দিরও ১ টি ধর্মরাজের মন্দির রয়েছে। এখানে গাজনে ও ধর্মরাজের পূজোর সময় ১টি করে মেলা বসে থাকে।

৮। লোকসংস্কৃতি ঃ—

গ্রামের প্রাচীন বৃদ্ধাদের মুখে এখনো শুনতে পাওয়া যায় নানা লোককথা এবং প্রবাদ প্রবচন তবে এসবই অতি সাধারণ গ্রামীন জীবনকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

গ্রামে বেশ কয়েকজন ভালো বাউল গানের শিল্পী যেমন আছে তেমনি ভাটিয়ালী এবং দেহতত্ব বিষয়ক গানেরও প্রচলন আছে।

কীর্ত্তন গানের দল না থাকলেও মাঝে মাঝে কীর্তনের আসর বসে। কীর্তনে বাউলের গানে জ্যোৎস্না রাতে গোপালপুর গ্রামটি আজো উদ্বেলিত হয়ে থাকে।

এই গ্রামে ছড়িয়ে আছে লোক শ্রুতির নানাকাহিনীও। এগুলো এখনই সংগ্রহ করে রাখা দরকার নইলে হারিয়ে যাবে অচিরেই।

আর. সি. গঞ্জে

১। ইতিহাস ও নামকরণ :—

নদীয়া জেলায় সাহেবদের স্মৃতি বিজড়িত যেকটি গ্রাম আছে সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো তেহট্ট থানার অন্তর্গত এই আর. সি. গঞ্জ গ্রামটি।

তেহট্ট থেকে যে বাস রাস্তাটা পলাশীর দিকে চলে গেছে সেই রাস্তার পাশেই পড়বে ভাঙাচোরা ধূলো ভর্তি একটা পথ। সেইপথ ধরে হলুদ সরষে ফুলের শোভায় মোহিত হতে হতে কিছুটা এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে একটা প্রাচীন পিটুলি গাছ। গাছটার বয়েস যে কতো বছর বলতে পারেনা কেউই। হতে পারে দুশো তিনশো কিংবা আরো বেশী। তবে মূল গাছটার মূলটাই শুধু আছে তাকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে নবীন প্রজন্মের নবীন গাছ। এ গ্রামের লোক সংস্কৃতির পীঠস্থান এই পিটুলিতলা।

এই গাছতলাকে লোকে বলে সন্ন্যাসীতলা। এখানে সিঁদুর চর্চিত প্রস্তরখণ্ড এবং ত্রিশূল রয়েছে। চৈত্র মাসে গাজন-উৎসব জমে ওঠে এই সন্ন্যাসী তলায়। কার্তিক পূজায় ধুম লেগে যায় বাজি-পটকার। বের হয় বিচিত্র সব সঙও।

গ্রাম পথে ধূলো মাখতে মাখতে এগিয়ে চলুন দেখা হয়ে যাবে শ্যামসুন্দর বাবুর সঙ্গে ওর মুখে শুনতে পাবেন এ গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস—এই গ্রামটি গড়ে উঠেছে মাত্র একশো বছর ধরে। প্রচুর 'মুথা' ঘাস ছিল একদা এই অঞ্চলে। তাই প্রথমে এ গ্রামের নামছিল 'মুথারী' গ্রাম। মুথা থেকেই মুথারী। মুথা ঘাস ছাড়াও চারদিকে ছিল ছোট বড় আগাছার জঙ্গল। খটাস্ শেয়াল এবং নানা জীবজন্তুর আবাস ছিল ঐ জঙ্গলে।

এ গ্রামের পশ্চিমে ছিল জলঙ্গীর শাখা নদী তার তীরেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন নীলকুঠী। এখনো পাশের গ্রাম তারানগরে রয়েছে সেই নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ। গ্রামটির সব জমিই ছিল একদা 'রোণাল্ড' সাহেবের। ঐ রোণাল্ড সাহেবের নামেই গ্রামটির নাম হয়েছে আর. সি. গঞ্জ।

শ্যামসুন্দর বাবুর কাছে আর কোন তথ্য না পেয়ে এগিযে চলুন মণ্ডল বাবুদের বাড়ী। শচীন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং তাঁর ভাই সাদরে গ্রহণ করবেন আপনাকে এবং ধূমায়িত চাএর সঙ্গে নারকেল-মুড়িতে আপ্যায়িত করে সরবরাহ করবেন বহু মূল্যবান তথ্য। শুনতে পাবেন 'রোণাল্ড-কল-হিল' সাহেবের সম্বন্ধে নানা কথা। কেউ বলেন তিনি ছিলেন নীলকুঠীর সাহেব আবার কেউবা বলেন তিনি ছিলেন 'সার্ভেয়ার'। এই গ্রামটির নাম কবে থেকে যে আর. সি. গঞ্জ হয়েছে তা অবশ্য বলতে পারবেন না শচীন বাবুরাও।

বাংলা ১৩১১ সালে পার্শ্ববর্তী গ্রাম কৃষ্ণচন্দ্রপুর থেকে এই মুথা ঘাসের জঙ্গলে এসে বাস করতে শুরু করেন অঘোর বিশ্বাস। দু বছর পরে আসেন কালিপদ মণ্ডল এবং বল্লভ বিশ্বাস। এরপর ধীরে ধীরে বিগত একশো বছরের মধ্যে লোকবসতি গড়ে ওঠে এই গ্রামে।

এই গ্রামটি তিনটি মৌজায় বিভক্ত। শ্যামনগর, কৃষ্ণচন্দ্রপুর এবং রঘুনাথপুর মৌজার অন্তর্গত এই গ্রামটি।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রমে বঙ্গীয় মাহিষ্য পরিষদের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে প্রায় কুড়ি হাজার বিশিষ্ট জনগণের সমাবেশ হয়েছিল। ঐ সভার স্মৃতি এখনো গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে।

২। জনসংখ্যা ও আর্থিক চিত্র :—

গ্রামের জনসংখ্যা বর্তমানে সাতশোর কাছাকাছি। বেশীর ভাগই কৃষিজীবী বেশ কয়েকজন ব্যবসা এবং বিভিন্ন চাকুরীর সঙ্গেও যুক্ত। সামগ্রিকভাবে গ্রামবাসীর অবস্থা বেশ ভালই বলতে হবে। বেশীর ভাগ বাড়ীই ইটের তৈরী পাকা বাড়ী। তবে যোগাযোগের রাস্তা খুবই নিম্নমানের। এককালে ইট পড়েছিল বটে বর্তমানে সবই ভাঙা।

৩। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার হার :—

এই গ্রামে রয়েছে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামের ছেলে মেয়েরা দূরের গ্রামের স্কুলে পড়তে যায়। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছে চারজন শিক্ষক। স্কুল বাড়ীটি পাকা এবং শিক্ষার মান মোটামুটি ভালই।

তবে সার্বিক ভাবে কৃষি প্রধান এই গ্রামটির শিক্ষার হার কিন্তু মোটেই আশানুরূপ নয়। মাত্র চল্লিশভাগ লোক সাক্ষর বলে জানালেন শচীন বাবু।

৪। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ :—

এই গ্রামের কিশোরসঙঘ এবং আর. সি. গঞ্জ স্পোর্টস এ্যাণ্ড কালচারাল ফোরামের পরিচালনায় রবীন্দ্র জয়ন্তী, ২৩শে জানুয়ারী ও অন্যান্য বিশেষ দিনে নানা ধরণের সাংস্কৃতিব ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবৃত্তি, নৃত্য ও ক্যুইজের সঙ্গে নাটকের প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরাও যোগ দেয় ঐ সব প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠানে।

এছাড়া বার্ষিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে ক্লাবের পরিচালনায়।

৫। পূজা পার্বণ :—

এই গ্রামে একটি মাত্র দুর্গাপূজা হয়ে থাকে গ্রামের বারোয়ারী তলায়। তবে দুর্গাপূজা একটি হলেও কালীপূজা হয়ে থাকে তিনটি। বেশ কয়েকটি সরস্বতী পূজাও হয়।

তবে এই গ্রামের গর্ব হলো কার্তিক পূজা। 'সন্ন্যাসী তলাতেই' হয় কার্তিক পূজা। গ্রামবাসীরা সারাবছর প্রতীক্ষায় থাকে কবে আসে ঐ কার্তিক পূজার দিনটি। প্রায় দুদিন ধরে চলে হৈ হৈ রৈ-রৈ। বিরাট মেলাও বসে ঐ উপলক্ষ্যে। হাজার হাজার লোকের ভীড়ে গম্ গম্ করে ওঠে মেলাপ্রাঙ্গন। নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে ছোটা ছুটি লাগায় ছেলেমেয়েরা। মাইকের গানে ও ঘোষণায় বাঁশীর শব্দে, পট্‌কার আওয়াজে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে গ্রামের 'সন্ন্যাসীতলা'। রাত্রে চলে বাজির প্রতিযোগিতা। বিচিত্র সাজে সেজে বের হয় 'সঙ্'। হাসি উচ্ছ্বাসে কলরব কোলাহলে মধুময় হয়ে ওঠে এই আর. সি. গঞ্জের আকাশ বাতাস। আনন্দের হাট বসে যায় যেন।

৬। ব্রতানুষ্ঠান :—

গ্রামের মেয়েরা যথাযথ নিষ্ঠা এবং ভক্তি সহকারে যেমন ইতুর ব্রত পালন করে তেমনিই 'বিপত্তারিণী' মঙ্গলচণ্ডী এবং ষষ্ঠীর ব্রতাদিও পালন করে থাকে।

৭। লোক সংস্কৃতি :—

(ক) বোলান :—এই গ্রামের বোলান গানের খ্যাতি ছড়িয়ে আছে গোটা মহকুমায়। চৈত্রমাসের গাজন উপলক্ষ্যে সন্ন্যাসীতলায় বসে বোলান গানের আসর। সঙ্গীত এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বোলান গায়করা গ্রামীন নরনারীকে দান করেন অনাবিল আনন্দ।

গ্রামের বিশিষ্ট বোলান অভিনেতা শ্রীতরুণ বিশ্বাসও দিনেশ বিশ্বাস। আর বিখ্যাত বোলান গায়ক হলেন সুন্দর হালদার মহাশয়।

(খ) কবিগান :— এই গ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল হলেন মন্মথ বিশ্বাস। তবে বর্তমানে এই গানের আসর আর বসে না সন্ন্যাসীতলায়।

(গ) বাউল এবং দেহতত্ত্ব :— আগে বাউল এবং দেহতত্ত্বমূলক গানের আসর বসলেও বর্তমানে আর ঐসব গানের আসর জমে না তেমন।

(ঘ) কীর্তন :— এই গ্রামে কীর্তনের আসর বসে প্রায়ই তাছাড়া জন্মাষ্টমীতেও কীর্তন হয় বারোয়ারীতলায়।

৮। লোকসাহিত্য :—

(ক) ছড়া—প্রবাদ—লোকশ্রুতি :—

গ্রামের বয়স্কাদের মুখে মুখে একদা ছড়া এবং নানাবিধ প্রবাদের খৈ ফুটলেও বর্তমানে শত চেষ্টা করেও সেসব সংগ্রহ করা যায় না আর। 'মরাগাঙ' নিয়ে দু একটি লোকগান প্রচলিত থাকলেও লোক সাহিত্যের উপাদান তেমন পাওয়া যাবে না এই গ্রামে। ভাবী গবেষকদের দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি এই গ্রামে বর্তমান লেখকের গবেষণা সঙ্গী বিশাখা, দেবু, চঞ্চল, শিল্পী, নবনীতা ও শেফালীরা বহু চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি এই ক্ষেত্রে। শুধু মাত্র একটি লোকশ্রুতি সংগৃহীত হয়েছে এই গ্রাম থেকে।

(খ) লোকশ্রুতি :—

এই গ্রামের সন্ন্যাসীতলাকে কেন্দ্র করে যে লোকশ্রুতিটি প্রচলিত আছে তাহলো সুদুর অতীতে কোন এক সন্ন্যাসী নাকি পিটুলিগাছে চড়ে এখানে এসেছিলেন। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন ঐ সন্ন্যাসী। গভীর রাত্রে তিনি নাকি শ্মশানে যেতেন শব সাধনা করতে। কোন এক কুঠিয়াল সাহেব তাঁর কাছে আসতেন মাঝে মাঝেই। তবে তিনি ঐ রোণাল্ড সাহেব কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। ঐ সন্ন্যাসীর অবস্থান থেকেই ঐ গাছতলার নাম হয়ে যায় সন্ন্যাসীতলা।

অন্যমতে গাজনের সন্ন্যাসীদের অবস্থান থেকেই ঐ স্থানের নাম হয়েছে সন্ন্যাসীতলা।

৯। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :—

এই গ্রামের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ছড়িয়ে আছেন দেশের নানা প্রান্তে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন উপানন্দ গোস্বামী। ইনি কর্তাভজন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া শ্রীযুক্ত হীরক বিশ্বাস হলেন বিখ্যাত ডাক্তার। তপন জ্যোতি বিশ্বাস ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস ও ত্রিভুবন বিশ্বাস গ্রামের বাইরে বিভিন্ন অফিসের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই গ্রামেরই মেয়ে 'সোনামণি' মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে খুবই ভাল ফল করে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

১০। স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন :—

গ্রামটির বয়স বেশী না হলেও এই গ্রামের প্রাচীন প্রাসাদটির ধ্বংসাবশেষটি কিন্তু বেশ প্রাচীনই। বর্তমানে ঐ সৌধটি পার্থসারথী বিশ্বাসদের দখলে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে থামলেই পেয়ে যাবেন পার্থবাবুদের বাড়ী।

পার্থবাবুর পূর্বপুরুষ অঘোর বাবুই এই গ্রামের আদিবাসিন্দা। উনি এখানে আর. সি. সাহেবের বাংলো বা কুঠী বাড়ী এগারো একর জমি সমেত ক্রয় করে বসবাস শুরু করেন এবং কালক্রমে হয়ে ওঠেন গ্রামের জমিদার। রোণাল্ড সাহেবের বাড়ীর ওপরেই নতুন বাড়ী তুলে বর্তমানে বসবাস করছেন পার্থবাবুরা।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে প্রাচীন দিনের প্রাচীর, ইট বাঁধানো বারান্দা ও উঠোন এবং একটি প্রাচীন ইদারাও। এ বাড়ীর কাছেই আছে সাহেবের একটা বিশাল দীঘিও।

পার্থবাবু যদিও দাবী করেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ এই বাড়ী এবং জমিজমা সাহেবের কাছ থেকে কিনেছিলেন কিন্তু কোন দলিল বা প্রমাণ দেখাতে পারলেন না যদিও বললেন, পরে দেখাবেন।

১১। উপসংহার :—

রোণাল্ড সাহেব কুঠীয়াল অথবা মেহেরপুর সাব ডিভিসানের সার্ভেয়ার ছিলেন, এই প্রাচীন সৌধটা কুঠীবাড়ী অথবা সাহেব বাংলো ছিল সেই জটিল প্রশ্নে নাঢুকেও একথা সহজেই বলা যায় কে এই এলাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নিশ্চয়ই অতি মনোরম ছিল দুশো আড়াইশো বৎসর আগে নইলে রোনাল্ড সাহেব নিশ্চয়ই এখানে বসবাসের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করতেন না। যদিও আজ পশ্চিম প্রান্তে মরাগাঙের খাত ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তবে সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটি লোভনীয়ই বটে

বৃত্তিহুদায়

১। **ইতিহাস ও নামকরণ :—**

নদীয়া জেলায় বৃত্তিহুদা গ্রামের নাম শোনেনি এমন লোক খুব কমই আছে। 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র হিসাবে বৃত্তিহুদার নামটি নদীয়া তথা দেশে বিভিন্ন অংশে যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি হলেন বিখ্যাত গবেষক ডক্টর সুধীর কুমার চক্রবর্তী মহাশয়।

এই গ্রামটি কৃষ্ণনগর-করিমপুর সড়কের পশ্চিম দিকে জলঙ্গীর তীরে অবস্থিত। চাপড়া থানা র অন্তর্গত এই গ্রামে পৌঁছাতে হলে নামতে হবে লক্ষ্মীগাছায় তারপরে মাটির রাস্তা ধরে হোঁচট খেতে খেতে ধুলোয় ধূসর হয়ে হাইস্কুলের পাশ দিয়ে ঢুকতে হবে এই গ্রামে।

জলঙ্গীর তীরে বলা যায় জলঙ্গীর স্নেহে আশ্রিত এই প্রাচীন গ্রামটি। গ্রামটির মৌজা নম্বর ২৯ অতীতের তিনটি পাড়া বর্তমানে তিনটি গ্রাম রূপ নিয়ে সম্মিলিত ভাবে গড়ে উঠেছে 'বৃহত্তর' বৃত্তি হুদা গ্রাম। ঐ তিনটি গ্রাম হলো বৃত্তিহুদা, তালুকহুদা এবং দক্ষিন বৃত্তিহুদা।

নদীতীর বর্তী অঞ্চলেই একদা বিকশিত হয়েছিল মানব সভ্যতার। নদী জলে স্নান, চাষবাস, মাছ ধরা ও যোগাযোগের সুবিধা প্রচুর। পানীয় জল এবং রান্নার জলও মেলে নদীতে। বাতাসও স্নিগ্ধ। নদীয়া জেলার নদীতীরবর্তী অঞ্চলেও তাই পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মতোই গড়ে উঠেছিল বহু প্রাচীন জনপদ। বলা বাহুল্য জলঙ্গী তীরের এই বৃত্তিহুদা গ্রামটিও তেমনই এক প্রাচীন জনপদ।

এই গ্রামের নামকরণের কোন ইতিহাস না পাওয়া গেলেও অভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তাহলো জীবিকা বা ব্যবসার অধিকারের সীমাই হলো 'বৃত্তিহুদা'। তবে হুদা শব্দটি 'হুদ্দা' শব্দেরই বিবর্তিত রূপ যার অর্থ হলো অধিকার বা কার্যক্ষেত্রের সীমানা।

এই গ্রামে রয়েছে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির মানুষ। আছে মুসলমান, ঘোষ, কর্মকার, দাস, প্রামাণিক, গড়াই, অথবা সূত্রধর এবং ব্রাহ্মণও। এঁরা চাষবাস, দুধের ব্যবসা, তাঁতের কাজ, দা-কুড়ুল নির্মাণ, বাঁশের কাজ, ঘানির কাজ, কাঠের কাজ ও পূজা পার্বণের কাজে ব্যস্ত থাকেন নিজ নিজ বৃত্তে। সকলেই নিজ নিজ বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন যেমন তেমনিই তাদের অধিকারের সীমা সম্পর্কেও সচেতন।

২। **জনসংখ্যা ও আর্থিক চিত্র :—**

বৃত্তিহুদা গ্রামের জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশই হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় আট হাজারের কাছাকাছি। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা প্রায় দু হাজারের মতো। এর মধ্যে ঘোষেদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার এবং দাস বা মুচিদের সংখ্যা সাতশোর কাছাকাছি।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দের জনগণনায় এই গ্রামের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪৫০ জন বিগত ৩০ বছরে এই গ্রামের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ। এই হারে জনসংখ্যা বাড়লে ভবিষ্যতে চাষের জমিও পাওয়া যাবে না আর। চিত্রটি ভয়াবহ।

জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত এই গ্রামের আর্থিক চিত্র মোটেই উজ্জ্বল নয়। গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোকই বাস করছে খড়ের বা টালির বাড়ীতে এবং বেশীর ভাগ লোকই বাস করছে দারিদ্র্য সীমার নীচে। গ্রামটির রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ। সেই মধ্যযুগের অবস্থা।

৩। শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার হার :—

গ্রামে রয়েছে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষকের সংখ্যা পনেরো। পঠন পাঠনের মান তেমন উন্নত নয়। তবে বর্তমানে শিক্ষকদের হাজিরা অনেকাংশেই নিয়মিত হতে চলেছে বলে জানালেন গ্রামের অধিবাসীদের কয়েকজন।

এই গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলটি সম্প্রতি হাইস্কুলে উন্নীত হলেও শিক্ষক সংখ্যা খুবই কম। ফলে পঠন-পাঠনের কাজ চলছে গোঁজা মিল দিয়ে। শিক্ষার হার শতকরা চল্লিশ ভাগ মাত্র।

৪। পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদি :—

বৃত্তিহুদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং সরস্বতী ও দোলযাত্রায় হৈ হৈ পড়ে যায় তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও ঈদুরজোহা এবং মহরমের সময় রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়। এছাড়া গ্রামে প্রায়ই বসে মেহফিল এবং যাত্রার আসরও।

এছাড়া বৈশাখ মাসের বুদ্ধ পূর্ণিমায় এখানে সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ভক্তের ভীড় হয়। একদিনের একটি মেলাও বসে পাল বাড়ীতে ঐ দিন।

৫। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও খেলাধূলা :—

মাঝে মধ্যে ক্লাবের ছেলেরা রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী পালন করে থাকে। ঐ সময় আবৃত্তি এবং গানের প্রতিযোগিতাও হয় হাইস্কুলের মাঠে। তবে সাধারণ ভাবে গ্রামে গান বাজনার তেমন চর্চা নেই বললেই চলে।

এছাড়া হাইস্কুলের মাঠে নিয়মিত গ্রামের ছেলেরা ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে। প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। তবে সম্প্রতি ক্রিকেট খেলা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে নৈশালোকে রাত্রিতেও ক্রিকেট খেলা চলছে এখানে। গরীবের ঘোড়া রোগ আর বলে কাকে ? নিন্দুকেবা বলে ইলেকসানের আগে প্রায়শই নাকি নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে এমন সব নানা রোগের উপদ্রব বেড়ে যায় তবে ওদের কথায় কান না দেওয়ায় ভালো। প্রগতির রথকে তাই বলে তো আর থামিয়ে দেওয়া যায় না ?

৬। ব্রতানুষ্ঠান :—

গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েরা যেমন ইতুপূজো করে থাকে তেমনি মঙ্গলবার ব্রত এবং বিপত্তারিণী ব্রতও পালন করে। তাছাড়া ষষ্ঠী পূজাও করে থাকে।

আর সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তো ব্রত পার্বণ লেগেই আছে বলা যায়।

৭। লোক সংস্কৃতি :—

(ক) লোকগীতি :— লোক সংস্কৃতির চর্চা বলতে এই গ্রামে আগে বাউল এবং জারি গানের খুবই রমরমা ছিল। ভাটিয়ালি গানও গাইতো অনেকেই। দুচার জন নামকরা শিল্পীও ছিলেন গ্রামে। তবে বর্তমানে বছরে একবার গ্রামের স্কুলের মাঠে বাউল গানের আসর বসলেও গ্রামে কোন নামী বাউল নেই।

(খ) যাত্রানাটক :— বাইরে থেকে বছরে দু একবার যাত্রাদল এনে যাত্রানুষ্ঠান হলেও গ্রামে কোন যাত্রাদল নেই। নাট্য চর্চাও তেমন নেই।

(গ) ধর্মীয় লোকগীতি :— তবে ধর্মীয় লোকগীতির ক্ষেত্রে এই গ্রামের সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের কুবির গোঁসাই এর খ্যাতি আজ সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে। কুবির গোঁসাই

এই গ্রামের গর্ব। তাঁর রচিত ধর্মীয় লোকগীতির সংখ্যা হাজারেরো বেশী। গানগুলো শুধু তত্ত্বমূলকই নয় গভীর ভাব এবং ব্যঞ্জনাতেও সমৃদ্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার প্রতীক ধর্মীয়ও বটে। কুবীর গোঁসায়ের যে কটি গান আমরা সংগ্রহ করেছি পাল বাড়ী থেকে তার মধ্যে মাত্র দুটি এখানে তুলে ধরছি—

১। "মাঝিরে তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল।
ভগ্নতরী তুফান ভারী ছেঁচতে নাবি, ডহরায় জল
কাণায় কাণায় ছাপিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ে ঢল্।
হলো ডাঙায় সাঁতার অকূল পাথার
হাওয়ায় করছে টলমল।
শোন মাঝি মহাশয়, আমার সর্বদা ঐ ভয়
পাছে লোণা দহে খাবি খেয়ে অপমৃত্যু হয়।
হায় তার সপক্ষে কর রক্ষে মুখে দীনবন্ধু বলো।
জরাজীর্ণ তরীতাই বারি চারিদিকে চুঁয়াই আর সে মানায় না।
বন্ধ হয় না গাব দিলে তার গায়, তাতে ছিদ্র নয়টা, গলুই ফাঁটা
চর্ম কোটা ঢেকি কল।।
বিশ্বভাবের তরঙ্গ দেখে হয় আতঙ্ক আছে ছয়জন দাড়ি।
দেয় না পাড়ি। এন্নি কুসঙ্গ ভেবে কুবীর বলে, মরণকালে
চরণ তোমার প্রাপ্তি ফল।।

(কুবির গোঁসাই)

২। "গাঁজা খোর গাঁজার মর্ম বুঝে মান্য করে মারে
বাদশা উজির নেশার ঘোরে।
যখন গাঁজা খায় নবাবী ভয়পায়—দমে দম লাগায়
নেশায় ইস্তি কোন খোস্তা দেবে।
তালের আঁটি বানিয়ে খোলা বলে ব্রহ্মার কমণ্ডুল।
বলে কৃষ্ণের হাতে বাঁশি।
ডুমুরের ডাল লয়েছে করে; এক ছিলিম পুরে
চারইয়ারে লক্ষটাকার মজা মারে।
নেশাতে হয় বিদগ্ধ, বলে পেলাম ব্রহ্মপদ যেমন ধারা চতুষ্পদ।
কলুর ঘানি আছে ঘাড়ে, গাঁজার পাতা ভাসিয়ে জলে
ধুঁয়া কলের জাহাজ চলে।
বসে থাকে নোঙর ফেলে অকূল পাথার সমুদ্দরে
গোঁসাই চরণ-চাঁদে বলেন কুবির, ভবির কথায় ভুলিসনারে"।

(কুবির গোঁসাই)

৮। লোকতীর্থ বৃত্তিহুদা :—

'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ের গুরুপাট এই বৃত্তিহুদা গ্রামেই। বৃত্তিহুদার বিখ্যাত পালবাড়ী আজ এক লোকতীর্থে পরিণত হয়েছে। ভক্তগণ ছাড়াও পাপীতাপী-অন্ধ আতুর ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী হত্যে দেয় পালবাড়ীতে। মানসিক করে। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে হয়

মহোৎসব। নিত্য পূজাতো হয়ই তাছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার দীনদয়াল পালের নামে বিশেষ ভোগ রাগও নিবেদিত হয়। পালবাড়ীর ঠাকুর ঘরে রয়েছে গুরু চরণ চাঁদের খড়ম মালা এবং ত্রিশূল ও ছড়ি।

'সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হলেন মুলী চাঁদ পাল। তবে মুলীচাঁদের পুত্র চরণপালই এই সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে ছড়িয়ে দেন দেশের নানা দিকে এবং দোগাছিয়া থেকে সাধনার আসন স্থানান্তরিত করেন এই বৃত্তিহুদা গ্রামে। চরণপালের বংশধররা এখনো রয়েছেন এ গাঁয়ে।

চরণপালের শিষ্য কুবির গোঁসাই সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের প্রধান গীতিকার। এঁদের দুজনারই সমাধি আছে বৃত্তিহুদায়।

৯। স্থাপত্য নিদর্শন সমাধি ও মন্দির :—

(ক) মন্দির :— বৃত্তিহুদায় কুবির গোঁসাই এর সমাধির ওপরে নির্মিত হয়েছে একটি সুন্দর মন্দির। ঐ মন্দিরেই আছে কুবির গোঁসাই এর খাট, খড়ম ও মালা। এর পাশেই রয়েছে আর একটা ছোট্ট সমাধি মন্দির। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয় বিখ্যাত এই গীতিকারের। বর্তমানে কুবির ভিটার সেবাইত হলেন গোপাল দাস ও তাঁর বংশধরগণ।

(খ) ঠাকুর ঘর :— এছাড়া পাল বাড়ীর প্রাচীন ঠাকুর ঘরটিও মন্দির হিসাবেই সকলের কাছে মান্য। ঠাকুর ঘরে রয়েছে আসন, কাঠের সিন্দুক, গুরুচরণ পালের মালা, খড়ম, ছড়ি (ফকিরি দণ্ড), হুকা এবং মানতের বহু নাড়ু গোপাল মূর্তি। প্রতি বৃহস্পতি বারে বহু ভক্তের সমাগম হয় এখানে। আর বার্ষিক মাহোৎসব উপলক্ষ্যে তো হাজার হাজার ভক্ত জনের সমাগম হয়। বর্তমানে শিশিরপাল এই মন্দিরের প্রধান সেবাইত।

১০। লোক কাহিনী :—

(ক) কাঁঠাল চুরি :— বৃত্তিহুদার পাল বাড়ীর সদস্যদের কাছ থেকে একটি মজার কাহিনী সংগ্রহ করা গেল। প্রচলিত কাহিনীটি হলো আগে কেউ যদি পালবাড়ীর কাঁঠাল গাছের কাঁঠাল চুরি করতে এসে কাঁঠালে হাত দিত তবে তার হাত আটকে যেতো ঐ কাঁঠালের সাথে। যতক্ষণ না পাল বাড়ীর কেউ এসে 'ছাড় ছাড় ছেড়েদে।' বলতো ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কাঁঠাল চোরের নিস্তার ছিল না। সেই থেকে পাল বাড়ীর বাগানের কোন ফল চুরি করার দুঃসাহস দেখায় না কেউ।

বর্তমানে পালবাড়ীর নারকেল গাছ এবং পেঁপে গাছে বিস্তর নারকেল এবং লোভনীয় পেঁপে ঝুলে থাকলেও সেসব নিরাপদেই আছে। আর সুদৃশ্য নারকেল কুলগাছটার যা ফলন তাতে অনেকেরই লোভ জাগে। আমার গবেষণা সঙ্গী চঞ্চল, আরজু, সুমিত, কেয়া, কায়েম এবং শিল্পীরা গাছতলায় এগিয়ে গিয়েও বড় বড় কুলে হাত দিতে সাহস পেল না শেষ পর্য্যন্ত যদি সত্যিই হাত আটকে যায়! তবে পালবাড়ীর পাকা পেঁপের স্বাদে মুগ্ধ হয়েছিল কিন্তু সেদিন সবাই।

(খ) সাধন সঙ্গিনী :— বৃত্তিহুদা গ্রামে দ্বিতীয় যে লোককাহিনীটি বহুল প্রচারিত সেটি হলো কুবির গোঁসাই ও তাঁর সাধন সঙ্গিনীকে নিয়ে।

শোনা যায় কুবির গোঁসাই যখন এই বৃত্তিহুদায় সাধন ভজনে রত তখন পদ্মাপারের এক বিখ্যাত গায়িকা 'কৃষ্ণমোহিনী' নাকি ঘোষণা করেন যে ব্যক্তি তাঁকে তত্ত্বমুলক গানে

পরাস্ত করতে পারবেন তিনি তাঁর আনুগত্য মেনে নেবেন এবং আজীবন দাসী হয়ে থাকবেন তাঁর।

কুবির গোঁসাই এর গানের গলা ছিল খুবই সুন্দর এবং তিনি মুখে মুখে গানও রচনা করতে পারতেন। ঐ ঘোষণা শুনে কুবির হাজির হলেন পদ্মাপারে। উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। গুণীমানী ব্যক্তিদের সম্মুখে শুরু হলো তাত্বিক গানের লড়াই। চললো একটানা চারদিন চার রাত ধরে সুকঠিন লড়াই। শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হলেন কৃষ্ণমোহিনী। গুরু বলে মেনে নিলেন কুবির গোঁসাইকে। প্রতিশ্রুতি রাখতে চলে এলেন কুবিরের হাত ধরে এই বৃত্তিহুদায়।

শোনা যায় কুবির গোঁসাই এর সহস্রাধিক গানের মূল প্রেরণাদাত্রী ছিলেন এই কৃষ্ণমোহিনী। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এঁর তিরোধান হয়। কুবির গোঁসাই এর সমাধি মন্দিরের পাশেই রয়েছে কৃষ্ণ মোহিনী এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী ভগবতীর সমাধি।

গেদে

১। পরিচিতি ও প্রাক ইতিহাস :—

নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম হলো এই গেদে। বর্তমান বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের শেষ রেলস্টেশন এই গেদে। নিয়মিত চলে শিয়ালদহ-গেদে শাখার রেলগাড়ী। মাজদিয়া ছাড়িয়ে বাণপুরের পরেই এই রেলস্টেশন। সত্যি কথা বলতে কি দেশ বিভাগের পূর্বে এই প্রাচীন জনপদটি প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু দেশ ভাগের পরেই এই সীমান্ত গ্রামটি ধীরে ধীরে প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আগে গেদে আসতে হলে বাণপুর স্টেশনে নেমে আসতে হতো। রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে হতো ব্রীজ পেরিয়ে। তবে এখন নতুন স্টেশন হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে অনেক।

শোনা যায় এই গেদের পূর্বনাম ছিল জানকী নগর। এর পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মাথাভাঙা নদী। শিকারপুরের কাছে পদ্মা নদী থেকে বরে হয়ে মাথাভাঙা নদী বেশ কিছু দূর বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার ভারতের মধ্যে প্রবেশ করেছে এই গেদে দিয়েই। মাথাভাঙা নদীর কল্যাণে গেদে এবং তার পার্শ্ববর্তী গোবিন্দপুর ও অন্যান্য গ্রামের জমি বেশ উর্বর এবং শস্য শ্যামল।

শোনা যায় এককালে বড় বড় বাণিজ্য তরী আসতো এই মাথা ভাঙা দিয়ে। যাতায়াত করতো বহু বজরা পানসীও। প্রাচীন জানকীনগর, গোবিন্দনগর এবং হ্যরিশনগরে একসময় ছোট খাটো বাণিজ্য কেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল। বৃটীশ যুগে রেল স্টেশনের দৌলতে মাজদিয়া-দর্শনা প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য ঐ স্থান গুলোর যতো উন্নতি ঘটতে থাকে ততই জানকীনগর ও গোবিন্দনগরের অবস্থা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

তবে এককালের সমৃদ্ধ গ্রাম এই জানকীনগর কবে থেকে যে গেদে নামে পরিচিত হতে শুরু করলো সে কাহিনী বলতে পারেন না এই গ্রামের অধিবাসীরা।

২। সরকারী পরিষেবা :—

(ক) চেকপোস্ট :— বর্তমানে গেদে স্টেশনের কাছাকাছি অঞ্চল রূপ নিয়েছে গঞ্জের। এই অংশে রয়েছে সদা জাগ্রত চেকপোস্ট। ব্যস্ততা লেগেই আছে এই চেকপোস্টে। কিছু দূর গেলে ওপারে বিখ্যাত দর্শনা স্টেশন। একদা চিনির কলের জন্য যে দর্শনার খ্যাতি ছিল অখণ্ড বাংলায়।

(খ) বি. এস. ক্যাম্প :— রয়েছে সীমান্ত প্রহরার দায় কাঁধে নিয়ে সীমান্ত রক্ষীর দল।

(গ) কেন্দ্রীয় কৃষি সংরক্ষণ কেন্দ্র :— ভারত সরকারের কৃষি সংরক্ষণ কেন্দ্রটিও গৌরব বাড়িয়েছে এই গেদে গ্রামের।

(ঘ) পোস্টাফিস :— গ্রামে আছে পোস্টাফিস।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার :—

গ্রামে রয়েছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি জুনিয়র হাইস্কুল। তবে শিক্ষার হার আশানুরূপ নয়। গ্রামের শতকরা মাত্র পঞ্চান্নজন সাক্ষর। তবে নবীন প্রজন্ম একটু সজাগ হলেই এই হার বাড়ার খুবই সম্ভাবনা আছে ।

৪। আর্থ-সামাজিক চিত্র :—

গ্রামটি মূলত কৃষিপ্রধান গ্রাম হলেও ব্যবসা বাণিজ্য এবং চাকুরীতেও নিযুক্ত আছে বহু লোক। বেশ কিছু অবস্থাপন্ন লোকের বাস এই গ্রামে। পাকাবাড়ীর সংখ্যাও প্রচুর। সার্বিকভাবে গ্রামবাসীদের অবস্থা বেশ উন্নতই বলা যায়। গ্রামের রাস্তাঘাটও অন্যান্য অনেক গ্রামের চাইতে বেশ ভালই বলতে হবে।

আগে এই গ্রামের চাষীরা প্রচুর আখের চাষ করতেন কিন্তু বর্তমানে সেই চাষ কমেছে। দর্শনার চিনির মিলটা বর্তমানে অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ায় এই আখের চাষ কমার মূল কারণ। সুবল বিশ্বাস বা ছিদাম বিশ্বাসরা সেই কথাই জানালেন বর্তমান লেখককে।

৫। পূজা-পার্বণ-উৎসব :—

গ্রামে দুটি দুর্গা পূজা ও চারটি কালীপূজা হলেও লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতী পূজা হয় অনেকগুলি।

এছাড়া শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন হয় মনসা পূজা। আগে ঝাপান হতো এবং বিষহরির পালা গান হলেও বর্তমানে হয় না।

এছাড়া চৈত্র শেষে গাজনের উৎসবে যে সাড়া পড়ে যেতো আগে সেই রকমটা আর দেখা যায় না বর্তমানে।

তবে জন্মাষ্টমীর উৎসব হয় বেশ ঘটা করেই। ঐ উপলক্ষ্যে কীর্তনাদিও হয়।

এই গ্রামে নবান্নের উৎসবে ভাঁটা পড়লেও পৌষ পার্বণের উৎসবে কিন্তু ঘরে ঘরে বসে যায় আনন্দের হাট। উঠোনে আলপনা দেওয়া থেকে নানা ধরণের পিঠেপুলির আয়োজন হয় ঘরে ঘরে।

৬। সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপ :—

এই গ্রামের ক্লাবের ছেলেমেয়েরা বছরের বিভিন্ন সময়ে নানাধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। ছবি আঁকা, ক্যুইজ, আবৃত্তি ও গানের প্রতিযোগিতা জমে ওঠে বেশ ভালভাবেই। যাত্রানুষ্ঠান হয় মাঝে মাঝে তবে কলকাতার নামীদলই সেই যাত্রা করে থাকে।

৭। লোক সংস্কৃতি :—

(ক) লোকগীতি :— এই গ্রামটি লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যে একদা খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বাউল গানের সঙ্গে ভাটিয়ালি গানের নিত্য চর্চা হতো এই গ্রামে অতীতে। বর্তমানে কয়েকজন বাউল এবং দেহতত্ব মূলক গান গাইলেও নামী শিল্পী তেমন নেই বললেই চলে।

(খ) লোকশ্রুতি ও লোককথা :— মাথাভাঙা নদী নিয়ে আগে প্রচলিত ছিল না লোকশ্রুতির কাহিনী। কিভাবে এই নদী বয়েছিল এই গ্রামের পাশ দিয়ে সেসব নিয়েও ছিল নানা মজার মজার কাহিনী। কোথায যে হারিয়ে গেল সেসব ?

(গ) রূপকথা :— এ গাঁয়ের পুষ্পবালারা বলতেন কতো সব রূপকথার গল্প। ময়ূর পঙ্খীতে চলে যেতো রাজকন্যারা। বন্দী রাজপুত্রকে কাপালিক বলি দেবার জন্য আটকে রাখতো ঘরে। নিষেধ করতো উত্তর দ্বারে যেতে। ঝিনুকের মধ্যে জন্ম নিতো মুক্তার মতো ঝিনুক কন্যা। কড়ির পাহাড় হাড়ের পাহাড়—হিরণ কুমার—ঝিনুক মালার কতোসব মধুর গল্প—এককালে শুনেছে এ গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা তাদের সঙ্গে শুনেছি আমিও। কিন্তু হায় সেসব আজ অতীতের গল্প কথা মাত্র। সেই পুষ্পবালারাও নেই। নেই ঝিনুকমালাও।

৮। ব্রত পার্বনাদি :—

তবে গ্রামের মেয়েরা এখনো ইতু পূজা, ষষ্ঠী পূজা করে। গোকুল ষষ্ঠী, চাপড়া ষষ্ঠী এবং মাঘী ব্রতও পালন করে। তবে পুণ্যি পুকুর বা ব্যাঙের বিয়ে আর দেয় না মেয়েরা। আরো অনেক ব্রতও বন্ধ হয়ে গেছে।

ভীমপুর

১। পরিচিতি :—

কৃষ্ণনগর থেকে যে পাকা বাস্তাটা চলে গেছে মাজদিয়ার দিকে সেই রাস্তায় আসান নগরের পরেই এই ভীমপুর গ্রাম। এরপরেই বিখ্যাত ডাকাত গাড়ীর মাঠ এবং ঐতিহাসিক চৌগাছা গ্রাম।

অবশ্য ভীমপুরকে আজ আর গ্রাম বলা যায় না। বর্তমানে এটি এই অঞ্চলের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। রাস্তার দুপাশে প্রচুর দোকান হয়েছে। ভিতরের দিকেও বড় বড় গুদাম ঘর, দোকান, ব্যাঙ্ক, অফিস, হাট-বাজার, স্কুল-গম্ গম্ করছে আজ ব্যস্ত ভীমপুর। বহু ধনী ব্যবসায়ী আজ ভীমপুরকে গ্রাম থেকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছেন গঞ্জের দিকে। এই অঞ্চলের পাট-ধান-গুড় এবং ডালের মূল কেনাবেচার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভীমপুর। কুড়ি বছর আগের ভীমপুরের সঙ্গে বর্তমান ভীমপুরের অকাশপাতাল তফাৎ।

২। আর্থ সামাজিক চিত্র :—

বাণিজ্যের দৌলতে ভীমপুর আজ এক সমৃদ্ধ গঞ্জে রূপান্তরিত। তবে এখনো এ গ্রামের পাঁচ হাজার লোকের বেশীর ভাগই যুক্ত কৃষি কাজের সঙ্গে। উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং সারের দৌলতে কৃষিতেও প্রভূত উন্নতি হয়েছে ভীমপুর ও তার চারপাশের বিভিন্ন গ্রামের। এ গ্রামের চাষীদের অবস্থাও বেশ ভালই।

এখানে অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা একাধারে চাষী আবার ব্যবসায়ীও ফলে তাদের উন্নতি আটকায় কে ?

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার :—

বর্তমানে একটি হাইস্কুল সহ গ্রামে রয়েছে তিনটে প্রাইমারী স্কুল, একটি অঙ্গনওয়ারীও দুটি কেজি স্কুল। মেয়েদের জন্য একটি পৃথক হাইস্কুলের প্রচেষ্টাও চলছে।

ভীমপুরের অধিবাসীরা কিন্তু ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই সচেতন। চলছে বেশ কয়েকটা কোচিং সেন্টারও। শিক্ষার হার প্রায় শতকরা ৮০র কাছা কাছি।

৪। পূজা ও উৎসব :—

গ্রামে বর্তমানে চারটি দুর্গা পূজা হয়ে থাকে। কালী পূজা ছটি এবং সরস্বতী পূজা হয় অনেকগুলো।

এছাড়া লক্ষ্মী পূজোও হয়ে থাকে বেশ ঘটা করে দুর্গা পূজার পরেই।

উৎসবের মধ্যে দোল পূর্ণিমার উৎসবই সব চাইতে আকর্ষণীয় হয় এখানে। ঐ দিন নাম সংকীর্তন এবং পালাকীর্তনও হয়। হৈ হৈ চলে সারা দিন ধরে।

১লা বৈশাখে হয় দোকানে দোকানে শুভ হালখাতা। গণেশ পুজা হয় দোকানে -আড়তে। মাইকের গর্জনে কানে তালা ধরে যায়। ফুল আম্র পল্লব দিয়ে সাজানো হয় দোকান। ভীড় লেগে যায় হাটে বাজারে—দোকানে। মিষ্টি মিঠাই এর মহোৎসব লেগে যায়। উৎসবের সাজে সেজে ওঠে ভীমপুর শুভ ১লা বৈশাখে।

৫। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ :—

ভীমপুরে যে দুটি ক্লাব আছে সেই ক্লাবের সদস্যরা বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা বিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও সুকান্ত জয়ন্তী রীতিমতো হৈ হৈ করেই অনুষ্ঠিত হয় নানা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

ছোটদের ছবি আঁকা, আবৃত্তি, নাচ, গান, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও ক্যুইজের তীব্র প্রতিযোগিতা চলে ঐ সব অনুষ্ঠানে।

এছাড়া ক্লাবের ছেলেরা বছরে দু তিনবার নাটকও মঞ্চস্থ করে।

সম্প্রতি একটি সাহিত্য পত্রিকাও বের হচ্ছে ভীমপুর থেকে। সেখানে কবি তার সংখ্যাই অবশ্য বেশী। তবে সাহিত্য সাধনার ব্যাপারটা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক।

৬। লোক সংস্কৃতি :—

(ক) লোক গীতি :— এককালে ভীমপুরে লোকসংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ছিল। তবে মূলতঃ লোকগীতির জন্যই নাম ছড়িয়ে ছিল এই ভীমপুরের। এককালে ভাটিয়ালি, গান, রাখালী গান এবং বাউল ও দেহতত্ত্বমূলক গানের খুবই রমরমা ছিল এই ভীমপুর— চৌগাছা, শাকদহ, আসাননগর ও আশে পাশের গাঁয়ে। বর্তমানে শুধুমাত্র বাউল এবং দেহতত্ত্বমূলক গানেরই প্রচলন আছে এই গ্রামে। তবে খুব নামকরা শিল্পী তেমন কেউ নেই। অবশ্য কীর্তনের দলও আছে এই ভীমপুরে।

(খ) লালন মেলা :— বর্তমানে প্রতিবছর ভীমপুর এবং আসান নগরের সঙ্গমস্থলে মাঠের ওপরে তিন দিন ব্যাপী যে বাউলের মেলা হয় সেই মেলার খ্যাতি রটেছে সারা দেশে। ঐ মেলায় নদীয়া জেলা ছাড়াও ওপার বাংলার থেকেও বহু নামী শিল্পীরা আসেন। লালন মঞ্চ, আজমশাহ মঞ্চ ও অন্যান্য মঞ্চে বিভিন বাউল শিল্পীরা তাদের কণ্ঠ মাধুর্য্যে মোহিত করে রাখেন অগণিত দর্শক শ্রোতাদের।

বিশাল এলাকা জুড়ে আয়োজন হয় এই মেলার। মেলা বসে যায় তিন দিনের জন্য। রীতিমতো সাড়া পড়ে যায় আশে পাশের গ্রামে। জেলার নানাপ্রান্ত ছাড়াও কলকাতা থেকেও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন ঐ মেলায় যোগ দিতে। আসেন বেতার এবং টি.ভির কর্মকর্তারাও।

যতোদিন যাচ্ছে ততই যেন কদর বাড়ছে এই লালন মেলার। ভীমপুর এবং আসাননগরের বড় গর্বের মেলা এই লালান মেলা।

(গ) লোক যাত্রা :— এই গ্রামে আগে গুণাই যাত্রা কেষ্ট যাত্রা এবং রং পাঁচালির প্রচলন থাকলেও আজ টি.ভি. আর ভি. ডি. ও হলের দৌরাত্মে সেসব হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীতের গল্পমাত্র।

তবে 'নাট্য কোম্পানী'র মতো বড় বড় যাত্রাদলের অনুষ্ঠান বছরে এখনো হয় এক বার করে।

(ঘ) অন্ধ সাধু :— ভীমপুর বাজারটা যখন খুব ছোট ছিল সেই সময়ে বাজারের মিষ্টির দোকানের সম্মুখে পীচ রাস্তার ধারে এক অন্ধ সাধু এসে বসেছিলেন খেজুর গাছের গোড়ায়।

মাটির নীচে গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যেই থাকতেন তিনি। সারা দিন বাইরে আসতেন না। কিন্তু রাত্রি হলেই কোথায় যেন চলে যেতেন। গভীর রাতে নাকি শোনা যেত খড়মের শব্দ। ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে ঐ সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা। ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে তাঁর। বহু লোকের বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

(ঙ) লোকশ্রুতি :— এই অন্ধসাধুকে নিয়ে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতির কাহিনী। লোকে বলে তিনি কামরূপ কামাখ্যা থেকে শূণ্য পথে হেঁটে এসেছিলেন এই ভীমপুরে এবং রাত্রি গভীর হলে তিনি শূণ্য পথে হেঁটে চলে যেতেন কোন শ্মশানে নাকি সাধনা করতে।

শোনা যায় বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন তিনি। যাকে যা বলতেন ফলে যেতো। তিনি নাকি বলেছিলেন 'ভীমপুর একদিন শহর হবে।' তখন সেকথা কেউ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আজ শহরই হতে চলেছে ভীমপুর।

ঐ সাধুর আশীর্বাদেই নাকি ভীমপুরের এত বাড় বাড়ন্ত আজ। তাঁর তিরোধানের পরে তাই ভীমপুর বাসীবা তাঁর আসনের ওপরে মনিদর তৈরী করে দিয়েছেন। ঐ মন্দিরটি আজ এক পবিত্র ধর্মস্থান হিসাবেই গণ্য হয়েছে সকলের কাছে। নিত্য সেখানে ধূপ দেওয়া হয়। বাতিও দেওয়া হয়। মাঝে মাঝেই ধর্মীয় গান, আলোচনা এবং কীর্তনাদিও হয়ে থাকে ঐ পবিত্র দেবালয়ে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে এখনো নাকি পীচ রাস্তায় খট, খট খড়মের শব্দ শোনা যায়। কে যেন হেঁটে যায় শ্মশানের দিকে। লোক বলে সে ঐ অন্ধ সাধুই।

৭। ব্রত পার্বণ :—

দ্রুত গঞ্জ হয়ে চললেই ভীমপুরের মেয়েরা নানা ব্রতাদি পালন করে থাকেন আজো। ইতুপূজো, ষষ্ঠী পূজো, চাপড়া ষষ্ঠী, শিবরাত্রির ব্রত, পালিত হয় এখনো যথাযোগ্য ভক্তি ও নিষ্ঠাসহকারে। তবে আগে আরো যে সব ব্রতাদি মেয়েরা পালন করতেন সেসব ধীরে বন্ধ হয়ে গেছে। বিপদত্তারিণী, জয়মঙ্গলবার, পুণ্যিপুকুর ইত্যাদি আর হয় না এখন।

৮। উপসংহার :—

গ্রামের রাস্তা ঘাট চলন সই। বাস রাস্তার ওপরেই গ্রামটা হওয়ার ফলে সদর শহর কৃষ্ণনগর বা কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভালই।

এই গ্রামের বহু কৃতি সন্তান আজ ছড়িয়ে আছে নানা প্রান্তে।

এই গ্রামে রাজনৈতিক দলাদলি থাকলেও বা নেতৃত্বের লড়াই থাকলেও মোটের ওপর শান্তিতেই বস বাস করছেন ভীমপুর বাসীরা।

নতিপোতা নামে গ্রাম

১। প্রাক ইতিহাস :—

নদীয়া জেলার নতিপোতা গ্রামটি বেশ প্রাচীন গ্রাম। কতো বছর আগে যে এই গ্রামটি গড়ে উঠেছে তা বলা কঠিন। তবে জলঙ্গীর তীরবর্তী এই গ্রামটি নানাবিধ লোক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি মাহিষ্য প্রধান গ্রাম।

একদা এই গ্রামে স্থাপিত হয়েছি বিখ্যাত নীলকুঠী। নীলকর সাহেবরা গ্রামের চাষীদের নীলবুনতে বাধ্য করতো এবং নানাভাবে শোষণ চালাতো এককালে। ঐ নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষের ওপরেই গড়ে উঠেছে ১৯২৮ সালে গ্রামের প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি।

নীলবিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে অন্যান্য অনেক নীলকুঠীর সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় নতিপোতার এই নীলকুঠীটিও। নীলকুঠীর সমস্ত সম্পত্তি এর পর নীলামে কিনে নেন স্বরূপগঞ্জের নফর পাল চৌধুরী। নফর পালের পরে এই গ্রামের জমিদারী পান হিরণ্ময়ী দাসীরা।

নীলকর সাহেবদের কাছারীর নায়েবের বংশধররা এখনো বাস করছেন এই গ্রামে। এদেরই একজন হলেন শ্রীনিতাই চন্দ্র ঘোষ।

নীলকর সাহেবরা যেসব পাল্কিবাহক বা লাঠিয়ালদের এখানে এনেছিলেন সেই সব সর্দারি ও বাগ্দীদের বংশধররা এখনো বাস করছেন এই গ্রামে।

২। নামকরণ :—

এই গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে যে দুটি মত প্রচলিত আছে তার একটি হলো কোন এক সময় হয়তো কোন ব্যক্তি এই গ্রামের কোন স্থানে মামলা-মোকদ্দমার কাগজপত্র (নথি) সূঁতোয় গেঁথে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। সেই নথিপোঁতার থেকেই গ্রামের নাম হয়েছিল নথিপোঁতা। পরে লোক মুখে বিবর্তিত হয়ে হয়েছে বর্তমানে নতিপোতা। নথিপোঁতা—নতিপোতা।

দ্বিতীয় মতানুসারে জানা যায় কোন এককালে নৌকা বোঝাই নথিপত্র এ গ্রামের জলঙ্গীর বুকে পুঁতে যায় বা হেলে পড়ে চড়ায় আটকে গিয়ে সেই থেকেই এ গ্রামের নাম হয় নথিপোঁতা। নথি বোঝাই পোত বা নৌকা হেলে পড়া বা নদীর চরে পুঁতে যাওয়ার সূত্রেই এ গ্রামের নাম হয়েছিল নথিপোত। নথিপোতা হয়েছে পরে। নথিপোত—নথিপোতা এবং নতিপোতা। এই দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করলে ঘটনাটি ইংরেজ আমলেই ঘটেছিল মনে হয়। তাহলে এই গ্রামটির বয়স দাঁড়ায় দুশো বছরের মতো।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার :—

গ্রামে রয়েছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। (১) নতিপোতা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও (২) হরিজন পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রথমটিতে আছে চারজন শিক্ষক এবং দ্বিতীয়টিতে তিনজন শিক্ষক।

প্রথমটির প্রধান শিক্ষক পরিমল বাবু জানালেন প্রায় তিনশোর কাছাকাছি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দিতে হয় তাঁদের। ফলে নানা কারণে আধুনিক পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োগ করার সুযোগ পাননা তাঁরা।

দ্বিতীয় স্কুলটিতে আড়াইশোর বেশী ছাত্রছাত্রীকে সামলাতে হয় মাত্র তিনজন শিক্ষককে। বিদ্যালয়ের ঘর বাড়ীও ভাল নয়। বেশীর ভাগই হরিজন পল্লীর ছাত্র ছাত্রী। স্কুলে নিয়মিত সবাই আসেও না।

দুটি বিদ্যালয়েরই শিক্ষার মান আশানুরূপ নয়। আরো উন্নত করা দরকার হাজিরা ও শিক্ষা পদ্ধতির।

গ্রামে হাইস্কুল নেই। ছেলেমেয়েরা ছোটনলদা হাইস্কুলে যায় পড়তে। দুচার জন আবার তেহট্টতেও যায়।

গ্রামে শিক্ষার হারও খুব ভাল নয়। শতকরা চল্লিশ জনের মতো সাক্ষর বলে জানালেন গ্রামের বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীবাদল মুন্সী মহাশয়।

৪। জনসংখ্যা ও আর্থিক চিত্র :—

তেহট্ট থানার অধীন এই গ্রামটিতে বর্তমানে বসবাস করেন প্রায় একহাজারের মতো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তবে ছোট খাটো ব্যবসা এবং চাকুরীও করেন কয়েকজন। সামগ্রিক ভাবে জলঙ্গীর স্নেহচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠা এই গ্রামের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই। অর্ধেকেরও বেশী বাড়ী পাকা। মাঠে মাঠে সবুজ শস্যের হিল্লোল।

৫। পূজা পার্বণ ও উৎসবাদি :—

গ্রামের মাঝখানে অশ্বথ তলায় নতুন পূজামণ্ডপ তৈরী হয়েছে সম্প্রতি। বেশ বড় পাকা পূজা মণ্ডপ। এখানেই ধুমধাম করে দুর্গা পূজা হয়। গ্রামে দুটি কালীপূজাও হয় কার্তিকমাসে। আর সরস্বতী পূজাতো হয় ঘরে ঘরে।

তবে জমটি উৎসব হয় কার্তিকপূজায়। হৈ হৈ রৈ রৈ চলে দুদিন ধরে। প্রচুর বাজী ফাটানো হয় ঐ সময়। সং বের হয়। একেবারে নিখুঁত সংসাজে অনেকেই। প্রতিযোগিতাও হয় সং এর। শঙ্কর মণ্ডল সং সেজে ইতিমধ্যেই খ্যাতি কুড়িয়েছেন বহুজনের।

কার্তিক পূজার উৎসবটি প্রায় আজ চলে গেছে লোক উৎসবের পর্য্যায়ে। এই উপলক্ষ্যে ছোট আকারের একটি মেলাও বসে। গ্রামে মনসা পূজাও হয়।

আগে জলঙ্গীর তীরে গ্রামবাসীরা মিলিত হতেন নবান্নের উৎসবে। বর্তমানে পাড়ায় পাড়ায় চড়ুইভাতি হলেও নবান্নের সার্বজনীন উৎসব আর হয় না।

তবে পৌষ পার্বণে সাড়া পড়ে যায় ঘরে ঘরে। পিঠে পুলির গন্ধে মধুর হয় গ্রামের বাতাস। এ গ্রামের মালসা পিঠে আর পাটি সাবডার খ্যাতি ছড়িয়ে আছে গোটা তেহট্ট মহকুমায়।

৬। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ :—

নতিপোতার ক্লাবের ছেলে মেয়েরা বছরের বিভিন্ন সময়ে নানাধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। ক্যুইজ এবং আবৃত্তির প্রতিযোগিতা জমে বেশ ভালই। নাটকও মঞ্চস্থ করে ক্লাবের ছেলে মেয়েরা। এছাড়া রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল, সুকান্ত এবং নেতাজীর জন্মোৎসবও পালিত হয় বেশ ঘটা করেই।

তবে নাচ, গান কিংবা খেলাধূলার চর্চা তেমন নেই গ্রামে।

৭। লোক সংস্কৃতি :—

লোক সংস্কৃতির দিক দিয়ে গ্রামটির ঐতিহ্য সত্যিই বড় উজ্জ্বল।

(ক) যাত্রা :— অতীতে গ্রামেই পালাকার ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে তাঁরা পালা লিখতেন এবং গ্রামবাসীরাই ঐ সব পালাগান শোনাতেন যথাযথ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে তেমন পালাকার না থাকলেও গ্রামের যাত্রা-ঐতিহ্য কিন্তু অটুট আছে। মাঝে মাঝেই বিভিন্ন পূজা পার্বণে যাত্রা হয়ে থাকে। কিছুদিন আগেই হয়েছে, দুটি যাত্রা। একটি সাত টাকার সন্তান অন্যটি 'মসনদ কার' ? এই দুই নাটকে যথাক্রমে গণপতি ও নাসিরুদ্দীনের ভূমিকায় অভিনয় করে 'বাদলমুন্সী' মহাশয় বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছেন।

(খ) বোলান গান :— প্রতিবছর গাজন উপলক্ষ্যে এই গ্রামেও জমে ওঠে বোলান গানের আসর। গ্রামে বোলানের নিজস্ব দলও আছে। গ্রামে বোলানের পালাকারও আছে। গ্রামবাসীরা খুবই আগ্রহের সঙ্গে শোনে ঐ বোলান গান।

(গ) বাউল ও ধর্মীয় গান :— এই গ্রামে বছরে দুবার বাউল গানের আসর বসে। তবে গ্রামে নামকরা শিল্পী তেমন নেই। তবে কীর্তন ও ধর্মীয় গানের আসরে ভীড় জমে দারুন। কীর্তনের প্রতি এই ঝোঁক যেন বেড়েই চলেছে গ্রামের বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের। এই গ্রামের কাশীনাথ পাল হলেন বিখ্যাত কীর্তনিয়া।

(ঘ) ঝাপান :— প্রতি বছর মনসা পূজার দিন অনুষ্ঠিত হয় মনসার গান ও পালা। ঐ সময় বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসে প্রচুর ওঝার দল। জমে ওঠে মন্ত্রের প্রতিযোগিতা। বিচার হয় শ্রেষ্ঠ গুণীন বা ওঝা কে ? এই গানে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের ওঝাই যোগ দিয়ে থাকেন।

এখানে ঝাপান গানের দুই ধর্মের দুই গুণীনের দুটি গান বা মন্ত্র তুলে ধরা হলো।

১। এই মন্ত্র বা গানটি শোনালেন এই গ্রামেরই আয়ুব দফাদার মহাশয়—

(১) "এসো এসো মা মনসা বসো সিংহাসনে
এই মিনতি করি মাগো যদি বিষ নামে।
পদে দেবো ফুল তুলসী আরো দেবো জবা।
এই রোগী ভাল হলে তোমায় দেবো পূজা।

পূজা পাবার সাধ থাকে তো রোগী ভাল কর।
এই রোগী সারলে পরে তোমার পূজা ঘরে ঘরে দেব।
ধূপ দেব, ধুনো দেব, আরো দেব বলি।
এই মিনতি করিপদে শুন মাগো বলি।"

(আয়ুব দফাদার)

২। দ্বিতীয় মন্ত্র বা গানটি শোনালেন শ্রী সাধন মণ্ডল মহাশয়—

(২) "এসো এসো তুমি মাগো স্বর্ণ সিংহাসনে
এই রোগী ভাল করে ত্বরাও দীন জনে।
কি বলিব কি করিব, কিছুই নাহি জানি।
তোমারি চরণে পড়ে আছি গো জননী।
এ হেন সোনার দেহ্ বিষে হলো কালি।
তোমারি নাগেতে মাগো বিষ দিল ঢালি।
ধুপ দেব, ধূনো দেব, আর দেব পানি।
নামাও নামাও বিষ—তোমারেই মানি।"

(ঙ) লোক উৎসব :— (গাজন)

প্রতি বছর এখানে তুমুল উৎসাহ সহকারে পালিত হয় গাজন উৎসব। সন্ন্যাসীরা 'দেবের দেব শিব' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মোথিত করে বাড়ী বাড়ী ঘোরে পাট নিয়ে। চৈত্রের শেষদিনে হয় গাজন। সন্ন্যাসীরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, কপালে শূল বিদ্ধ করে নানা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করে থাকে। তবে এখন আর চড়ক হয় না। ছোট খাটো একটা মেলাও বসে ঐ উপলক্ষ্যে।

(ঙ) লোক সাহিত্য :—

এ গ্রামের বৃদ্ধা ও বৃদ্ধদের মুখে মুখে ফেরে আজো নানা ধরণের ছড়া ও লোক কথা। প্রবাদ প্রবচন এবং ধাঁধাঁও আছে। এখানে আমাদের সংগৃহীত দুটি ছড়ার উল্লেখ করা হলো—

১। "নীলের ক্ষেতেই বুনবো যে ধান
ধানেই বাঁচা মরা।
নীল সাহেবের হুকুম কোন
শুনবোনা আর মোরা।
যায় যাক প্রাণ নড়বো নাকো
রাখবো মোদের মান।
সাগর পারের সাহেব তুমি
নীল সাগরেই যান।

(সংগ্রাহিকা শিল্পী ও শেফালী)

২। আয় ঘুম ঘুম খোকার চোখে
আয়রে ও ঘুম সুখে।
ধান ফুরালে কলাই দেব
ভয় করোনা মোটে।
ঘুমের মাসী ঘুম দিয়ে যাও
খোকার রাঙা ঠোঁটে।

(সংগ্রাহক চঞ্চল ও দেবু)

ছড়া দুটির একটি নীলচাষের বেদনাময় দিন গুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়টি ঘুমপাড়ানি ছড়া। খোকার রাঙা ঠোঁটে ঘুম দেবার অর্থ বোঝা যায় না।

(ছ) লোকশ্রুতি :—

গ্রামে ছড়িয়ে আছে নানা লোকশ্রুতি। একটি লোকশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে একদা এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যেতো জলঙ্গী। ঐ জলঙ্গীতে নাকি প্রায়ই 'দ'এ নৌকা আটকে যেতো প্রতিশ্রুতি পালন না করার ফলে। তবে মাকালীর পূজো দিলে নৌকা মুক্তি পেতো সহজেই।

(জ) লোকদেবী ও লোককথা :—

এই গ্রামের লোক দেবী হলেন মাঠ কালী। দেবীর বাৎসরিক পূজা হয় মাঘ মাসের প্রথম মঙ্গলবারে। এই পূজার থানটি হলো বওলা ও বাবলাগাছের গোড়ায়। নদীর তীরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে স্থানটি বড়ই নির্জন। গ্রাম থেকে চাল ডাল তুলে খিচুড়ী ভোগ হয়। পায়েসের ভোগও দেওয়া হয়। বহু লোক যোগ দেয় ঐ মহোৎসবে। ঐ উপলক্ষ্যে হরিনামও হয়।

নতিপোতার শঙ্কর মণ্ডলই মাঠকালীর প্রধান উপাসক। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তিনি মায়ের থানে ফুল জল ও বাতাসা দেন। থানটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও রাখেন।

মায়ের অসীম কৃপা তাঁর কৃপায় বহু দূরারোগ্য ব্যাধিও সেরে যায়। মায়ের কৃপায় শঙ্কর মণ্ডল হেঁট মুন্ডে বওলা গাছে ঝুলে থেকে নিজের খোঁড়া পা সারাতে সক্ষম হয়েছেন। সেই থেকেই তিনি মাঠকালীর প্রধান ভক্ত হয়ে আছেন এই গ্রামে।

মাকালীর থানের ঐ গাছ বা গাছের ডাল কেউ কাটার সাহস করে না। কাটতে গেলেই নানাবাধা আসে। আবার ভরও হয়। তাপস মণ্ডলের একবার ভর হয়েছিল এই মায়ের থানে।

গ্রামবাসীরা খুবই জাগ্রত বলে মানেন এই মাঠ কালীকে। কেউ কেউ মাঠকালীকে রক্ষাকালীও বলে।

শঙ্কর মণ্ডল সংসাজাতে যে নাম করেছেন সে ঐ মায়ের কৃপাতেই। গ্রামবাসীদেরও বিশ্বাস মায়ের দয়াতেই অত নিখুঁত সং সাজতে সক্ষম হন তিনি।

৮। মেয়েলি ব্রতপার্বণ :—

(ক) গ্রামের মহিলারা নিষ্ঠার সঙ্গে যেসব ব্রতাদি পালন করে থাকেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো বিপত্তারিণী, শিবরাত্রির ব্রত এবং ষষ্ঠী পূজা। আর কিশোরীরা পালন করে থাকে ইতু পূজার ব্রত। হয়ে থাকে মাঠ পালনী ব্রতও।

(খ) ব্যাঙের বিয়ে :—

তবে এই গ্রামের মেয়েলি ব্রত পার্বণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে মেয়েদের ব্যাঙের বিয়ের অনুষ্ঠানটি।

কোন বাড়ীর উঠোনে দুটি ব্যাঙ ধরে ছোট একটি পুকুর কেটে তাতে জল ঢালা হয়। ব্যাঙ দুটির একটি ছেলে অন্যটি মেয়ে। ব্যাঙ ডাকলে তবেই মেঘ আসে। বৃষ্টি হয়। অতএব ব্যাঙকে খুশি করা দরকার এই মোটিফ থেকেই একদা বাঙালী মেয়েরা এই ব্যাঙের বিয়ে দিতে শুরু করেছিল। তবে কোথায় কতো দিন আগে যে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল তা বলা আজ আর সম্ভব নয়। এক কালে গ্রাম বাংলায় ব্যাপকভাবে অনাবৃষ্টির দিনে বৈশাখ মাসে এই লৌকিক অনুষ্ঠানটির প্রচলন থাকলেও আজ আর বড় একটা দেখা যায় না এই অনুষ্ঠানটি।

ছোট বেলায় আমার জন্ম গ্রাম কৃষ্ণগঞ্জ থানার চৌগাছা গ্রামে প্রতিবছরই পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের বিয়ে দিতে দেখেছি কিন্তু এখন আর ঐ অনুষ্ঠান চোখে পড়ে না।

তবে উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন গবেষণার সূত্রে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে রাজবংশী মেয়েদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান করতে দেখেছি। বাংলাদেশের রংপুরেও এখনো ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে থাকে বৃষ্টির কামনায় মেয়েরা।

মজার কথা হলো নতিপতোয় এই ব্যাঙের বিয়ের অনুষ্ঠানটি কিন্তু করে থাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরাই। বাড়ী বাড়ী ঘুরে তারা চাল ডাল সংগ্রহ করে আনে এবং বিয়ের ভোজও দেয়। বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের ভোজ অবশ্য এক আসরেই সম্পন্ন হয়।

ব্যাঙের বিয়ের সময় মেয়েরা সমবেত ভাবে সুর করে গায়—

"দে আল্লা দে পানি।
তোর মহল্লায় নেই কি পানি ?
শাকের ভূঁয়ে ছিপ্ ছিপানি।
ধানের ভূঁয়ে হাঁটু পানি।
দে আল্লা দেরে পানি।
ব্যাঙের সাদির নিয়ম মানি।

(রোজিনা দফাদার)

৯। ঐতিহাসিক স্থাপত্য :—

নতিপোতার ঐতিহাসিক স্থাপত্যের নিদর্শন বলতে চওড়া ভিত ও দেয়ালের ভগ্নাংশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নীলকুঠীর বাড়ীটারেই উল্লেখ করতে হয়। অনেকটা জায়গা জুড়ে

ছড়িয়ে আছে এর ধ্বংসাবশেষ। ইট-কাঠ নিয়ে গেছে বহুলোক। অদূরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি লোহার ফার্ণেসও। স্কুলবাড়ী হয়েছে নীলকুঠীর ভিতের ওপরে। তবে কুঠীবাড়ীর গঠন স্থাপত্য যে অতি মজবুত ছিল তা বুঝতে পারা যায় এক নজরেই। বহু স্মৃতি বিজড়িত কুঠীবাড়ীটি আজ ধ্বংসের গর্ভে চিরতরে বিলীন হবার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে নীরবে।

১০। স্বাধীনতা সংগ্রামী :—

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন এই গ্রামের বীর সন্তান শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বিশ্বাস মহাশয়। ১৯৪২ এর আগষ্টে এই অঞ্চলের চাঁদের ঘাট—শিবপুর ও তেহট্ট অঞ্চলে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল—এসেছিল যে প্রবল স্বাধীনতার জোয়ার। সেই জোয়ারে ভেসেছিল এই নিভৃত গ্রাম নতিপোতাও। শিব প্রসাদ বাবু তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

নব্বুই বছরের বৃদ্ধ শিব প্রসাদ বাবু মনের দিক দিয়ে আজো তরুণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সব দিনগুলোর কথা বলতে বলতে এখনো অধীর হয়ে ওঠেন আবেগে। জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে চোখের মণি। শিব প্রসাদ বাবু নতিপোতার গর্ব।

১১। উপসংহার :—

পৌষের দিনে লোক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নদীয়ার নতিপোতা গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন বাড়ীতে, দোকানে ও তাসের আড্ডায় বসে তথ্য সংগ্রহ করার সময়ে গ্রামবাসীদের যে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি তাতে আমরা অভিভূত হয়েছি। কিন্তু ব্যথা পেয়েছি গ্রামের রাস্তাঘাটের মলিন এবং ভগ্নদশা দেখে। আর আশঙ্কিত হয়েছি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের আলপথ দেখে। কি বিপজ্জনক ঐ পথ গাঁয়ের নেতাদের এদিকে দৃষ্টি পড়বে কি নির্বাচনের আগে ? প্রতিদিনই তো শতশত গ্রামবাসীকে যাতায়াত করতে হয় ঐ পথে—তাই না ?

একটা কবিতা দিয়েই এই নিবন্ধের সমাপ্তি টানতে চাই—

যদি ডাকে নতিপোতা

জলঙ্গীর বুক ছেড়ে ঘোর যদি জলঙ্গীর দেশে
কোনদিন শিল্পীদের সাথে—
সরিষার ফুলে বিহ্বল হতে হতে—
হাঁটো যদি দীর্ঘপথ প্রাচীন গাঁয়ের ধূলো মেখে
ভগ্নকোন নীলকুঠী হৃদয়ে জাগায় শিহরণ—
সহজ সরল নরনারী দেয় যদি খুলে
তাদের হৃদয় অবারণ—
গাজন তলায় ওঠে ব্যোম ব্যোম ধ্বনি কোন—
কিংবা সে বাবলাতলায় ভর হয় কারো,—
অথবা ব্যাঙের বিয়ের সাথে ইতুপুজো বিপত্তারিণীযত কৌতুহলী করে,
জলঙ্গীর বুকে যদি সহসাই নৌযান থামে,
প্রাচীন প্রাচীন বট-অশথেরা শাশ্বত বাংলায় কথা বলে,—
কুয়াসায় ঢাকা পথ—সাঁঝ রাতে ডাকে,
আখ আর মসুরীর ক্ষেতে ছম্ ছম্ জাগে,
—কেউ নেই আশে পাশে তবু কেউ ডাকে—
মেঠো সুরে মেঠো বাঁশী সুর যদি তোলে—
অথবা সে উচ্চস্বরে চিহিচিহি অশ্বকোন ডাকে
জেনো তবে তুমি ঠিক
একা একা নির্জনে দাঁড়িয়েছো মেঠো আলপথে
লুই টমাসের সে অশ্বের হ্রেষা শুনে।
—প্রাচীন দিনের সেই নতি পোতা গাঁয়ে।

(রণজিৎ বিশ্বাস)

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী

১। নদীয়া কাহিনী—কুমুদ রঞ্জন মল্লিক।
২। বাঙালীর ইতিহাস (আদি) নীহার রঞ্জন রায়।
৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খণ্ড)।
৪। বাঙালীর পূজা পার্বণ—অমরেন্দ্রনাথ রায়।
৫। বাঙলার উৎসব—তারিণীশংকর চক্রবর্তী।
৬। অঞ্জনা নদীতীরে —সঞ্জিত দত্ত।
৭। পশ্চিমবঙ্গে মেলা ও মহোৎসব—সুধীর চক্রবর্তী।
৮। নদীয়া স্থান নাম—মোহিত রায়।
৯। লোকশ্রুতির নদীয়া—রণজিৎ বিশ্বাস।
১০। লোক ঐতিহ্যে উত্তর বঙ্গ—রণজিৎ বিশ্বাস।
১১। স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া—নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ।
১২। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার নদীয়া (১৯৭৮)।
১৩। রত্নগর্ভা নদীয়ার মাজদিয়া—সুজিত রায়।
১৪। সাহেব ধনী—তাদের গান—সুধীর চক্রবর্তী